মুক্তবাসিনী

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

আবু বকর সিরাজী

সম্পাদনা : আলী হাসান তৈয়ব

2012 - 1434

IslamHouse.com

متبرجات متحررات

« باللغة البنغالية »

أبو بكر سراجي

مراجعة: علي حسن طيب

2012 - 1433

IslamHouse.com

মুক্তবাসিনী

ভূমিকা গল্প

মহান আল্লাহর লাখ লাখ শোকর। যিনি আবার আমাকে পাঠকের সামনে হাজির হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শান্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি মানবজাতির কল্যাণের তরে প্রেরিত হয়েছেন, যাঁর ইলমে ওহীর অবিশ্রান্ত ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় কালের পর কাল, মহাকাল ব্যাপী। শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক উম্মুল মুমিনীন, সাহাবায়ে কেরাম এবং সর্বস্তরের নেককার মুমিনের রূহের ওপর। রহমত বর্ষিত হোক জামিআ‘ উসমানিয়া দারুল উলূম সাতাইশ-এর সুযোগ্য উস্তায সদ্যপ্রয়াত মাওলানা হাবিবুস সুবহানী এবং আমার ভগ্নিপতি মাসউদুল কারীম-যিনি গত ঈদুল আজহার আগের দিন দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন-তার ওপর| আল্লাহ তা‘আলা তাদের সকলের কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিন।

পাঠকদের সামনে আমি এবার ভিন্নমাত্রার একটি লেখা নিয়ে উপস্থিত হলাম। যুগের চাহিদা ও প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে কলম ধরাই একজন লেখকের প্রধান কর্তব্য। সেই কর্তব্যবোধ থেকেই এই ব্যতিক্রমধর্মী লেখার উপস্থাপনা। অবশ্য এক হিসেবে এটাকে ব্যতিক্রমধর্মীও বলা যায় না। কেননা, বর্তমান সময়ে বেপর্দা, উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচার, প্রেম, পরকীয়া, খুন, ধর্ষণের যে চিত্র মহামারী আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে কারও বসে থাকার

সুযোগ খুব কম। প্রত্যেককে যার যার অবস্থানে থেকে এ ব্যাপারে কাজ চালিয়ে যাওয়া এখন সময়ের দাবি। এই অনুভূতিবোধ তো আছেই, সেই সঙ্গে আমার মাথায় কাজ করেছে আরেকটি বিষয়। সেটি হলো, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতকে নারীজাগরণের পথিকৃত বলা হয়। তার বড় কৃতিত্ব (?) ছিল পর্দাদ্রোহ! তিনি যে সময়ের মানুষ ছিলেন সে সময়টায় রক্ষণশীলতা কথাটা বেশ জোরেশোরে উচ্চারিত হতো। মুসলিম পরিবারগুলোও ছিল রক্ষণশীলতার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল। স্বয়ং রোকেয়াও জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটি রক্ষণশীল পরিবারে। কিন্তু রক্ষণশীলতা আর পর্দার বিরুদ্ধে তিনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। লড়াই আর দর্শনটাকে কথা এবং কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কলমের মাধ্যমেও তা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি রচনা করেন ‘অবরোধবাসিনী’ বইটি। স্বতঃস্ফূর্ত পর্দা পালন করতে গিয়ে কোন্ নারী কীভাবে বিড়ম্বনায় পড়ল সে সব কাহিনী তিনি চটকদার শব্দে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় প্রকাশ করেছেন। পর্দার বিরুদ্ধে এলিট শ্রেণীর দৃষ্টিতে পর্দার বিরুদ্ধে লেখা তার এই বইটি যেন অনুপ্রেরণার আদর্শ গ্রন্থ! এ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই এসব লোকেরা পর্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সহযোদ্ধার দায়িত্ব পালন করে আসছে। এখনও আছে সেই ধারাবাহিকতা। বরং এখন সহযোদ্ধারা আরও শক্তিশালী হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। রোকেয়ার দর্শন ও আবেদনকে নারীর কানে কানে পৌঁছে দিয়ে নারীকে তারা ঘর ছাড়া করতে চাইছে।

তাদের এই সর্বনাশা পদক্ষেপ নারী জাতির কী পরিমাণ ধ্বংসসাধন করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নারী জাতি আজ দিকহারা ভ্রান্তপথিক, তাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম ধূলোয় লুটোপুটি খায়। আজ তারা পালকহীন পাখির মতো, যার সম্ভ্রমটুকু কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে ফেলে রাখা হয়েছে পথে-ঘাটে, বাজারে, মার্কেটে। সরলতাকে পুঁজি বানিয়ে একেকজন একেকভাবে তাদেরকে ব্যবহার করছে। আন্তর্জাতিক চক্র তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ধ্বংস করছে, চতুর 'বণিকেরা' তাদেরকে সস্তা পণ্য বানিয়ে মুনাফা করছে, লম্পটেরা বক্রপথে কামনা চরিতার্থ করছে আর এক শ্রেণীর মানুষ ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চার মতো কিছু না পেয়েই লাফাচ্ছে। কিছু না পাওয়া এই শ্রেণীই বেশি ভয়ানক। এদের মায়াকান্নাতেই নারীরা পঙ্গপালের মতো আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে। নিজের হাতে রচনা করছে নিজেদের ধ্বংসের পথ।

ছদ্মবেশী এসব দুশমনের অকল্যাণ থেকে নারী জাতিকে সতর্ক করার প্রয়াস হিসেবেই 'মুক্তবাসিনী' বইটি লেখা। এতে সমসাময়িক যে সব নারকীয়, দুঃখজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়ে গেছে, সে সব ঘটনা উল্লেখ করে এর সত্যাশ্রয়ী বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। এসব ঘটনার অনেকগুলো এত মর্মান্তিক, যা পাঠক হৃদয়ে বেদনার ঝড় তুলবে বলে আমি মনে করি। কারণ, হৃদয় বলে যে শক্তি আছে সেই শক্তিও অনেক সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় কোনও কোনও ঘটনার

নির্মমতায়। এই অভিজ্ঞতা আমার আপনার সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আমি আমার কৈফিয়ত হিসেবে বলতে চাই, আলোচ্য বইটিতে ঘটনাগুলো লেখা হয়েছে উম্মতকে পাপের কুফল সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য। এসব ঘটনার কোনোটা এত স্পর্শকাতর যে, আমাকে তা লিখতেও হয়েছে আবার কোন ভাষায়, কোন শব্দে তা উপস্থাপন করব তা নিয়েও দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়তে হয়েছে। কখনও কখনও কলম হয়ে গেছে নড়বড়ে। তবু আমি শব্দ নির্বাচনে সাধ্যানুযায়ী সতর্ক থেকেছি, যাতে শুনতে খারাপ- এ ধরনের কোনও শব্দ স্থান না পায়। তারপরেও হয়ত ঘটনার নির্মমতা সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বেফাঁস কোনও শব্দ বের হয়েছে আমার কলম থেকে। ঘটনার পাশবিকতা সম্পর্কে ধারণা দিতে এসব শব্দ উল্লেখ না করে উপায় ছিল না। তবু আমি মাবুদের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমার লেখায় ঘটনার শিকার মজলুমদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। আর যারা পরলোকগত হয়েছেন তাদের জন্য করি আত্মার মাগফিরাত কামনা। আমি হলফ করে বলতে পারি, কোনও হিংসা, বিদ্বেষ কিংবা ব্যক্তিগত ক্রোধ থেকে অথবা কাউকে খাটো করার উদ্দেশ্যে এসব ঘটনা উল্লেখ করা হয় নি। আর ব্যক্তিগত ক্রোধ থাকার তো প্রশ্নই আসে না। কারণ, অধিকাংশ ঘটনার সংশ্লিষ্ট লোকদের সঙ্গে আমার কোনও ধরনের পরিচয়ই নেই। তাছাড়া যে সব ঘটনা উল্লেখের

ক্ষেত্রে কারও সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে বলে মনে হয়েছে, সে ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। একই কারণে অনেক ঘটনার স্থানও আড়াল করা হয়েছে। কখনও আমি একটা ঘটনা দশবার সংশোধন করেছি, কাউকে দিয়ে পড়িয়েছি এবং বুঝতে চেষ্টা করেছি তিনি এই ঘটনার লোকটিকে চিনতে পারেন কিনা। নিশ্চিত হয়ে তবেই লেখাটা ছেড়েছি। আমার উদ্দেশ্যই হলো নারী-পুরুষকে স্বীয় সম্ভ্রমের মূল্য সম্পর্কে সজাগ করা। সেই আমিই কি পারি কারও সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয় মতো কোনও আচরণ করতে?

বস্তুত সত্য উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তার তাগিদ এবং সত্য উচ্চারণের ক্ষেত্রে অবহেলা বোবা শয়তানের পাপ বলেই কলম ধরতে হলো। এই কলম আমার আমানত। আমি যেমন পারি না কলমের সঙ্গে খেয়ানত করতে, তেমনি পারি না কলমকে প্রয়োজনের সময় নিষ্ক্রিয় রাখতে। সেই তাগিদেই একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে কলম ধরতে হলো। আশা করি পাঠকগণ বিষয়ের স্পর্শকাতরতা অনুধাবন করে শব্দচয়নে আমার ত্রুটি ক্ষমা করবেন।

বইটি পাঠক সমীপে পেশ করা পর্যন্ত যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটির কাজ করতে গিয়ে মুফতী আবু হুরায়রা ও মাওলানা এনামুল হক সাহেবের মাধ্যমে বারবার উপকৃত হয়েছি। তাঁদের উভয় জাহানের কল্যাণ কামনা করি।

অনেকে অনেক সময় ঘটনা সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত ও হাদীসের উৎস সন্ধানে সহায়তা করেছেন, তাদের জন্যও থাকল আমার আন্তরিক দু'আ।

পাঠকের কাছে নিবেদন এই যে, একটি নতুন উদ্যোগে নতুন পদক্ষেপে আমি আপনাদের সামনে হাজির হওয়ার চেষ্টা করছি। আল্লাহ যদি তাওফীক দেন তাহলে নতুন কিছু করার, নতুন কিছু গড়ার চেষ্টা করব। ভালো ও সুন্দর পদক্ষেপে সফলতা লাভের জন্য আপনাদের দু'আয় শামিল হওয়ার আশায় কথাটা বললাম। আশা করি পাঠকগণ তাদের নেক দু'আয় আমাকে শামিল করতে কার্পণ্য করবেন না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভুলভ্রান্তিগুলো ক্ষমা করে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলার তাওফীক দান করুন। আমীন

পরিশেষে আবার বলব, একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে কলম ধরলাম। আশা করি পাঠকগণ বিষয়টির স্পর্শকাতরতা উপলব্ধি করবেন এবং বক্তব্য ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ত্রুটি ধরা পড়লে সুপরামর্শ দিয়ে আমার চলার পথকে আরও বেগবান করবেন। সকলের সুপরামর্শ কাম্য। আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার অপর ভাইয়ের সাহায্যে নিরত থাকে।

আরজগুজার

আবু বকর সিরাজী

abubakarsiraji2011@gmail.com

মোবাইল : ০১৫৫২৫৭৯৯৩৯, ০১৭৩৬৬১৬৫৯০

সূচিপত্র

বিষয়

জনতার হাটে সম্ভ্রম বিক্রি

ছাত্রীদের করুণ বিলাপ

বিনাশী পরকীয়া : বিচূর্ণদর্পণে আমাদের সমাজ অবয়ব

অসময়ের করুণ প্রস্থান

এলোমেলো পরিচয়

হীনস্বার্থের প্রলোভন

পর্দাহীন শিক্ষা : শেষ সম্বল চোখের জল

বিষোপঢৌকন

জীবন্ত দাফনের আধুনিক রূপ

সতীত্বের নিলাম

বিচূর্ণ স্বপ্ন

পরকীয়ার স্বরূপ ও বর্তমান পরিস্থিতি

লুণ্ঠিত সম্ভ্রমের লাশ চুরি!

রক্তলহরী

শতভ্রষ্টতায় পিষ্ট প্রাণ

কথার পর্দা

সম্মোহনে ভ্রষ্টতা

বিকৃত বাসনা

বিবেক জাগাতে প্রাণদান

নির্লজ্জ দিবসের নীলগোলাপ!

নারীসত্তা : বহুবৈচিত্রের আধার

নারী আল্লাহর এক অপার মহিমাময় সৃষ্টি। বিস্ময়কর বৈপরীত্যের আধার। সৃষ্টিকর্তার অদ্ভুত মিশেল তার উপাদান। আগুন-পানির সফল সমন্বয়। ভাঙা-গড়ার মিশ্র অনুভূতির সরল উপমা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের পবিত্র যবানে উচ্চারিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে এই মিশ্র মন্তব্য। কখনও তাদেরকে আখ্যায়িত করেছেন- 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ' বলে। কখনও বা আখ্যায়িত করেছেন- 'শয়তানের জাল' হিসেবে।

কখনও তাদের জ্ঞানের কারিশমা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, আবার কখনও নির্বুদ্ধিতার কারণে তাদের সৃষ্টিনির্যাসের কথা তুলে ধরেছেন।

আমরা যদি অতীত ইতিহাসকে যোগ করি, তাহলে অবিশ্বাস্য রকমের বৈপরীত্য দেখতে পাই নারীসত্তায়। দেখতে পাই, নারী কখনও ইবরাহীমের ঘরের মক্কার চাটিয়াল ভূমির 'মুতিআ' হাজেরা। কখনও আবার লূতের (আ.) ঘরের 'নাশেযা' ওয়াইলা (লূত আ. এর অবাধ্য স্ত্রীর নাম, [জালালাইন])।

নারী কখনও অবিশ্বাসী ফেরআউনের ঘরের বিশ্বাসী আছিয়া, আবার কখনও বিশ্বাসী নূহের (আ.) ঘরের অবিশ্বাসী স্ত্রী ওয়াহিলা। নারী কখনও আইয়ূব (আ.)-এর ঘরের পরম ধৈর্য্যশীলা রহিমা, যিনি সীমাহীন কষ্ট ভোগ করে স্বামীর জন্য খাবার জোগাড়

করতেন। আবার কখনও লূতপত্মী ওয়াইলা, যে স্বামীর বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কে দেয়ার জন্য ঘুরে বেড়াত।

নারী কখনও উম্মে সুলাইত (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু), ওহুদের ময়দানে যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের জন্য জীবনবাজি রেখে পানি পৌঁছিয়েছেন। আবার কখনও যয়নব বিনতে হারেছ ইহুদীয়া, যে খায়বরে বকরীর সঙ্গে বিষ মিশ্রণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সামনে পরিবেশন করেছে।

নারী কখনও খাওলা বিনতে হাকীম (রাদিয়াল্লাহু 'আনহা), যিনি পার্থিব সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শুধু রাসূলের বিবি হওয়ার গৌরব অর্জন করতে নিজেকে ভরমজলিসে তাঁর সমীপে পেশ করেছিলেন। বলেছিলেন-

يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ وَهَبْتَ لَكَ نَفْسِيْ-

এই নারীর প্রশংসনীয় দুঃসাহসকে খাটো করেছিলেন আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কন্যা। একবার তিনি বললেন, একজন নারী কী করে পারে নিজেকে কারো সামনে বিয়ের পাত্রী করে উপস্থিত করতে! জবাবে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছিলেন-

هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا -

তিনি তোমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ**।** কেননা, তিনি রাসূলের মহব্বতে নিজেকে তাঁর সমীপে পেশ করেছিলেন। [বুখারী: ৫১২০]

আবার এই নারীই কখনও আমরা বিনতে জাওন, যে নবীর স্ত্রী হওয়ার গৌরব প্রত্যাখ্যান করেছিল। বুখারী শরীফে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ - فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ-

জাওনের কন্যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের কাছে স্ত্রী হিসেবে পেশ করা হলো এবং তিনি তার নিকটবর্তী হতে গেলেন। তখন সে বলল, আমি আপনার হাত থেকে পানাহ্ চাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি মহান সত্তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছ। অতএব, তুমি মুক্ত। তুমি তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও। [বুখারী : ৫২৫৪]

আবূ উসায়দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

هَبِّيْ نَفْسَكِ لِيْ قَالَتْ : وَهَلْ تُهِبُّ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسَّوْقَةِ ؟

'তুমি আমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হও। সে বলল, কোনো রাণী কি নিজেকে সাধারণ প্রজার হাতে অর্পণ করতে পারে?' তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু কাপড়চোপড় দিয়ে ভালো ব্যবহার করে বিদায় করে দিলেন। [প্রাগুক্ত : ৫২৫৫]

এই মহিলার নাম নিয়ে বেশ মতভেদ আছে। উমাইয়া বিনতে নোমান, ফাতেমা বিনতে দাহহাক, আছমা বিনতে নোমান, সানা

বিনতে সুফয়ান প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। [ফাতহুল বারী : ৯/৩২৫-৩৩২]

কী অদ্ভুত বৈচিত্র! এক নারী যে সৌভাগ্য লাভ করার আশায় ভরমজলিসে নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সামনে উপস্থাপন করে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই সৌভাগ্য নিজের ভাগ্যাকাশে উদিত হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে আলো সংগ্রহ করল না আরেক নারী! নারীবৈচিত্রের এ কী বিরল দৃষ্টান্ত!

নারী কখনও বিলকিস, যিনি 'সিংহাসনের' মালিকা হওয়া সত্ত্বেও নবী সমীপে আত্মসমর্পণকারিনী। আবার কখনও তুলাইহা, যে নবুওয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী।

নারী কখনও সম্ভ্রমে-চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষায় পাহাড়প্রমাণ দৃঢ়, প্রতাপশালিনী। আবার কখনও যুলায়খা, যে নবীর মতো নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও বিভ্রাটে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

ইতিহাসের সাগর থেকে সেঁচা কয়েকটি উপমা উল্লেখ করলাম। নারী এমনিই, এমনিই তার মিশ্র উপাদান। রহস্যময়তায় ঘেরা তার সৃষ্টি। যার রহস্যময়তার সামনে চিন্তার বৈকল্য দেখা যায়। জায়া-জননী-দুহিতা সবাই এক ইমামের মুক্তাদী!!

আমাদের মায়ের কথাই বলি। পিতার প্রাচুর্যের কোনো কমতি ছিল না। তার মতো জমিদারী কেউ পেয়েছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই। তবু তার মনে সুখ নেই, শান্তি নেই। যেখানে প্রাচুর্য দু'পায়ে লুটোপুটি খায়, যে বাগান থেকে ইচ্ছা ফল ছিঁড়ে খেতে পারেন যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন, তবু সুখ নেই কেন? অসুখ ছিল মূলত

শূন্যতার। আল্লাহ তা'আলা সেই শূন্যতা দূর করলেন। একজন বিপরীত লিঙ্গের মানুষ পেয়ে পিতার সুখপাখিটা মুক্ত আকাশে ডানা মেলল। তিনি আবেগাপ্লুত হলেন। সেই সুযোগে ফেরেস্তাগণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কি তাকে ভালোবাসেন? কিছুমাত্র বিলম্ব না করে পিতা জবাব দিলেন, অবশ্যই!

এবার মায়ের পালা। ফেরেস্তাগণ তাকেও জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তাদেরকে হতবাক করে দিয়ে তিনি জবাব দিলেন, 'না'। বিস্মিত ফেরেস্তাকুল। এ কোন্ রহস্যময়তা, যার গাঁথুনীতে গড়ে তোলা হয়েছে নারী জাতিকে? সেই রহস্যময়তার ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম কুরতুবী রহ.। তিনি বলেন-

وَ فِيْ قَلْبِهَا اَضْعَافُ مُضَاعَفَةٌ مِنَ الْحُبِّ وَلَوْ صَدَقَتِ الْمَرْأَةُ فِيْ حُبِّ زَوْجِهَا لَصَدَقَتِ الْحَوَاءُ-

'অথচ তার অন্তরে তারও চেয়ে বেশিগুণ ভালোবাসা লুকায়িত ছিল। তো কোনো নারী যদি তার স্বামীর ভালোবাসার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশে সত্যবাদী হতো, তাহলে হাওয়া আলাইহাস সালাম সত্য কথা বলতেন। [কুরতুবী]

এই হলো নারী, যার রহস্যময়তা নিরবধি এগিয়ে চলে কালের স্রোতে কলকল ধ্বনিতে। এ যুগ হতে সে যুগ পর্যন্ত। এ কারণে তার মধ্যে তুমি দেখতে পাবে হাজারও বৈপরীত্য। তুমি তাকে ভালোবাসবে, সে তোমার ভালোবাসাকে নিকুচি করবে। কখনও অন্যের উস্কানীতে মিথ্যার মশলা দিয়ে নির্মাণ করবে বিরাট বাঁধ, যা দেখে মুগ্ধ হওয়া যায়; কিন্তু তাতে আরোহণ করা যায় না।

কখনও তুমি তাকে আবিষ্কার করবে বাদকের অনুগত বাদ্যযন্ত্র হিসেবে, যা অর্থহীন প্রলাপে, কর্কশ শব্দে বিঘ্ন করে শান্তির পরিবেশ। সে হ্যামিলনের বাঁশীওয়ালা, যার বাঁশীর আহবানে সাড়া দিয়ে মিথ্যার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমগোত্রীয় একদল 'শিশু'!

তারা কাল্পনিক গল্পকার। মিথ্যার এক ফোঁটা অনুজ্জ্বল কালি দিয়ে রচনা করে বিরাট গল্প। সচেতন পাঠক যার উপসংহার পাঠ করে অনুতপ্ত হয় নিরর্থক কথিকা পাঠ করার অনুশোচনায়। সরলতা তাদের বইয়ের প্রচ্ছদ। চোগলখোরী তাদের মূলপাঠ্য।

তারা পুঁথিপাঠক, শ্রোতা যাদের তন্ময় ও ভাবলেশহীন। তন্ময়তা যাদের দৃষ্টি থেকে 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল'- বাক্যের অর্থটাকে আড়াল করে রাখে।

তাদের বিশ্বাসের আঙিনাটা ফাঁপা বেলুন, যা অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বগামী বায়ুর চাপে সদা ফেটে পড়তে উদগ্রীব থাকে এবং গল্পের সঙ্গিনীর মৃদুচাপে তা মুহূর্তে চুপসে যায়। মনে রেখ, নারীর গল্পের সঙ্গিনীর কেউ কেউ আমরা বিনতে আমর, হায়দারা, হিন্দ বিনতে আওস, কাবশা বিনতে আরকাম। সবাই কিন্তু উম্মে যার' নয়!

সৃষ্টিকর্তার অপার সৃষ্টিরহস্যে সৃষ্ট এই জাতি। সৃষ্টিকর্তাকে যেমন জ্ঞান দিয়ে বেষ্টন করা সম্ভব নয়, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয় তার এই সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন করাও। পাশ্চাত্যে 'three w' কথাটি বেশ শোনা যায়। অর্থাৎ Work, Woman, Wather তথা নারী, কর্ম ও আবহাওয়া- এই তিনটি বস্তুর নাকি আগা-মাথা পাওয়া দায়!

তাই কখনও তুমি তাকে বিভ্রান্ত হতে দেখবে, কখনওবা দেখবে বিভ্রান্ত করতে। নারীসত্তায় বাতিকের গুণ মাখামাখি। ছিদ্রান্বেষণে সূঁচের জায়গায় তারা কুড়াল চালাতে জানে! ঘাসের ওপর জমা শিশিরের পানিকে জলাশয় মনে করে কাপড় গোটাতে জানে!
তারা পুরুষের লেবাস। কখনও তারা পুরুষকে প্রকাশ করে তার আসল লেবাসে। কখনওবা প্রকাশ করে ভাবতাড়িত হয়ে কল্পনার শীর্ণবস্ত্রে।
নারী এক বিস্ময়কর আলো, যা সূর্যের প্রখরতায় প্রকাশ পায়। আবার কখনও অদ্ভুত অন্ধকার, যা বাতির নিচে বাস করে। মৃত্যু যদি জীবনের সহোদরা হয়, তবে ফেতনা নারীর সহযাত্রী। সে তার সফরসঙ্গী থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না।
সে তোমাদের দর্পণ। 'মুমিন আরেক মুমিনের আয়না'। আয়নার দর্শক কখনও তাতে ব্যক্তির আসল চেহারা দেখতে পায়, কখনওবা তাতে অবিশ্বাস আর কল্পনার আস্তর পড়ায় দেখতে পায় বিকৃত ভিন্ন চেহারা। এতো দৃশ্যিতের দোষ নয়, দর্শকের দেখার ভুল! কেউ স্বপ্নে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভিন্ন অবস্থায় দেখলে সেটা হবে দর্শকের নিজের রুগ্নতার লক্ষণ। আহলে হক তা-ই বলেন।
কেউ যদি তার পরিচিতজনকে জিজ্ঞেস করে- তোমার নাকি মাথা নেই? তাহলে ওই লোকটি কী করবে? হয়ত প্রশ্ন শুনে সে আকাশ থেকে পড়বে কিংবা আকাশ তার ওপর ভেঙে পড়বে। বিস্মিতস্বরে বলবে, বলেন কী আপনি!

-হুঁ, তাইতো শুনলাম। এক নারী নাকি তোমাকে মস্তকবিহীন অবস্থায় দেখেছে!
হায় নিরস কৌতুক! পৃথিবীর সবকিছুই কি তালাক, ইতাক আর নিকাহর মতো 'জাদ্দুহুন্না জাদ্দুন ওয়া হাযলুহুন্না জাদ্দুন- বাস্তবও বাস্তব, কৌতুকও বাস্তব?
হে মানুষ! আয়নাটা তো কাচের একটা যন্ত্রমাত্র। কখনও তাতে যুক্ত হয় ধূলির আস্তর, কখনও বা হয় বিচূর্ণ। তবে তুমি কী করে একটি দৃশ্যের আসল অবস্থা দেখার জন্য এই আস্তরপড়া বিচূর্ণ দর্পণের আশ্রয় নিয়ে নিজের বিবেকটাকে শিকেয় তুলে রাখো?
কোথায় নেই নারী? কবির কাব্যে, লেখকের লিখনীতে, সাধকের সাধনায়, বিরাগীর বৈরাগ্যে- সর্বত্র তার অবাধ বিচরণ। নারীসত্তার একটি মিশ্র অনুভূতি কখনও জন্ম দেয় একটি লেখার, কখনওবা কাব্যের কখনওবা বিরাট ইতিহাসের। কখনও কবি নজরুলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইতে ইচ্ছা করে-

পৃথিবীতে যা কিছু মহান চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

আবার কখনও বিকৃতি ঘটিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়-

পৃথিবীতে যা কিছু ফেতনা, অসত্য অকল্যাণকর
নব্বইভাগ তার সৃজিয়াছে নারী বাকি দশে হয়ত নর!

তবে সব কথার ঊর্ধ্বের কথা হলো নারী সমাজের অর্ধেকাংশ। নারী ছাড়া সমাজ অচল। যে ভাঙবে, সেই আবার গড়বে। একবার ভাঙতে দেখে ভেঙে পড় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লা ইরশাদ করেন- নারীর একটা অন্যায় দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ো না। একবার অন্যায় করলে দেখবে, সে-ই আবার আরেকটি পুণ্য নিয়ে আসবে[1]।

তাই তাদের মিশ্রশক্তিকে সঙ্গে নিয়েই সমাজ-সংসারটাকে এগিয়ে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন-

اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَمَعَهَا ضِلْعٌ-

'নারী বাঁকা পাঁজরের মতো। তুমি তাকে সোজা করতে গেলে ভেঙেই ফেলবে। তাই এই বক্রতা নিয়েই তার দ্বারা উপকৃত হও।' [বুখারী : ২/৭৭৯]

নারীসত্তার এই বৈপরীত্য দ্বারা অনুমান করতে পারি তার মধ্যে দুই গুণই আছে। আছে দ্রোহ। আছে আনুগত্য। সে ইচ্ছা করলে পর্দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মুক্তবাসিনী হতে পারে। আবার আনুগত্য প্রদর্শন করে হতে পারে পর্দাবাসিনীও। তার পারাটা বড় বিষয় নয়, পারার ধরণটা বড় বিষয়। নারীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে নিজের সম্ভ্রমবোধকে পর্দার রেশমী রুমালে আড়াল করে রাখবে, নাকি খোসা ছাড়া কলার মতো মশা-মাছির খাবারে পরিণত করবে? একটুখানি সুশৃঙ্খল, পর্দাবেষ্টিত জীবন যদি

---

[1] সম্ভবত: যে হাদীসটির কথা লেখক বলতে চাচ্ছেন তা হচ্ছে,

«لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»

"কোনো মুমিন যেন কোন মুমিন নারীকে ঘৃনার দৃষ্টিতে না দেখে, কারণ, তার এক স্বভাব অপছন্দ হলেও অপর স্বভাব তাকে চমৎকৃত করবে।" [মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬৯] [সম্পাদক]

নারীকে সম্ভ্রম রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়, তবে তা হবে খুবই সস্তামূল্যে দামি বস্তু ক্রয়। কে আছে এমন বণিক, যে সূঁচের বদলায় স্বর্ণবার গ্রহণ করতে চায় না!

নারী সম্পর্কে দীর্ঘসূত্রে আমাকে এই অনুভূতি প্রকাশ করতে হলো। কেউ যদি আমার কাছে এ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করেন, তাহলে আমি বলব-

اَلتَّقِيُّ مُلْجَمٌ لاَ يَقْدِرُ اَنْ يَّتَكَلَّمَ بِكُلِّ مَا يُرِيْدُ-

'মুমিনের মুখে লাগাম লাগানো থাকে, সে ইচ্ছা করলেই সবকিছু বলতে পারে না।' আর আসল কৈফিয়ত দেবো- 'যেদিন সব রহস্য উন্মোচন করা হবে' সেদিন। দুনিয়াতে যে সহজ কথা যায় না বলা সহজে!

বেপর্দা ও ইভটিজিং : সহোদরার সহযাত্রা

খালি পায়ে হাঁটতে হঠাৎ সামনে সাপ পড়লে কিংবা নিরস্ত্র একাকী ব্যক্তি জঙ্গলে আচানক বাঘের সামনে পড়ে গেলে যেমন ভয়ে আঁতকে ওঠে, তেমনি এ সময়ের তরুণী, যুবতী ও তাদের অভিভাবকরা ইভটিজিংয়ের নাম শুনলে কেঁপে ওঠেন। ইভটিজিং এ সময়ের খুবই আলোচিত ও মানুষের মুখে-মুখে উচ্চারিত একটি শব্দ। আসুন, শব্দটি সম্পর্কে সাধারণ কিছু তথ্য জেনে নিই।

বস্তুত 'ইভটিজিং' শব্দটি এসেছে মত্তু ভাষা থেকে। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে শব্দটি বেশী ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা বা অন্যান্য দেশে এর স্থলে ব্যবহৃত হয় 'সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট'। ইভটিজিং হচ্ছে- রাস্তা-ঘাটে বা প্রকাশ্য স্থানে নারীকে যৌন হয়রানী করা। তাদেরকে লক্ষ্য করে অশ্লীল ভাষা বা যৌনাত্মক কথাবার্তা ছুঁড়ে দেয়া। টিটকারী ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা অথবা পিছু লেগে থেকে নারীকে বিরক্ত করা।

আজ সহজ হয়েছে নারীকে উত্ত্যক্ত করা! ভয়াবহ ক্যান্সারের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এই মহামারী- গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-পল্লীতে সবখানে। একদিকে শিক্ষকরা ইভটিজিং প্রতিরোধে বেঘোরে প্রাণ দিচ্ছেন, তো অন্য দিকে শিক্ষকরাই ছাত্রীদের সঙ্গে ইভটিজিং করছেন! এ কারণে শাস্তিরও সম্মুখীন হচ্ছেন তারা বহুস্থানে। এই সম্প্রতি দুইজন শিক্ষককে এ কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে!

সভ্যতার এই বাজারে পানির শালুক আর বন্য বাইতার শাকের মূল্যও যেখানে কম নয়, সেখানে একমাত্র নারীর মূল্যটাই কম! নারী অহরহ লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে, তাদের ইজ্জত-আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। কেন? কেন এতো ঠুনকো হলো চিরসম্মানী নারীর এই মর্যাদা? শুধু কি তা-ই? যারা তাদের মর্যাদা রক্ষার্থে প্রতিবাদ করছে, তাদেরকেও বেঘোরে প্রাণ দিতে হচ্ছে। নিচের ঘটনা ৩টি পড়ুন :

ঘটনা-১ : মিজানুর রহমান মিজান। রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামের মৃত আবুল হোসেনের ছেলে। আট বছর আগে নাটোর জেলার বাঘতিপাড়া উপজেলার লোকমানপুর কলেজের রসায়ন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন তিনি। শিক্ষাবিস্তারের মহান ব্রত নিয়ে নিজ জেলা থেকে ছুটে এসেছিলেন অন্য জেলায়। জাতিকে করতে চেয়েছিলেন শিক্ষিত, নন্দিত। কিন্তু মচকে যাওয়া পায়ের ওপর যে জাতির সভ্যতা দণ্ডায়মান, সেই জাতি তাকে আর কী-ইবা উপহার দিতে পারে? তাই তারা বন্দনার বদলায় দিল নিন্দা আর নিরাপত্তার পরিবর্তে করল প্রাণসংহার!

তিনি লক্ষীপুর থেকে মোটরসাইকেলযোগে কলেজে যাতায়াত করতেন। ওই কলেজের ছাত্রীদের প্রায়ই উত্ত্যক্ত করত বাঘতিপাড়া উপজেলার চকগোয়াম বেগুনিয়া গ্রামের বখাটে দুই যুবক। গোলাম রসূলের ছেলে আসিফ ও মনছুরের ছেলে আব্দুল আউয়াল রাজন। যৌনক্ষুধার জলাতঙ্ক রোগে কাতর এসব যুবক। নারী দেখলেই হামলে পড়া তাই এদের নেশা। যুবতী কলেজ

ছাত্রীর শালীনতাবর্জিত পোশাক ও অবগুণ্ঠনমুক্ত চেহারা তাদের মাথায় নেশা ধরিয়ে দেয়। মাতাল করে তোলে তাদের। যে সমাজ তাদেরকে নারীর অবগুণ্ঠনমুক্ত চেহারা উপহার দিয়েছে, যুবতী নারীর উন্নতবক্ষের লোভনীয় দৃশ্য উপঢৌকন দিয়েছে, সেই সমাজ তাদের কামনার আগুন নির্বাপিত করতে বাধ সাধে কেন- এই প্রশ্নে তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায়। তাই যুবতী নারীদেরকে দেখলে ওড়না ধরে টানাটানি করে। কুকথা বলে নারী সম্ভ্রমের শিকড় ধরে টান দেয়।

শিক্ষক মিজান প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব। এসব অনৈতিকতা তাকে মর্মাহত করে। তিনি জলাতঙ্ক রোগীদের ডেরায় হানা দেন। প্রতিবাদ করেন অন্যায়ের। তিনিসহ কলেজের কয়েকজন শিক্ষক মিলে দুই বখাটে যুবকের অভিভাবকদের ডেকে তাদের সন্তানদের এহেন অন্যায়ের প্রতিবাদ জানান।

কিন্তু উচ্ছন্নে যাওয়া বখাটে যুবকদের শাসন করে সাধ্য কার? মা-বাবা কিংবা অন্য কোনও অভিভাবকের পক্ষে সম্ভব নয় তাদের নাকে লাগাম পরানো! কেননা, আল্লাহর ডর-ভয়হীন এসব যুবকের সামনে অভিভাবকের লাঠি তুলার দড়ির চেয়ে বেশি ভারি কিছু নয়!

তাই এই শাসনের কথায় আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে তারা। যারা তাদের কামনার আগুনে পানি ঢেলে দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে নমরুদের আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে তারা। এই আগুনের স্ফূলিঙ্গ

প্রথমে নিক্ষিপ্ত হয় মিজানের গায়ে। আগুনের লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয় তার প্রতিবাদী শক্তকণ্ঠ।
২রা অক্টোবর কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে আসিফ ও রাজন মিজানের গতিরোধ করে। মিজান কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা লোহার রড দিয়ে তার মাথায় আঘাত হানে। দুইজনের সাঁড়াশি আক্রমণে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে একটি প্রতিবাদী ও সত্যাশ্রয়ী কণ্ঠ। আর মুখ কেলিয়ে হেসে সমাজের স্রোতে বীরদর্পে মিশে যায় রাজিন-আসিফ। স্থানীয়রা মিজানকে প্রথমে বাগতিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে নেয়া হয় রামেক হাসপাতালে। সেখানেও অবস্থার অবনতি হলে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকার পিজি হাসপাতালে। সেখানে বারো দিন চিকিৎসা নিলেও শেষে মৃত্যুর কাছে হার মানতে হয় তাকে। নিভে যায় তার জীবনপ্রদীপ। ২৪ অক্টোবর শনিবার দিবাগত রাত একটায় তিনি পরপারের যাত্রী হন। [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ ও অন্যান্য জাতীয় পত্রিকা, ২৮/১০/২০১০ ইং]
মিজানের মৃত্যু এলাকাবাসীর অন্তরে বেদনার ঝড় তুলেছে। তাদের অন্তর ছেয়ে গেছে বিষাদের কালো ছায়ায়। তার স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা মিলি অল্প বয়সে বৈধব্যের গহনা পরলেন গলায়। স্বামীহারা মিলির অসহায় দৃষ্টি কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। হয়ত মিলিয়ে যায় খেলাফতে রাশেদার শাসনামলের অতীত গর্ভে। এই লুণ্ঠিত সভ্যতার সমাজ-সংসার থেকে পালিয়ে বাঁচতে চান তিনি।

ফিরে যেতে চান কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া ইসলামী আদর্শের সুনগরীতে।

তার চার বছরের কন্যা লুসাইবা রশিদ মম শুধু আব্বু-আব্বু বলে ডাকছে আর চিৎকার করে কাঁদছে। তার কান্না থামছে না। যেদিন থামবে কিংবা থামার বয়স হবে, সেদিন হয়ত লুসাইবা দেখবে এমন আরেকটি দৃশ্য। দেখবে, আরেকজন লুসাইবা তার বাবা কিংবা ভাই অথবা আপনজনের এমন করুণ পরিণতিতে কাঁদছে। এই সমাজে এ কান্না থামবে না। কেবল একজন আরেকজনের স্থান পূরণ করবে মাত্র। যদি না সমাজের মরণব্যাধি বেপর্দা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচারকে ঝেঁটিয়ে না তাড়ানো হয়।

ঘটনা-২ : চাঁপারানী ভৌমিক। নিহত হয়েছেন মোটরের চাপায়। তাকে চাপা দিয়ে হত্যা করার ঘটনাটি পরিকল্পিত, ইচ্ছাকৃত এবং ঘাতকের প্রতিশোধের চাপা আগুনের নির্ধূম প্রজ্জ্বলন। চাঁপারানীর অপরাধ, তিনি একজন মা এবং মায়ের অধিকার বলে নিজ সন্তানকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করেছিলেন।

তার দশম শ্রেণী পড়ুয়া মেয়েকে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করত মধুখালী বাজারের মদ ব্যবসায়ী রতন সাহার ছেলে দেবাশীষ সাহা রনি (২৪)। ছুঁড়ে দিত যৌনাত্মক বিষবাক্য। 'ওয়াও! মাই ডার্লিং!' বলে নারী মর্যাদার ওপর কলঙ্কের আবর্জনা ছুঁড়ে মারত সে।

তবে লজ্জার ভয়ে দীর্ঘদিন ধরে এই পাপবাষ্পকে আটকে রাখার চেষ্টা করেছিলেন চাঁপারানী। কিন্তু বাতাস-বাষ্প এসব পদার্থকে আর কতক্ষণ আটকে রাখা যায়? তাই অপারগ হলেন দুর্বার

শক্তির বাঁধন খুলেও দিতে। প্রকাশ করলেন রনির কীর্তিকলাপের কথা। বিচার চাইলেন মধুখালী উপজেলার চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সুরাইয়া সালাম এবং চিনিকল উচ্চবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির কাছে। এসব লোকজন রনির বাবাকে ডেকে সতর্ক করে দিলেন।

তাদের এই সতর্ক-সংকেত হিতে বিপরীত হলো। যে সমাজে রনিদের বীরদর্প পদচারণা, সম্ভ্রমলুটেরাদের নির্বিঘ্ন পদযাত্রা, সে সমাজে ভালো মানুষের চোখরাঙানী বা শাসন তেমন কোনও কাজে আসে না। বরং হিতে বিপরীত হয়, পাপের দাবানলে অপ্রতিরোধ্যের জ্বালানী সরবরাহ করা হয়।

আমার কথার সত্যতা দেখুন : ২৬ই অক্টোবর চাঁপারানী বিকালে স্বামী স্বপন বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবেশী হারানচন্দ্র সরকারের মেয়েকে বিদায় জানাতে রেলগেট পর্যন্ত এগিয়ে যান। বিদায় দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে উন্মত্ত দানবের বর্বরতার শিকার হন তিনি। ভারী মোটরসাইকেল দিয়ে পেছন থেকে চাঁপারানীকে চাপা দেয় সেই রনি। মারাত্মক যখমী হলে তাকে প্রথমে মধুখালী হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি ঘটলে নেয়া হয় ফরিদপুর মেডিক্যাল হাসপাতালে। সেখানকার ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বড়ই দুর্দমনীয় এই সমাজ! এখানে প্রতিবাদের ভাষা নগণ্য ও ক্ষীণ। কিন্তু পরিণাম মৃত্যু! চাঁপারানীর হত্যাকাণ্ড এই বিবর্ণ

সমাজের রুগ্নদশার একটি ক্ষুদ্র নাটিকা মাত্র! [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ২৮/১০/২০১০ ইং]

ঘটনা-৩ : মিজান ও চাঁপারানী হত্যাকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি হত্যাকাণ্ড মানুষের বিবেককে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়। এবারের ঘটনা সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ থানার নিঝুড়ি গ্রামের। এলাকাবাসী জানান, রায়গঞ্জ উপজেলার নিঝুড়ি গ্রামের শম্ভুনাথ মলের ছেলে সুশীল কুমার বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার খলীসাবাড়ী গ্রামের সুনীল কুমার বরাতীর মেয়ে চান্দাইকোনা-সীমাবাড়ি এস আর গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী রূপালী বরাতী টুনিকে স্কুল ও প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার পথে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করত।

এখানেই থেমে থাকেনি উন্মত্ত যুবক। মেয়েটিকে আপন করে নেয়ার উগ্রবাসনা তাকে পাগল করে তোলে। স্ত্রী বানানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাকে দিশেহারা বানিয়ে দেয়। তাই চূড়ান্ত পর্ব বিয়ের পয়গাম পাঠায় সে অভিভাবকদের কাছে। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, তার এই পয়গাম প্রত্যাখ্যাত হয়। নারীর প্রতি পুরুষের অধিকার যেন অলঙ্ঘনীয়। যে কেউ তাকে প্রস্তাব দিক তাতে সাড়া দিতেই হবে। সাজুগুজু করে বধূবেশে স্বামীর পদধূলি নিতেই হবে! এর ব্যতিক্রম কিছু হলে ঘটবে হেনস্থা করা, এসিড ছোঁড়া কিংবা হত্যা করার মতো নৃশংস ঘটনা।

রূপালীর ভাগে জুটেছিল এর শেষটা। ঘটনার দিন রূপালীকে সুশীল জোর করে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং জোরপূর্বক তার

কপালে সিঁধুর মেখে দেয়। হিন্দুধর্মে কারও কপালে সিঁধুর মাখিয়ে দিলে সে তার স্ত্রী হয়ে যায়। কিন্তু রূপালী চায় নি এমন প্রীতিহীন, মমতাহীন সিঁধুরে নিজের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে। চায় নি এই কলঙ্কিত পথে সুশীলকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে।
এদিকে এই ঘটনা তাকে জীবন সম্পর্কে নিরাশ করে তোলে। এই অবাঞ্ছিত সিঁধুরের দাগ নিয়ে বাকি জীবন বাঁচতে চায় না সে। তাই ঝাঁপ দিয়েছে মৃত্যুসাগরে। এভাবেই মানববৃক্ষ থেকে ঝরে পড়ে অল্পবয়সী একজন তরুণীর জীবনপাতা।
এসব বিনাশী মৃত্যু কেবল মিজান, চাঁপারানী আর রূপালীদের ঘাড়েই বিষাক্ত ছোবল এঁকে দেয়নি, বরং যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে এই নৃশংসতা। খোলাসা করে বললে, ইসলামী সভ্যতা ও জীবনাচার থেকে মানুষের দূরত্ব যতই বাড়ছে, এসব অমানবিক ঘটনা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঘোষণা করেছিলেন, ইসলাম একদিন প্রত্যেকের ঘরে এভাবে প্রবেশ করবে যে, সুদূর সান‘আ থেকে একজন মানুষ হাজরামাউত পর্যন্ত সফর করবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে, একাকী। কিন্তু সে সময় এক আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কোনও ভয় তাকে চিন্তিত করবে না।
ইসলামের আদর্শে হয়েছিলও তা-ই। সুদূর বালাবাক্কু শহর থেকে একজন নারী গায়ে গহনা জড়িয়ে মক্কা-মদীনায় এলেও কেউ তার দিকে মুখটা পর্যন্ত তুলে তাকাতো না। সম্ভ্রম থাকত সম্পূর্ণ

নিরাপদ। কিন্তু আজ! জনসম্মুখে নারীকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। গণধর্ষণ করে ধর্ষিতা নারীর সম্ভ্রমলুটের চটকদার দৃশ্য ধারণ করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হচ্ছে আর তা দেখে দর্শকরা শিহরণে চোখ কচলাচ্ছে!

ইভটিজিংয়ের এই ছোঁয়াচে রোগটা ইদানিং খুব বেড়ে গেছে। পেপার-পত্রিকা, রেডিও-টিভি ও সভা-সমাবেশ করে এর বিরুদ্ধে যতই প্রচারণা চালানো হচ্ছে, এসম্পর্কে যুবক-তরুণদের আগ্রহ ততই বাড়ছে। আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, এটি আরও বেশি মহামারী আকার ধারণ করেছে আদালতের একটি রায়ের কারণে। ইভটিজিং একটি ব্যধি, একটি আযাব। আর আযাব আসে আল্লাহর নাফরমানীর কারণে। আদালত সেই 'আসা'টাকে সহজ করে দিয়েছে। কারণ, তারা রায় দিয়েছেন বোরকার বিরুদ্ধে। আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে। এই রায়ের মাধ্যমে প্রকারান্তরে ইভটিজিংকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কোনও কৃষক যদি ঘরের দরজা উন্মুক্ত রাখে, সেই দরজা দিয়ে ঢুকে চুরি করা চোরের জন্য কিছুমাত্র কঠিন থাকে না।

আমার মতে এই রায়ের মাধ্যমে যেন এই উদার কৃষকের ভূমিকা পালন করা হয়েছে। যেদিন এই লেখাটি লিখছি (৩০/১০/২০১০ইং), সেদিনের একটি সংবাদ আমাকে খুব

আশান্বিত করেছে। প্রধান বিচারপতি এবি এম খায়রুল হক বলেছেন, বিচারকরা আল্লাহ ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ[2]।

প্রধান বিচারপতির এমন একটি বাস্তব উপলব্ধি মিডিয়ায় প্রকাশ করায় আমরা তাকে সাধুবাদ জানাই। তিনি ঠিকই বলেছেন যে, একজন বিচারক কখনই দায়মুক্ত নন। বিশেষ করে আল্লাহর কাছে। মানবজাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিচারকগণকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি সামগ্রিক কল্যাণকর বিধানও দান করেছেন। যে কোনও বিচারক আল্লাহর সেই বিধান ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দায়বদ্ধ এবং যারা খামখেয়ালীবশত এই দায়বদ্ধতা উপেক্ষা করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ফাসেক-পাপী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ٤٧ ﴾ [المائدة: ٤٧]

'যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই ফাসেক-পাপী।' {সূরা আল-মায়েদা, আয়াত : ৪৭}

এই সূরার ৪৫ নং আয়াতে তাদেরকে জালেম আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

---

[2] আসলে এভাবে বলা জায়েয হয় নি। বলার দরকার ছিল, 'বিচারকরা আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। তারপর জনগণের কাছেও তারা দায়বদ্ধ।' কারণ, মুমিন আল্লাহর সাথে কাউকে (এবং) শব্দ দিয়ে বর্ণনা করে না। জনগণের ভয়ে কাজ করলে সেটা শির্ক হয়, তাকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর কাছেই জবাবদিহীর চিন্তায় কাজ করতে হবে। [সম্পাদক]

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝٤٥ ﴾ [المائدة: ٤٥]
পর্দা করা আল্লাহর বিধান। এর বিরুদ্ধে রায় দেয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে রায় দেয়ার নামান্তর। আর আল্লাহর বিরুদ্ধে রায় দিলে ওই সমাজে শান্তি আসবে কোত্থেকে? পর্দা-হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে বৃটেন, ফ্রান্স এই সব বিধর্মী দেশে। সেই ঢেউ আমাদের মতো মুসলিম দেশগুলোতে আছড়ে পড়বে কেন?

কেন 'পর্দার জন্য বাধ্য করা যাবে না' মর্মে রায় দেয়া হবে? অথচ কুরআনের নির্দেশ হলো পর্দার বিধান পালন করা। পর্দা পালনের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ﴾ [الاحزاب: ٥٩]

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিন নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের কাপড়ের কিয়দাংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়।' {সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৫৯}

আমরা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করছি যে, এই রায়ের পর থেকেই দেশে উদ্বেগজনকহারে ইভটিজিং, নারী নির্যাতন, ইভটিজিংয়ের কারণে খুন, হত্যা এবং আত্মহত্যা অধিকমাত্রায় বেড়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর গযব। এভাবে মহান সৃষ্টিকর্তার বিধান প্রকাশ্যে লংঘন ও বিরোধিতা করা হলে সেই সমাজে আল্লাহর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটা স্বাভাবিক। আজ সারা দেশে ইভটিজিংয়ের যে মাত্রা, তার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এটা উদ্বেগজনকহারে বেড়ে যাওয়ায় সবাই উৎকণ্ঠিত। সবাই

চাচ্ছে এর আশু সমাধান। কিন্তু যাতে সমাধান রয়েছে, সেই সমাধানটাকেই আদালত নিষেধ করে দিয়েছেন! কারণ, নারী উত্ত্যক্ত না হওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে এই আয়াতে। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- فلا يُؤذين 'পর্দার বিধান পালনের ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া (উত্ত্যক্ত করা) হবে না।

অবাক হতে হয় সৃষ্টিকর্তার অসীম জ্ঞানের কাছে মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান এবং এই ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে দুঃসাহস দেখানো দেখে। আল্লাহর আদালতের বিরুদ্ধে যাওয়া যে দুনিয়ার আদালতের জন্য শুভ নয়, তার প্রমাণ বর্তমান অবস্থা। এই অবস্থার নাজুকতা থেকে আমরা কেবল তখনই পরিত্রাণ পাব, যখন আমরা সৃষ্টিকর্তার বিধানের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা দেখিয়ে, পরম ভক্তিভরে তার বিধান পালন করা শুরু করব।

বন্ধুর পথে বধূর যাত্রা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اَلْعَاقُ بِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُوْثُ وَرَجلَةُ النِّسَاءِ-

'তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, স্ত্রীকে বেপর্দা ও পরপুরুষের সঙ্গে মিশতে দেয়া স্বামী, এবং পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী।' [নাসাঈ : ১/২৭৫]

এখানে আমি এমন একটি ঘটনা তুলে ধরব, যা এই হাদীস অমান্য করার করুণ পরিণতি হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে। আমার নিজ কানে শোনা ঘটনা এটা। মর্মাহত যুবক নিজ মুখে শুনিয়েছেন তার ব্যর্থতাভরা জীবনকাহিনী। তা শুনেছে অসংখ্য শ্রোতা।

যুবকের বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। পারিবারিকভাবে বেশ সম্ভ্রান্ত। ভাইয়েরা থাকেন আমেরিকায়। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার একটা উদ্যমী চেষ্টা কাজ করে তার মধ্যে সর্বদা। কিন্তু মাধ্যমিক ক্লাসে পড়ার সময়ই পিছুটান। আপন খালাতো বোনের তরফ থেকে প্রেমপ্রস্তাব পান তিনি। বিফলে আত্মহত্যা! এমন নিখাঁদ প্রেম আর হয় না! অন্য কোনও যুবক হলে হয়ত তৎক্ষণাত লাফিয়ে পড়ত এই গরম কড়াইয়ে। চিন্তা করত না নিজের ভবিষ্যতের কথা আর একজন অবুঝ কিশোরীর আত্মহত্যার মিথ্যা আস্ফালনের অসারতা। কিন্তু সুমন এক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। যৌবনের উন্মাদনার কাছে নিজেকে সঁপে না দিয়ে বাস্তবতার রুক্ষভূমিতে

পড়ে থাকেন দাঁতে কামড় দিয়ে অনেক দিন। খালাতো বোন লিলি (ছদ্মনাম)কে তিনি আগে পড়াশোনা শেষ করার পরামর্শ দেন। লিলি নিবৃত হয়, তবে একেবারে না। কিছুদিন পর আবার প্রেমের ডালি নিয়ে হাজির হয় সে সুমনের সামনে। একজন যুবতী নারীর পুনঃপুনঃ প্রেমপ্রস্তাব জোয়ারের পানির মতো আছড়ে পড়তে থাকে সুমনের জীবন-উপকূলে। ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে ভেঙে পড়তে থাকে বরফখণ্ডের মতো শক্ত সুমনের হৃদয়পাড়। প্রেম আর যৌবনের উচ্ছ্বাসের কাছে হার মানতে শুরু করেন তিনি। হৃদয় যদি ঈমান আর আল্লাহপ্রেমের শরাব দ্বারা সিক্ত না হয়, তাহলে একজন যুবতী নারীর পুনঃপুনঃ আহবানে সাড়া না দিয়ে থাকা একজন পুরুষের পক্ষে বেশ কঠিন ব্যাপারই বটে। তাই লিলির আহ্বানে সাড়া দিতে তিনি বাধ্য হন।

সুমনের পা পিছলে যাওয়ার এই ঘটনাটা ঘটেছিল ছাত্রজীবনে। সঙ্গত কারণেই তার পিতা-মাতা বিষয়টি মেনে নিতে প্রস্তুত হন নি। বিশেষ করে তার বাবা ছেলের এই বক্রপথচলাকে কোনোভাবেই মেনে নেন নি। সুমন প্রশ্রয় পেয়েছেন কিছুটা মায়ের কাছে, বাকিটা ভাবি শ্বাশুড়ী তথা খালার কাছে। দিন গড়ায় আর সুমন লিলিদের প্রেমের গাঁটও শক্ত-পোক্ত হয়। এখন আর প্রেম-প্রেমের লুকোচুরি খেলা সাজে না। তাই দুইজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন সংসার পাতবার। জন্মদাতা বাবা-মার যে দায়িত্ব ছিল, তারা সেই দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। পিতৃত্ব আর মাতৃত্বের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের বিয়ের

পিঁড়িতে বসলেন। যে মা পেটে ধারণ করেছেন এবং যে পিতা সংসারসমুদ্রের কঠিন দাঁড় বেয়ে সন্তানদেরকে মানুষ করার ঘাঁটে পৌঁছিয়েছেন, সেই মা-বাবা থাকলেন অজানাদের কাতারে। সুমন বঞ্চিত হলেন বাবা-মায়ের অকৃত্রিম দু'আ থেকে আর লিলি বঞ্চিত হলো মা-বাবাতুল্য শ্বশুর-শাশুড়ীর মাথায় হাত রেখে দু'আ নেয়া থেকে।

বিয়ের কারবার ঘটল খুলনায় সুমনের এক বন্ধুর বোনের বাসায়। লিলি পালাবার সময় বাড়ি থেকে প্রায় এগারো ভরি স্বর্ণ নিয়ে গিয়েছিল। তা থেকে নয় ভরি স্বর্ণ বিক্রি করল নব্বই হাজার টাকায়। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই লিলি তার আসলরূপ চেনাতে শুরু করে। উপার্জনহীন স্বামীর ওপর চাপাতে লাগল বিলাসিতার কঠিন বোঝা। বায়না ধরতে লাগল অপ্রয়োজনীয় বিলাসসামগ্রীর আয়োজন করে দেবার। কিন্তু একজন ছাত্র স্বামীর পক্ষে সম্ভব ছিল না তার এসব কঠিন বায়না পূরণ করা। তাই বাধ্য হয়ে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে রোজগারের উদ্দেশ্যে ঢাকামুখী স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন সুমন। তাকে সাহায্য করলেন এক সময়ের বন্ধু এক পুলিশ অফিসার। পল্টনের একটি অফিসে তাকে চাকরী জোগাড় করে দিলেন। তবে বেতন খুবই কম। মাত্র ৩২০০ টাকা। এই অল্প বেতন দিয়ে নিজের থাকা-খাওয়া এবং বিলাসী স্ত্রীর মনোবাসনা পূরণ করা পাথর কামড়ে খাওয়ার মতো কঠিন হয়ে উঠল সুমনের জন্য। এদিকে স্ত্রীর দাবি যে কোনও মূল্যে স্বামীর সঙ্গে থাকার। এসব বায়নায় রীতিমত চোখে সর্ষেফুল

দেখতে লাগলেন সুমন। শেষে অপরাগ হয়ে স্ত্রীকে তিনি ঢাকায় নিয়ে এলেন। এরই মধ্যে দাম্পত্যের চিরন্তন বাস্তবতার শাশ্বত স্বপ্ন প্রবেশ করে লিলির গর্ভে। কিন্তু লিলি সুমনের এই স্বপ্নটাকে মুহূর্তে মাটিচাপা দেয়। বাবার বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে পেটের বাচ্চাটাকে কী এক অদৃশ্য ইশারায় নষ্ট করে আসে সে।

এর কিছুদিন পর আবার সেই স্বপ্ন চুমো এঁকে দেয় সুমনের ভাগ্যাকাশে। এবার আর ভুল করেন নি সুমন। প্রশ্রয় দেননি লিলির 'বাপের বাড়ি যাওয়ার' আব্দার। সুমনের সচেতনতায় কোল আলো করে জন্ম নেয় সিনথিয়া নামের এক ফুটফুটে কন্যা। নতুন আমেজে নতুন আবেগে সংসার শুরু করেন তিনি। টানাটানির সংসারে ভাগ্যময়ূরী হয়ে আভির্ভূত হয় সিনথিয়া। ভাগ্যের সহায়তায় এক ডেভলপমেন্ট কোম্পানীতে চাকুরী হয় সুমনের। বেতন আগের চেয়ে বেশি। সেই সঙ্গে স্ত্রীকে গুলশানের এক কাপড়ের দোকানে সেলস্ম্যানের চাকুরী জুটিয়ে দেন তিনি।

এভাবে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ আয়ে সংসারের চাকাটা বেশ স্বাচ্ছন্দেই ঘুরছিল। কিন্তু লিলির সেই বায়না ধরা আর বিলাসিতার অভ্যাস কেটে যায় নি। বরং ঢাকার গরম বাতাস আর বিত্তবৈভবের ঝড় তার জীবনকে আরও আগ্রাসী করে তোলে। বায়নার তালিকায় যোগ হতে থাকে নতুন-নতুন নাম। এদিকে জামাতার সীমিত আয়ে শাশুড়ীও বিরক্ত হয়ে ওঠেন। সুমনের ভাষ্যানুযায়ী তার শাশুড়ী মেয়ে লিলির চেয়ে অনেক বেশি বিলাসী। এদিকে স্বামী একজন সামান্য বেতনের পোস্টমাস্টার। তাই তার দ্বারা বিলাসী

আয়োজন সম্পন্ন হতো না। আশা জাগত জামাইয়ের সহায়তা পাবেন। কিন্তু জামাইয়ের অবস্থাও তথৈবচ! তাই বিরক্ত শ্বাশুড়ী মেয়ের সুখচিন্তায় নতুন পথ বের করে নেয়ার তাগিদ অনুভব করেন। এসময়ে পরিচয় হয় আমেরিকা প্রবাসী লিলির দূর সম্পর্কীয় এক তথাকথিত ভাই মুজরিমের সঙ্গে। লিলির মা-ই তাকে লিলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয়সূত্রে মুজরিমের সঙ্গে এখন লিলির নিয়মিত যোগাযোগ হয়। তারা প্রাণ খুলে কথা বলে মোবাইলে। আস্তে-আস্তে সুমন থেকে মন উঠে যেতে থাকে লিলির। কিন্তু সুমন তাকে ভালোবেসে যান পাগলের মতো। নিজের জন্য কিছু না করে, নিজে না খেয়ে স্ত্রীর মনোবাসনা পূরণ করতে সচেষ্ট থাকেন তিনি। অফিসে কম্পিউটারের কাজ করতেন। অনেক সময় উপরি কামাই হতো তার। সেই উপরি কামাইটা তুলে রাখতেন প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্য। ভালোবাসার রংধনুতে যোগ করতে চাইতেন নতুন-নতুন বর্ণ।

কিন্তু নারীমন পাঠ করা নাকি বিধাতা ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই এই নারীমনে গজিয়ে ওঠে হাজারও নতুন চারা। আমেরিকার ছেলেটির সঙ্গে নিয়মিত মোবাইল যোগাযোগে তার চিন্তার পাখায় যোগ হয় নতুন-নতুন পালক। জেগে ওঠে নতুন স্বপ্ন। ব্যাপারটি আঁচ করতে পারেন সুমন। তাই স্ত্রীকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে ভালোবাসার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেন। কিন্তু ভালোবাসার বিশ্বাসে তার মানসিকতা উদার। **তাই**

যেখানে ছাড় দেয়া অপরাধ, সেখানেও ছাড় দেন। মরার আগেই নিজহাতে খনন করেন নিজের কবর!
প্রথমে লিলির মোবাইল জব্দ করেন তিনি। সেই মোবাইলের সিমটা ছিল মোবাইল টু মোবাইল সিস্টেমের। দেশের বাইরে কল যেত না। আমেরিকার ছেলেটি কল করলেই তবে তার সঙ্গে কথা হত। কিন্তু এই মোবাইল বিক্রি করার পর লিলির পীড়াপীড়ি বেড়ে যায়। অনেক কষ্ট করে সাড়ে চার হাজার টাকা দিয়ে তিনি আরেকটি মোবাইল ও সিম কেনেন। মোবাইলটা **০১৭১৫...** ডিজিটের। হীতে বিপরীত হয় সুমনের। ঘোল বেঁচে দুধ পেয়ে যায় লিলি। আর সুমন মেঘ থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেন পরনালার নিচে! কেননা, এই সিমটি আইএসডি। বিশ্বের যে কোনো স্থানে অবাধে কল যায়। আমেরিকান ছেলেটি লিলির হাতের মুঠোয় এসে যায়। এবার শুধু তার কলের অপেক্ষা নয়, সে নিজেও তাকে কল দেয়। এভাবে পরকীয়ার আগুনেখেলায় মেতে ওঠে লিলি, আর তাকে সাহায্য করছিলেন স্বামী সুমন নিজের অজান্তেই!
এভাবে অশুভ এক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সুমন। পিতামাতার অমতে পালিয়ে বিয়ে করার রেশ এখনও কাটেনি। স্তন্যদাত্রী মা ছেলের অপরাধ ভুলে স্নেহদান করলেও পিতা ছেলের অপরাধ ক্ষমা করেন নি। তাই স্বরচিত বিয়ের পিঁড়িতে বসার পর আজও বাড়ির পথে পা মাড়ানোর সুযোগ আসে নি সুমনের তরে। সঙ্গত কারণেই স্ত্রীর কাছে সব ভালোবাসা, সব স্নেহ, সব আদর

আর সব অনুপ্রেরণা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন তিনি। কিন্তু স্ত্রী ভালোবাসার কৃত্রিম অভিনয়টুকু প্রদর্শন করতেও সক্ষম হয় নি !

আরেকটি চরম ভুল করেছিলেন স্বামী সুমন। একবার আমেরিকা থেকে মুজরিম মূল্যবান কিছু উপহার পাঠিয়েছিল লিলির নামে। মূল্যবান বলতে পশ্চিমা সভ্যতার প্রতীক হরেক রকমের বিলাসী ও প্রসাধনী সামগ্রী। এই গিফ্টবক্সটি নিজ হাতে বহন করেন সুমন! প্রথমে বোঝেননি কী বহন করছেন তিনি। পরে বুঝেছিলেন এটা গিফ্টবক্স নয়, তার স্বামিত্বের মৃত্যুপরওয়ানা!

এই বক্সটি লিলির মনবাগানে সাজানো সুমনের ভালোবাসার সবগুলো ফুলগাছের গোড়া থেকে রস চুষে নেয়। জন্ম দেয় নতুন একটি চারা। এই চারাটি মুজরিমের প্রতি ভালোবাসার চারা। সুদূর আমেরিকা থেকে এই চারায় রস সিঞ্চন করত মুজরিম। এই গিফ্টবক্স লিলির অন্তরে আমেরিকার মানচিত্র এঁকে দেয়। যে মানচিত্রে তার দাম্পত্যের পতাকা বহন করবে- স্বামী সুমন নয়- মুজরিম!

এদিকে লিলিকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যান তার মা ও সুমনের শ্বাশুড়ী কাম আপন খালা। তারই ইশারায় দেশে আসে মুজরিম। চোখইশারা গোপনীয়তায় লিলি, তার মা এবং মুজরিমের মধ্যে একটি ‘গোপন দলিল’ সম্পাদিত হয়। সুমনের কল্পনা সীমানার বাইরে সংকলিত হচ্ছিল এসব দলিল।

মুজরিম দেশে আসার পর লিলির ব্যস্ততা বেড়ে যায়। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ছোটাছুটি করতে দেখা যায় তাকে। ব্যস্ত সুমন

দিনের বেশির ভাগ সময় কাটান অফিসে। এ সময় সুমন স্ত্রীকে সময় দিতে পারেন না। কিন্তু লিলির তাতে যে আক্ষেপ নেই, আছে স্বস্তি! তার এই অক্ষমতাকে প্রাণভরে উপভোগ করে সে। সারাদিন ঘুরে বেড়ায় মুজরিমের সঙ্গে। আর মুজরিমের মুখে আমেরিকার গল্প শোনে। গল্পে-গল্পে তার মন উদাস হয়ে যায়। উদাস দৃষ্টি মেলে সে তাকায় এমন এক শূন্যতায় যেখানে আর সবই থাকবে কিন্তু 'পথের কাঁটা' সুমন থাকবে না!

মধ্যবাড্ডায় বাসা। সেখান থেকে গুলশানের আমেরিকান এম্বেসিটা খুব দূরে নয়। এদিকটায় তাকে বেশি আসতে দেখা যায়। সুমনের মধ্যে এখানেও সরলতা কাজ করে। স্ত্রীর এই অস্থিরতাকে তিনি অনুবাদ করেন সাধারণ ঘটনা বলে। দেখেও না দেখার ভান করেন এসব ঘটনা। একপর্যায়ে মুজরিম আবার আমেরিকায় পা রাখে। থেমে যায় লিলির অস্থিরতা, চিলতে শংকাটা কেটে যায় সুমনের।

এর বেশ কিছুদিন পর লিলির কাছে তারই নামে করা একটি আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট এবং আমেরিকান ভিসা আবিষ্কার করেন তিনি। প্রথমে অবাক হয়ে যান তার হাতে ভিসা দেখে। জিজ্ঞেস করলে নিতান্ত স্বাভাবিক গলায় জবাব দেয় লিলি- এমনিতেই করে রাখলাম আর কী! তাছাড়া ভিসা জিনিসটা তো আর খারাপ কিছু নয় যে, কোনও নারীর কাছে তা থাকতে পারে না! এটা ছিল ঝড়ের পূর্ভাবাস। কিন্তু সুমনের দৃষ্টিতে সাগর ছিল খুবই শান্ত!

একমাত্র মেয়ে সিনথিয়া এখন চার বছরের আদুরে খুকিটি। অফিসফেরা বাবাকে দেখে উদ্বেলিত হয় তার শিশুমন। বাবাকে ঝাঁপটে ধরে শিশুসুলভ মমতায়। এটা এখন সুমন ও সিনথিয়ার নিত্যরুটিন। কিন্তু একদিন অফিস থেকে ফিরে ব্যতিক্রম দেখলেন সুমন। তার পদধ্বনিতে আজ চঞ্চল হলো না সিনথিয়ার প্রাণ। ঘরে ঢুকে খা-খা করা শূন্যতা অনুভব করলেন তিনি। স্ত্রী লিলি ও আদরের কন্যা সিনথিয়া কেউ নেই সেখানে। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন তিনি। পাশের ফ্ল্যাটের এক মহিলার কাছে লিলির খবর জিজ্ঞেস করলে তিনি যে তথ্য দিলেন, তা বড় কলেজের পাঠক না হলে বরদাশত করতে পারবেন কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। ওই মহিলা জানালেন, কয়েক ঘণ্টা আগে সিনথিয়াকে আমার কাছে দিয়ে লিলি কোথায় যেন গিয়েছে এবং বলে গেছে, ওর বাবা আসা পর্যন্ত আপনি ওকে দেখে রাখবেন। সেই থেকে সিনথিয়া একাকি বসে-বসে কাঁদছে।

প্রথমটায় ধারণা করতে পারেন নি সুমন। একাধিকবার কল্পনা শক্তি ব্যয় করেও লিলির গন্তব্য আবিষ্কার করতে পারলেন না। অবশেষে ফোন দিলেন শ্বাশুড়ীকে। শ্বাশুড়ী উত্তাপ ও অনুশোচনাহীন কণ্ঠে বললেন, সে তো মুজরিমের সঙ্গে আমেরিকায় চলে গেছে!

সুমন জানিয়েছেন, যে নারী তাকে না পেলে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছিল, সেই নারী পাসপোর্টের ঠিকানায় স্বামীর কোঠায় সুমনের জায়গায় মুজরিমের নাম লিখে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে! যে

শ্বাশুড়ী তাকে তার মেয়েকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, সেই শ্বাশুড়ীই মুজরিমের কাছে বিলাসী যিন্দেগীর আশ্বাস পেয়ে কন্যাকে বৈধ স্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মুজরিমের হাতে তুলে দিয়েছেন!

পাঠক! এর পর সিনথিয়া সুমনের কী হয়েছিল, লিলি মুজরিম কী পরিমাণ সুখ পেয়েছিল সেসব কাহিনী আমি আর বলতে চাই না। আপনি শুধু কল্পনা করুন, লিলি, লিলির মা আর মুজরিমের বর্বরতার কথা, যারা মাত্র চার বছরের একটি নিরপরাধ মেয়েকে মাতৃত্বের স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে। সুন্দর ও গৌরবময় ভবিষ্যত থেকে বঞ্চিত করেছে। সুমনের ভালোবাসা লুট করে তাকে দিয়েছে কলঙ্কের দাগ।

একজন মা কি করে পারে নিষ্পাপ সন্তানকে অন্যের হাওয়ালা করে, স্বামীর বন্ধন ছিন্ন করে পরপুরুষের সঙ্গে নতুন ঘর করার উদ্দেশ্যে আপন ঘর ছেড়ে যেতে? আর একজন মা-ই বা কি করে পারে স্বামী সন্তান ছেড়ে মেয়েকে পরপুরুষের সঙ্গে চলে যেতে উৎসাহিত করতে?

সিনথিয়া আজ মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত। বাবার পক্ষে সম্ভব নয় মায়ের মতো স্নেহ দেয়া। তার সেবা করা। তাই মেয়েকে সুদূর খুলনায় ফুফুর কাছে রেখে লেখাপড়া করাচ্ছেন। সিনথিয়া বঞ্চিত মায়ের আদর আর বাবার স্নেহ থেকে। সুমন বঞ্চিত সন্তানের মুখের বাবা ডাক শুনতে। কারণ, সিনথিয়া তার ফুফুকে মা আর ফুফাকে আব্বা বলে ডাকে। আর সুমনকে ডাকে মামা বলে!

মায়ের বদলায় দাদীর স্নেহ পাওয়ার অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত। কেননা, ছেলের মতো নাতনীর জন্যও দাদা বাড়ির সদর দরজাটা বন্ধ করে রেখেছেন। আর নানীতো কন্যার নতুন নীড় রচনায় পুরাতন সব 'আবর্জনা' মুছে ফেলতে মরিয়া। সুমন স্বীকার করেছেন, লিলি সম্পদের যে প্রাচুর্য দেখে মুজরিমের হাত ধরে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল, সেই সম্পদ এখন তার হাতে গড়াগড়ি খায়। মাসে তিনি এখন লাখ-লাখ টাকা আয় করেন। একটু ধৈর্য ধরলে আজ সে সম্পদের মধ্যে লুটোপুটি খেত। কিন্তু এই ধৈর্য্য ধরার সাহস সে দেখায় নি।

আমি মনে করি, শুধু অর্থ বিত্তই এই লাঞ্ছনার জন্য দায়ী নয়। অবাধ ও পর্দাহীন জীবনও এর জন্য দায়ী। এরূপ জীবন এভাবে একের পর এক করুণ ঘটনার জন্ম দিয়ে যাবে।

পাঠক! প্রেম, পরকীয়া ও বেপর্দার পরিণাম কত নিন্দনীয় এই ঘটনা উল্লেখ করার পর তা পুনর্ব্যক্ত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। [সূত্র : ০১/০৪/২০১০ ইং তারিখে রেডিও আমার-এ দেয়া সুমনের নিজস্ব সাক্ষাৎকার]

আঁধারের পাপযাত্রা

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে ইরশাদ করেন-

﴿ قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الاعراف: ٣٣]

‘বলুন, আমার প্রভু প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের অশ্লীলতা হারাম করেছেন।’ {সূরা আ‘রাফ, আয়াত : ৩৩}

আলোচ্য আয়াতে সবধরনের অশ্লীলতাকে হারাম ও তা থেকে সব লোককে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বস্তুত অশ্লীলতা এমন এক পাপ, যা মানবজাতির ভিত্তিকে চরমভাবে দুর্বল করে দেয়। মানবসভ্যতার অনেক ধ্বংসলীলা সাধনের মূল ইন্ধন হিসেবে কাজ করে এই অশ্লীলতা। কখনও ক্ষুদ্রাকারে, কখনওবা বৃহদাকারে। ক্ষুদ্রাকারের একটা ঘটনাই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এখানে :

ঘটনাটা সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার কোনও এক গ্রামের। তাহমিনা (ছদ্মনাম) জনৈক পুলিশ কর্মকর্তার মেয়ে। একজন নারীর জন্য পর্দা, শালীনতা আর আত্মমর্যাদার গুরুত্ব যে কত, তা হয়ত ভুলেই গিয়েছিলেন তাহমিনা। একদিন শখ জাগল সিনেমার বড় পর্দায় ছবি দেখবেন তিনি। শখের দাম লাখ টাকা! তা পূরণ করতেই হবে। তাই একদিন আপন ভাইকে নিয়ে রওয়ানা হলেন সিনেমার উদ্দেশ্যে। হয়ত সবার চোখকে ফাঁকি দিতে বেছে নিলেন রাতের গভীরতাকে। ঠিক করলেন রাত দশটার শো দেখবেন।

এই পদক্ষেপে ভালো মানুষকে ফাঁকি দিতে পারলেও, যাদের চোখ ফাঁকি দেয়ার দরকার ছিল, তাদের চোখ ফাঁকি দিতে ব্যর্থ হলেন তাহমিনা। কারণ, এসব লোক তো রাতের পথিক, নিশিচর, আঁধারের সজাগ বাসিন্দা! যাদের চোখ ফাঁকি দিতে পারলেন, তাদের চোখ ফাঁকি না দিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। এদের চোখ ফাঁকি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল ভীষণ। কেননা, এদের হাতে মানুষের অনিষ্ট সাধিত হয়, মানুষের জীবনকে এরা কালিমাযুক্ত করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এদের কাছে হেরে গেলেন তিনি।

ওই আঞ্চলিক ভাষায় 'জাইরা' নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছিল খাইরুল (ছদ্মনাম)। তার কাজই ছিল মানুষকে কষ্ট দেয়া, এ ধরনের নিশাচর যাত্রীর ইজ্জত হনন করা। আর কোনও যাত্রী যদি নিজেই তার পথ সহজ করে দেয়, তাহলে তো কথাই নেই। তাই সুযোগের সন্ধানে ওঁৎ পেতে থাকা খাইরুলের দৃষ্টি তিনি এড়াতে পারলেন না।

সিনেমার রুপালী পর্দায় যখন খলনায়ক কর্তৃক নায়িকার শ্লীলতাহানী বা ধর্ষণের কল্পিত দৃশ্য প্রদর্শন করা হচ্ছিল, তখন খাইরুলের প্রযোজনায় পরিচালিত হচ্ছিল এসব দৃশ্যের বাস্তব অবতারণার। এর পরিচালক, প্রযোজক ও নায়ক ছিলো সেই খাইরুল। সঙ্গে তার একদল দঙ্গল খলনায়ক।

কল্পিতমঞ্চে যে শ্লীলতাহানীর ঘটনা ঘটে, তার জন্য শোক-তাপ করার প্রয়োজন নেই। কারণ, তাতে নায়িকার ইজ্জতের গায়ে সামান্য আঁচড়ও কাটে না। কিন্তু জীবনের বাস্তবমঞ্চে যে ঘটনা

ঘটে, সেসব ঘটনার অশ্রুপাত করবে কে? আর তাতেই লাভইবা কতটুকু?

যা হোক, সিনেমার দৃশ্য শেষ করে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন তাহমিনা। রাত তখন দেড়টার কম যায় না। নিশিচরের মত নিঃশব্দে এগিয়ে চলছিলেন তারা। বাড়ির খুব কাছে এসে পড়েছেন। দূরত্ব মাত্র মিনিট কয়েকের। আবছা আঁধারের নির্জন স্থানটাতে পা রাখতেই অপ্রস্তুত যুবতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খাইরুল ও তার সাঙ্গরা। বখাটেরা ভাইয়ের মুখ চেপে ধরে রেখেছিল যাতে বোনের ইজ্জতহননের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করতে না পারেন পিতৃপ্রাপ্য চিৎকার ধ্বনি দ্বারা। কিন্তু এই নির্জন রজনীতে বোনের ইজ্জতহরণের ঘটনাটা ভাইয়ে নিজের মুখে প্রচার করতে চায় নি বলে লম্পটরা নির্বিঘ্নে তাদের কামনার আগুন নির্বাপিত করে। নির্যাতিতার মুখে সম্ভ্রম রক্ষার অদৃশ্য তালা, আর ভাই বাকরুদ্ধ এক অন্ধ দর্শক!

বিনামূল্যে ইজ্জত বিক্রি হওয়ার এই ঘটনা প্রকাশ হয়ে যেতে তেমন সময় নেয় নি। গ্রাম্য মোড়লেরা তাদের বিবেকের ঠুনকো আদালত কায়েম করে অপরাধী বখাটেদের মাত্র কয়েকটি জুতার বাড়ির শাস্তির বিধান সাব্যস্ত করে। গুরুপাপের লঘুদণ্ডে উল্লাসে মেতে ওঠে খায়রুল। হাসে মুখ টিপে। আরও দুর্বার হয়ে উঠেছিল তার ও তার অনুসারীদের পাপযাত্রা। এই যাত্রার শেষ কোথায় জানি না। তবে এই যাত্রা রোখার উপায় একটাই- আল্লাহর

বিধানের সামনে নিঃশর্ত আনুগত্য করা, বেপর্দার আঁধার থেকে পর্দার আলোয় ফিরে আসা।

দেবর : ছদ্মবেশী মৃত্যুদূত

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قَالَ: اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ : اَرَاَيْتَ ا لْحَمْوَ ؟ قَالَ اَلْحَمْوُ اَلْمَوْتُ-

'উকবা ইবন আমের (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আলাইহিসসালাম ইরশাদ করেন, সাবধান! তোমরা পরনারীর কাছে ঘেঁষা থেকে বিরত থাকবে। তখন জনৈক আনসারী বললেন, দেবর সম্পর্কে বিধান কী? তিনি বললে, দেবর হচ্ছে মৃত্যু।' [বুখারী : ৫২৩২]

হাদীসে দেবরকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আসলে কি তাই? সত্যিই কি দেবর মৃত্যুতুল্য? নাকি হাদীসের অন্তর্নিহিত কোনও অর্থ উদ্দেশ্য? মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে আসুন এ ব্যাপারে ইসলামী মনীষীদের বক্তব্য জেনে নিই। পাঠক! ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য না হারানোর অনুরোধ করছি।

এর ব্যাখ্যায় আবূ উবায়দ (রহ.) বলেন, ভাবীর মৃত্যু হলেও সে যেন দেবরদের দেখা না দেয়। ইমাম খাত্তাবী (রহ.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ মৃত্যুকে যেভাবে ভয় করে, দেবরকেও সেভাবে ভয় করা উচিত। [আ'লামুল হাদীস : ৩/২০২৫]

আল্লামা উব্বী রহ. বলেন, 'নারীরা যেন পরপুরুষ ও দেবরদের সঙ্গে নিভৃতে না মেশে। কেননা, এতে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এমন পাপ হয়ে যেতে পারে, যা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক।'

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, দেবরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত, মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ার মতোই ভয়ানক ও ক্ষতিকর। [ফাতহুল বারী : ৯/২৪৩]

মনীষীগণের এসব বক্তব্যে ফুটে উঠেছে দেবরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতির কথা। কিন্তু জনৈক কবি আরও কঠিন সত্য একটা কথা বলেছেন, যা আজকের ঘটনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। তিনি বলেন :

لاَ يَامَنَنَّ عَلَى النِّسَاءِ اَخٌ اَخًا
مَا فِى الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ اَمِيْنٌ

'স্ত্রীর বেলায় কোনও ভাই তার ভাইয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কেননা, কোনও নারীই কোনও পুরুষের ব্যাপারে নিরাপদ নয়।' [আদিল্লাতুল হিজাব, পৃ: ৫৩]

তো মনীষীগণের এসব বক্তব্য কি আপনার কাছে কাঠখোট্টা টাইপের নিরস মন্তব্য বলে মনে হয়? মনে হয় রূপ-রসের মাহাত্ম্য বুঝেন না- এমন সব লোকের মন্তব্য? আল্লাহ না করুন, যদি তা-ই হয়, তাহলে এসব মন্তব্য-বক্তব্যের বাস্তবতা অনুমান করার জন্য আমাদের সমাজে ঘটে যাওয়া দুয়েকটি ঘটনা জেনে নিন। 'ছোটবোনের দেবর, তাই বাসায় আসা-যাওয়া করলেও বাধা দেয়া হয়নি'।

প্রথম কথাটি মুক্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের। আর দ্বিতীয় এই কথাটি হাসিনা রব্বানী নামের কন্যাহারা এক মায়ের।

পাঠক! আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারবেন নিশ্চয়ই। বুঝতে পারবেন, নবী আর নবীর উম্মতের কথার ব্যবধান কত বেড়ে চলেছে! যার কথায় কোনও সন্দেহ নেই, যিনি কথা বলেন ওপরওয়ালার ইশারায়, তার কথা আর তার উম্মতের কথার মধ্যে ব্যবধান কত বেড়ে চলেছে তা অনুমান করতে সম্ভবত কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এই ব্যবধানের ফল কত ভয়াবহ, কত হৃদয়বিদারক তা বুঝানোর জন্যই আজকের ঘটনার অবতারণা। নবী ও তাঁর উম্মতের মধ্যে দূরত্ব যত বাড়ে, উম্মত তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধ্বংসের পথে তার যাত্রা বেগবান হয়। দেখুন :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেবরকে মৃত্যু আখ্যায়িত করে তাকে দূরে রাখতে এবং তার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার কথা বললেন। কিন্তু উম্মতের কাছে হয়ত তা গুরুত্বহীন বলে মনে হয়েছে, আমল পরিত্যাগযোগ্য বলে মনে হয়েছে। আর এরকম ধারণার ফল যে শুভ নয়, তা-ই প্রমাণিত হলো মেনকার ঘটনা দ্বারা।

ঘটনাটা ২০১০ইং সালের জুলাই মাসের। সম্ভবত ৫ তারিখের হবে। রাজধানীর পাইকপাড়ায় নিজ কক্ষে নিহত হন ইডেন কলেজের মেধাবী ও সুন্দরী ছাত্রী মোহসিনা রব্বানী মেনকা। বয়সে কাঁচা, মাত্র তেইশ বছর। দুনিয়ার রূপ-রস, স্বাদ-গন্ধ পাওয়ার আগেই দুনিয়াকে সালাম জানাতে হলো আল্লাহর শুধু একটি বিধান লঙ্ঘন করার কারণে, যার দায় তার, তার পরিবারের এবং আমাদের এই ঘুণেধরা সমাজের প্রত্যেকের।

মেনকা নিহত হয়েছেন খুব কাছের একজন মানুষের হাতে। যাকে এক সময় তিনি ভালোও বেসেছিলেন। লোকটার নাম তারেকুজ্জামান কবির। খুনি নিজে এবং পুলিশ স্বীকার করেছে, প্রেমঘটিত কারণে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।
বিস্তারিত দেখুন :
মেনকার খালা জেসমিনের দেবর এই কবির। আল্লাহর বিধান-পর্দা লঙ্ঘনের সুযোগে সম্পর্কে ভাগিনীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে সে। এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার কিছু দিন পরেই সে মালেয়শিয়ায় চলে যায়। ফলে সম্পর্কের জোয়ারে কিছুটা হলেও ভাটা পড়ে।
কিছু দিন মালেয়শিয়ায় কাটিয়ে ২০০৯ই সালের শেষের দিকে দেশে ফিরে আসে কবির। ফিরে এসেই জোরদার করতে চায় আগের সেই প্রেমের সম্পর্ক। ঘষে-মেজে চকচকে করতে চায় হৃদয়ের মরচেপড়া বন্ধন। কিন্তু ততদিনে নদীর স্রোত গড়িয়েছে অনেক দূর। পানির জোয়ার আর আগের জায়গায় বহাল নেই। বহমান ধারায় তা আজ মিশে গেছে অন্য কোনও মোহনায়। মেনকার বেলায়ও তা ঘটতে পারে এবং তা-ই স্বাভাবিক। আর সেই স্বাভাবিকতার কারণেই তিনি কবিরকে অস্বীকার করতে শুরু করেন। যে সম্পর্কে ভাটা পড়েছে, তাতে আবার নতুন করে জোয়ার আনা দরকার কী? এই চিন্তা-ভাবনা মেনকার।
কিন্তু তাতে চলে না কবিরের। তার চাই আগের মতো হৃদয়ের উত্তলতা, ভালোবাসা, উচ্ছ্বলতা। তাই মেনকার মন জয় করতে

মরিয়া হয়ে ওঠে সে। কিন্তু কিছুতেই কাজ হচ্ছিল না। অটল পাহাড়ের মতো নিজ সিদ্ধান্তে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন মেনকা। ফলে জীবনের সবচেয়ে নির্মম সিদ্ধান্তটা নেয় কবির। শেষবারের মতো মেনকাকে তার ভালোবাসা নিবেদন করে তার কাছে আসতে চায়। কাজ হলে ভালো, না হলে সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন।

পরিকল্পনামতো ঘটনার আগের দিন বুধবার রাতে মেনকার মোবাইলে ফোন দেয় কবির। সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে, আগামীকাল আমার সিঙ্গাপুরের ফ্লাইট। তোমার সঙ্গে শেষবারের মতো একটু দেখা করতে চাই। সরলতা নারীর মাতৃপ্রদত্ত গুণ। এই গুণের সুবিধা নিয়ে কত মানুষ যে তাদের স্বার্থ সিদ্ধ করেছে, কোনও মানুষের পক্ষে তার হিসেব করা সম্ভব নয়। নারীসুলভ এই সরলতা ধ্বংসের চিরকুট হয়ে আসল মেনকার ঠিকানায়। কিন্তু তিনি তা বুঝতে না পেরে খুব সহজ ভাষায় পাঠ করলেন এই চিরকুটটি। অনুমতি দিলেন কবিরকে দেখা দেবার।

অনুমতি পেয়ে পরের দিন বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে কবির মেনকাদের বাসায় আসে। কন্যার খুনের দূত কবিরকে স্বাগত জানান মা হাসিনা বেগম রব্বানী। চিরসত্য ভুলটি তিনি করে বসেন সেদিনও। একজন বেগানা পুরুষকে বসতে দেন একেবারে মেনকার ঘরে। তার বেডরুমে।

দুপুরে খানাদানাও হলো মেনকার সঙ্গে। খানা খাওয়া শেষ করে আবার মেনকার কক্ষে মেনকা ও তার মা মিলে কবিরের সঙ্গে আলাপচারিতায় লিপ্ত হলেন। কিছুক্ষণ পর মা বললেন, তোমরা

কথা বলো, আমি একটু বিশ্রামে যাবো। হিংস্র হায়েনার মুখে কলজেছেঁড়া ধন মেয়েকে অসহায়, একা ফেলে মা চলে গেলেন বিশ্রাম করতে! সম্ভবত এই একটি ভুলের জন্য সারা জীবন ক্রন্দন করতে হবে তাকে, আঁখিজলে সিক্ত করবেন স্নেহের আঁচল।

এবার বাঁধহীন স্বাধীনতা পেয়ে যায় কবির। মেনকাকে ঘরে একা পেয়ে দানব হয়ে যায় সে। ফরিদপুরের গ্রামের বাড়ির পাশের গ্রামের এক কর্মকারের কাছ থেকে আড়াইশ টাকা দিয়ে সে একটা ছোরা বানিয়ে এনেছিল। সেটি মেনকার বিছানার এক পাশে রেখে কবির জানতে চায়, তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছো কেন?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মেনকা বলে, বুয়েটের এক ছাত্রকে আমি ভালোবাসি। তার সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। একথা শুনে পরিত্যাজ্য প্রেমিকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। সে ছুরি দেখিয়ে বলে, এই ছুরি দিয়ে তোমাকে এবং তোমার মাকে হত্যা করব!

কবিরকে মৃত্যুদূত ভাবতে কষ্ট হয় মেনকার। একজন ভালোবাসার মানুষ- যদিও তা সাবেক এবং এখনও সে নাকি মেনকাকে ভালোবাসে- তার দ্বারা রক্তপাতের আশা করা যায়! তাই মেনকাও তা করেন নি। শিশু বাচ্চার মতো হো হো করে হেসে উঠেন তিনি। কারণ, ভালোবাসার মানুষকে হত্যা করার হুমকিকে নিরস কৌতুক ছাড়া আর কী-বা ভাবা যেতে পারে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেবরকে- চাই সে খালার দেবর হোক-না কেন- মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু

সে খবর মেনকার থাকলে তো! তাই এই হুমকি পাওয়ার পরেও বাঁচার কোনও চেষ্টা করলেন না তিনি।

আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনে পটু কবিরদের কোন কিছুতে বাঁধে না। তাই সত্যি সত্যিই ছুরি ব্যবহারের কার্যকারিতা দেখায় সে। প্রথমে সে মেনকার পেটে আঘাত করে। এরপর চলে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত। অসহায় নিরস্ত্র মেয়েটি বাঁচার জন্য তার শেষ অস্ত্র ব্যবহার করেন। চিৎকার দিয়ে ওঠেন সর্বশক্তি ব্যয় করে। চিৎকার করে ডাকেন মাকে। প্লাবিত রক্ত আর কন্যার আর্তচিৎকারের পর কোনও মা কি পারেন আরাম করতে? শুনেছি, অনেক দূরে থাকলেও নাকি মায়েরা সন্তানের বিপদের কথা আঁচ করতে পারেন। মেনকার 'মা' ডাক আর আর্তচিৎকার তাই আঘাত করে মেনকার মায়ের কলিজায়। তিনি ঘুম থেকে উঠে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতে বলেন। তিনি বাইরে থেকে শুনতে পান বুকের ধন মেয়ের আত্মচিৎকার, মা মা আর বাবা শব্দের হৃদয়বিদারক ডাক। শুনতে পান মেয়ের দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের কলকল ধ্বনি। তাই তিনি মাতৃকূলের সব মমতা আর উদ্বিগ্নতা নিয়ে কবিরের তরে দরজা খোলার আকুতি জানান। কিন্তু কবির তাতে কর্ণপাত করে নি। কেন সে করবে? সে যে আজ চেনা সেই কবির নয়- মৃত্যুদূত!

মায়ের সাধ্য হলো না অন্তিমপথের যাত্রী কন্যার মুখে এক ফোঁটা পানি তুলে দিতে। কারণ, তিনি একজন নারী। আর একজন নারীদেহে ঘরের শক্ত দরজা ভাঙার মতো শক্তি থাকার কথা নয়!

এভাবে কেটে যায় কিছুক্ষণ। মহাকালের পথের পথিকের খাতায় নাম রেজিস্ট্রেশন করার কাজ শেষ হয় মেনকার। মৃত্যু নিশ্চিত করে দরজা খুলে পাহলোয়ানের মতো গর্বভরে কবির বলে, আমি আপনার মেয়েকে খুন করেছি। পুলিশে খবর দেন!

এভাবে রচিত হয় একটি বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড। মেধাবী মেনকার রক্তে ভেসে যায় নিজেরই কক্ষ। মা-বাবার একমাত্র কন্যা মেনকা ভালো মেয়ে ছিলেন। তার নামে কোনও খারাপ রিপোর্ট ছিল না। গর্ভধারিণী মাও তাকে ভালো মেয়ে বলে আখ্যায়িত করেছেন। মহল্লার লোকেরাও তা-ই বলেছে। ইডেনে পড়াশোনার পাশাপাশি এফ এম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষকতা করতেন তিনি। সেই স্কুলের সহকর্মীরাও তাকে ভাল মেয়ে বলে রায় দিয়েছেন। শিক্ষক রাশেদুল এবং কারী মোঃ রাশেদুল ইসলাম বলেন, ‘এক বছর মেনকা তাদের সঙ্গে শিক্ষকতা করেছেন। তার মতো ভালো, ভদ্র ও মার্জিত শিক্ষক কমই চোখে পড়েছে।’

তো সকলেই তাকে ‘ভালো মেয়ে’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তারপরেও তাকে কেন এই অশুভ পরিণতির শিকার হতে হলো? কী এক শূন্যতা, অপূর্ণতা ভর করেছিল তার জীবনে? পাঠক! আমার সঙ্গে একমত হবেন কী যে, সেই শূন্যতাটা ছিল পর্দা? অভিশপ্ত মুক্তবাসই কী কবিরকে তার রক্তপিয়াসী করে তুলেছিল না? যদি পর্দার বিধান পালিত হতো, নিজেকে যদি তিনি কবিরের বিষাক্ত দৃষ্টি থেকে দূরে রাখতেন, সে তার প্রতি আকৃষ্ট হতো না, দেবর হিসেবে যতটুকু সম্মান ইসলাম তাকে দিয়েছে,

ততটুকুর মধ্যেই তার পরিবার সংক্ষেপিত থাকতেন, তাহলে কী এমন একটি করুণ মৃত্যু আমাদেরসহ সকলের চোখের পানি ঝরাতো? পর্দার বিরুদ্ধে জেহাদে নামা এই সমাজের কে দেবে এমন একটি নির্মম প্রশ্নের সঠিক জবাব?

অরক্ষিত সম্ভ্রম

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ إلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ-

আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী কোনও নারী যেন মাহরাম পুরুষ অথবা স্বামী ছাড়া সফর না করে।’ [বুখারী : ১০৮৮]

আলোচ্য হাদীসে রয়েছে নারীর মর্যাদা, সম্মান এবং সর্বোপরি তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি। শরীয়তপ্রদত্ত এই নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আশ্রয় নেয়া সকল মুসলিমের একান্ত কর্তব্য। হাজী-গাজী, ইমাম-মুআযযিন, আলেম-মুফতী কেউই নিজেকে আলাদা ভাবতে পারেন না শরীয়তের বিধান পালনের ক্ষেত্রে। যদি কেউ তা ভাবেন এবং শরীয়তপ্রদত্ত নিরাপত্তাবেষ্টনীর বাইরে ব্যক্তিপ্রভাব বা উপাধির বলে বেঁচে যাবেন বলে মনে করেন, তাহলে তিনি ভুল করবেন। বাঁচার একমাত্র পথ শরীয়ত। ইজ্জত ও আব্রু রক্ষার একমাত্র রক্ষিত দুর্গ হলো নববী আদর্শ। এই নববী আর্দশ লঙ্ঘন করার পরিণতি কী হতে পারে, তা দেখুন নিম্নের ঘটনায়।

ঘটনাটা বহুদিন আগের। কোনোদিন এ নিয়ে লিখতে হবে বা লিখব- এধরনের চিন্তা কাজ করে নি বলে ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ স্মৃতির মণিকোঠায় ধরে রাখার প্রয়োজনবোধও করি নি।

সে সময় শুধু ঘটনাটা আক্ষেপের সঙ্গে পড়েছি আর হৃদয়ে রক্তক্ষরণ অনুভব করেছি। একারণেই কিনা জানি না, মূল ঘটনাটা আজও আমার হৃদয়পটে জ্বলজ্বল করছে। গ্লানিময় এসব ঘটনা আমি স্মরণ করতে চাই না। এসব অপ্রীতিকর ঘটনার অনুপ্রবেশ রোধে স্মরণিকার মূল ফটকে বেড়া দিয়ে রাখতে চেষ্টা করি সব সময়। তবু অন্দর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আমার অন্তরে। ছিদ্রপথে বৃষ্টির ঝাঁপটার মতো আমার হৃদয়কন্দরে প্রবেশ করে ভিজিয়ে দিয়ে যায় স্মৃতির পাতা। তরতাজা করে দিয়ে যায় শরীয়ত লঙ্ঘনের অশুভ পরিণতির দুঃখময় অনুভূতি।

ঘটনার শিকার মেয়েটির নাম আমার মনে নেই। থাকলেও তা প্রকাশ করতাম না। ছদ্মনাম হিসেবে ধরুন নাফিদা। নাফিদার স্বামী একটি সম্মানিত পেশার সঙ্গে জড়িত। রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাম যাদের শানে ইরশাদ করেছেন-

اَلْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلَ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

‘কেয়ামত দিবসে মুআযি্যনদের গর্দান মর্যাদার কারণে সবচেয়ে উঁচুতে থাকবে।’ [মুসলিম : ৩৮৭]

যাদের শানে এত বড় মর্যাদার কথা ঘোষিত হয়েছে, এত মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, তারাও যে ফেঁসে যেতে পারেন, শরীয়তের বিধান পালনে বিচ্যুতি ঘটলে লাঞ্ছনার শিকার হতে পারেন এই ঘটনা তারই একটা জ্বলন্ত প্রমাণ।

সুদূর রংপুর বা কুড়িগ্রাম (জেলার নাম ঠিক স্মরণে নেই) থেকে ঢাকায় স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন নাফিদা। দেখা-সাক্ষাত

ও প্রয়োজন পূর্ণ করে ধরলেন বাড়ির পথ। স্বামী ব্যস্ত মানুষ। দিনে অন্তত পাঁচবার ডিউটি পালন করতে হয় তাকে। তাই স্ত্রীকে সঙ্গ দেয়া বা নিজে গিয়ে স্ত্রীকে বাড়ি পৌঁছে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হলো না। তাই অপরাগতার কারণে হোক কিংবা গাফলতির কারণে হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সেই বিধানটির লঙ্ঘন হলো, যা ছিল নারীর সম্ভ্রমরক্ষার অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর। দুর্বল প্রাচীরের দখল নিল নারীর জাতশত্রু।
মুআযযিন সাহেব শেয়ালের কাছে মুরগী বর্গা দেয়ার মতো বোকামী করলেন। গাবতলীর এক বাস কাউন্টার থেকে একটা টিকিট কিনে স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিলেন। কোমল, অসহায়, অবলা, দুর্বল নারীটিকে (স্ত্রী) ছেড়ে দিলেন নিঃসঙ্গ অবস্থায়। গাড়িতে উঠিয়ে দেবার সময় বাসের হেলপার, সুপারভাইজারকে অনুরোধ করলেন তাকে যেন ঠিক-ঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া হয়। গাড়ির গন্তব্যের আগেই নারীর গন্তব্য স্থান। অর্থাৎ- মূল ষ্টেশনের আগেই নাফিদার বাড়ি। তাই তার স্বামী পুনঃপুনঃ অনুরোধ করলেন হেলপার-সুপারভাইজারকে, যাতে তার স্ত্রীকে যথাস্থানে নামিয়ে দেয়া হয়। এই অনুরোধকর্মের মধ্য দিয়ে লঙ্ঘিত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের সেই সতর্কবাণী, যাতে নারীকে সফরে একা ছেড়ে দিতে কিংবা গায়রে মাহরামের সঙ্গে ছাড়তে নিষেধ করা হয়েছে।
ফলে সম্ভ্রমের রক্ষাকবচ নস্যাৎ হয়ে যাওয়ায় নাফিদার জীবনে নেমে এলো দুর্যোগের ঘনঘটা। যার মাশুল দেয়া তাদের পক্ষে

আর কোনও দিন সম্ভব হবে না। কেননা, সম্ভ্রমের কোনও মূল্য দেয়া যায় না এবং তা হাত ছাড়া হয়ে গেলে জগতের কোনও বস্তু দ্বারাই তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায় না।

অসহায় নাফিদাকে তার গন্তব্যে নামিয়ে দেয়ার পরিবর্তে নিয়ে যাওয়া হলো সম্ভ্রমহানীর বধ্যভূমিতে, যার ক্ষুধার্ত নেকড়েরা হলো ড্রাইভার, সুপারভাইজার আর হেলপার। উন্মত্ত, উন্মাদ এই তিন নরখাদক ঝাঁপিয়ে পড়ল নাফিদার ওপর। তিন শকুনের কামনার নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো তার সম্ভ্রমের অস্তিত্ব। রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল সম্ভ্রম, ইজ্জত আর নিষ্কলুষ সতীত্বের গর্ব করার অধিকার।

এ ক্ষতি পুষবার নয়। এ ব্যর্থতার পর আশার কোনও বাণী নেই। এ পরাজয়ের পর কোনো বিজয় নেই। তবে প্রতিষেধক আছে আল্লাহয়ী বিধান। অন্য নারীরা যেন এথেকে সবক নেন, অভিভাবকরা যেন নিজেদের নারীদের ব্যাপারে এক্ষেত্রে সচেতন হন এটাই আমার কামনা। এই ঘটনা থেকে তারা যদি শিক্ষা নেন, তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

তারকাগায়ে দুষ্টক্ষত

ঘটনা-১ : মানুষের জীবনে বহু রকমের পতনের ঘটনা ঘটে। কারো পতন ঘটে নিঃশব্দে, মনুষ্যচক্ষুর অন্তরালে। আবার কারও পতন ঘটে বিকট গর্জনে, সমাজ-সভ্যতার একেবারে নাকের ডগায়। এই পতনটা যদি হয় নৈতিকতা স্খলনের, তাহলে ইতিহাসে তা ঘৃণার একটা জমাটবাঁধা অধ্যায় হয়ে থাকে।

তারকা, মডেল কিংবা নায়ক-নায়িকাদের প্রতি মানুষের নজরটা থাকে একটু বেশি। সেই সঙ্গে তাদের কাছে মানুষের প্রত্যাশাও থাকে একটু বাড়তি। ভক্তরা চান, ভেতরের পাতায় তারা যেমনই থাকুন না কেন অন্তত প্রচ্ছদে যেন থাকেন ঝকঝকে, দাগমুক্ত। কেউ-কেউ হয়ত ভক্তদের এই প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হন আর কেউ হন ব্যর্থ। ভক্তরা তখন তাদের ব্যক্তিজীবনের কুৎসিত চেহারা দেখে আঁতকে ওঠেন। নাক চাপেন পঁচা চরিত্রের দুর্গন্ধে।

২০১০ইং সালটায় সবচেয়ে বড় স্ক্যান্ডালের জন্ম দিয়েছেন অভিনেত্রী ও মডেল সাদিয়া জাহান প্রভা। সঙ্গে আছেন অন্য অভিনেতা ও চিত্রজগতের পরিচিত মুখ অপূর্ব ও রাজিব। তারা বিশেষ মহলে পরিচিত থাকলেও সব মহলে কিংবা বিশ্বাঙ্গনে তেমনটা পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের কিছু অপ্রীতিকর চিত্র তাদেরকে সকলের সামনে পরিচয় করে দিয়েছে। সর্বমহলে পরিচিতি লাভের সুবাধে তারা এই ঘটনাকে সাধুবাদও জানাতে পারেন!

প্রভাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল অপূর্বের। কিন্তু সেই স্বপ্ন খুব দীর্ঘ হয় নি। রাতের স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন প্রত্যুষে জাগ্রত হবে স্বপ্নভঙ্গের কষ্ট নিয়ে, তেমনিভাবে মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে স্বপ্নভাঙ্গার দুঃসহ বেদনা নিয়ে স্বপ্নরাজ্যের ঘুম থেকে জেগে ওঠেন অপূর্ব। ইন্টারনেটের কয়েকটি ভিডিও দৃশ্য তার দাম্পত্যজীবনে দুঃস্বপ্নের বান ডেকে আনে। স্ত্রী প্রভাকে তিনি আবিস্কার করেন অন্যের বাহুলগ্ন অবস্থায়, সম্পূর্ণ নগ্ন শরীরে! বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যু হয়। ট্রেনে কাটা পড়ে মানুষের মৃত্যু হয়। বিষপানে মৃত্যু হয়। গলায় দড়ি পেঁচিয়ে ঝুললে মৃত্যু হয়। কিন্তু অপূর্বর মৃত্যু হয়েছিল কীভাবে? অপূর্ব অবশ্য দেহবিয়োগান্তের মরা মরেন নি। তবে আমার মনে হয়, তিনি ওই মৃত্যুর চেয়ে এই মৃত্যুকেই আগে রাখতে চাইবেন।

কারণ, ইন্টারনেটের মহাকল্যাণে (?) সারা বিশ্বের বহু মানুষ দেখেছে তার স্ত্রীর এমন কদাকার দৃশ্য। দেখেছে একজন নারীর ইজ্জত-আব্রু, পবিত্রতা-সতীত্ব খুবলে খাওয়ার শকুনীয় দৃশ্য। কোন্ সে শকুন, যার হিংস্রনখরের থাবায় ক্ষতবিক্ষত হলো স্ত্রী প্রভার সতীত্ব? কেন অপূর্ব ব্যর্থ হলেন রক্ষিতসম্ভ্রম ঘরে তুলতে? কেন ঘটলো এই ঘটনা? পাঠক! আসুন, আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে নিই।

যৌন উন্মাদনায় অপূর্ব নিজ স্ত্রীর ইজ্জত লুণ্ঠন হতে দেখেছেন, সেই লোকটা ডাকাত, সন্ত্রাসী বা পারিভাষিক অর্থের কোনও ধর্ষক নয়। প্রভার সাবেক প্রেমিক। প্রভা দীর্ঘ আট বছর যার সঙ্গে

চুটিয়ে ও প্রকাশ্যে প্রেম করে এসেছেন। উপভোগ করে এসেছেন মুক্তবাসের জীবন, বল্গাহীন ও দায়মুক্ত জীবন। সে সময় এই জীবনের অন্য পিঠ চোখে না পড়লেও এখন তা খুব পড়ছে।

ঘটনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে : রাজিবের সঙ্গে দীর্ঘ আট বছর ধরে প্রেম করে আসছিলেন প্রভা। এই সূত্রে ঘর হওয়ার আগেই ঘরণীর মত জীবন-যাপন করা শুরু করেন তারা! প্রেমের গল্পগুলো রূপ-রসে রাঙিয়ে তুলতে এরই মধ্যে প্রভা বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের সবচে মূল্যবান বস্তু সম্ভ্রম। বিনিময়ে পেয়েছেন বস্তুজগতের কিছু দামি উপহার। আঠারো লাখ টাকার গাড়ি উপহার পেয়েছেন রাজিবের কাছ থেকে। হবু স্বামীর (তখনকার) কাছে বায়না ধরেছিলেন বিয়ের পর সুইজারল্যান্ড হানিমুনে যাবার। প্রেমিকার আত্মার ডাকে সাড়া দিয়ে রাজীব পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকাও সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু আট বছরের এই নাতিদীর্ঘ প্রেম পূর্ণতা পায় নি। রাজিব পারেন নি প্রভাকে স্ত্রী করে ঘরে তুলতে। বরং আট বছরের এই প্রেমের স্মৃতিসৌধের ওপর দাঁড়িয়ে প্রভা মালা পরিয়েছেন অপূর্বর গলায়।

৯ই আগস্ট ২০১০ইং সালে তিনি বাসা থেকে পালিয়ে গিয়ে অপূর্বকে বিয়ে করেন। যে রাতে তিনি অপূর্বের হাত ধরে পলায়ন করেন, সে রাতেও তার গায়ে জড়ানো ছিল রাজিবের বোনের দেয়া দামি শাড়ি। সে রাতেও রাজিবের সঙ্গে মিষ্টি-মিষ্টি অনেক কথা বলেছিলেন প্রভা।

কী নির্মম কৌতুক! ডিসেম্বরের ৯ তারিখে রাজিবের সঙ্গে বিয়ে এবং ২৩ তারিখে বৌভাত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন সে অন্যের ঘরের বাসিন্দা! কী অদ্ভুত কৌতুকই না করলেন প্রভা রাজিবের সঙ্গে! সদ্য সাবেক হওয়া প্রেমিকের সঙ্গে রাতের প্রথম ভাগে স্বপ্নময় কথা বলেছেন আর শেষ ভাগে অন্যকে বিয়ে করে চেয়েছেন দু'আ!

প্রভার এই দু'আ চাওয়ায় নিশ্চয় খুশি হতে পারেন নি রাজিব। স্বপ্নকন্যার গিরগিটির মত হঠাৎ রূপ বদলাতে বিরাট ধাক্কা খেয়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু যে জীবনে স্রষ্টার বিধানের তোয়াক্কা নেই, সেই জীবনের পরিণতি এর চেয়ে ভালো আর কতটুকুই বা হতে পারে?

জানার বিষয় হলো, রাজিবকে কেন ছাড়লেন প্রভা? পত্রিকার ভাষ্যানুযায়ী, এই ভাঙাগড়ার পিছনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা চয়নিকা চৌধুরী। অনেক তারকার মধ্যেই প্রেমের সম্পর্ক তৈরি এবং তা ভাঙার পিছনেও তার ভূমিকা স্মরণযোগ্য! কয়েকটি সূত্রে জানা গেছে, প্রভার মাধ্যমেই রাজিবের সঙ্গে পরিচয় হয় চয়নিকার। পরিচয়ের কিছুদিন পর রাজিবকে তিনি তার নাটকে প্রযোজনা করতে বলেন। কিন্তু রাজিব তাতে রাজি হন নি। এক পর্যায়ে রাজিবকে নায়ক বানানোর কথা বলেন। উদ্দেশ্য ছিল রাজিবের কাছ থেকে টাকা নেয়া। কিন্তু চয়নিকার কোনও প্রস্তাবেই রাজি হন নি রাজিব। একারণে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে ওঠেন চয়নিকা। এর

সূত্র ধরে অপূর্ব-প্রভাকে নিয়ে একের পর এক নাটক নির্মাণ করতে শুরু করেন তিনি।

অপূর্ব প্রভার প্রতি দুর্বল- একথা জানতেন চয়নিকা। তাই শুটিংয়ের সময় মেকআপ রুম অপূর্ব-প্রভার জন্য ফাঁকা করে দিতেন তিনি। চয়নিকার বের হয়ে যাওয়ার অনুগামী হতো শয়তান। কারণ, হাদীসে আছে, "যেখানে দু'জন পরনারী ও পরপুরুষ একত্রিত হয়, সেখানে তৃতীয়জন থাকে শয়তান।"[3] শয়তানের প্ররোচনার সঙ্গে যোগ হতো চয়নিকার ভূমিকা। তিনি প্রভার সামনে অপূর্বর প্রশংসা করতেন এবং রাজিবের নামে মিথ্যা বলতেন।

এভাবে রাজিবের কাছ থেকে তিনি প্রভাকে ছিনিয়ে নেন এবং রাজিবের স্বপ্নের সমাধি রচনা করেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর নিপুণতায়। কিন্তু অপূর্ব যার স্বপ্ন ভেঙেছেন, সেই রাজিব কম যাবেন কেন? এঁরা তো মধুমক্ষিকা। সুযোগ পেলে যারা সবটুকু মধু চুষে নেন। সেই কাহিনীই পরে প্রকাশ করেন রাজিব।

বিয়ের পর কিছুদিন অপূর্ব-প্রভার সম্পর্ক ভালোই ছিল। কিন্তু যখন একের পর এক প্রভার নগ্ন ভিডিও প্রকাশ পায় এবং তাকে রাজিবের সঙ্গে কুৎসিত যৌন মিলনের দৃশ্যে দেখা যায়, তখন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন অপূর্ব। তারপরেও চেয়েছিলেন

---

[3] হাদীসটির শব্দ হচ্ছে,

«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»

তিরমিযী, হাদীস নং ১১৭১।

নিজেকে সামলে নিতে। চেয়েছিলেন বালুর বাঁধকে দু হাতে ঠেলে জোড়া লাগাতে। মিডিয়ার সামনে বারবার বলেছিলেনও- যত ঝড়-ঝাঁপটাই আসুক না কেন, আমাদের কোনোদিনও আলাদা করতে পারবে না। আমৃত্যু আমরা এক সঙ্গে থাকব।'

কিন্তু তাদের এই বক্তব্য এখন সিনেমার সংলাপের মতোই অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। অপূর্ব প্রভাকে অনেক বিশ্বাস করেছিলেন; কিন্তু প্রভা সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেন নি বলে তিনি তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কারণ, প্রভা অপূর্বকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, রাজিবের সঙ্গে তার প্রেম ছিল ঠিকই; কিন্তু অন্তরঙ্গ কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু যৌনমিলনের দৃশ্য সম্বলিত অনেকগুলো ভিডিও স্কিপ তার দাবিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। অপূর্ব আরও ব্যথিত হন একারণে যে, এধরনের জঘন্য ঘটনা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও প্রভা লজ্জিত হন নি এবং তার মধ্যে কোনও অনুশোচনাবোধ লক্ষ্য করা যায় নি। উল্টো অপূর্বকে প্রভাবিত করে এই ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে চাইতেন তিনি।

এসব ঘটনার পরিণাম যা হবার তা-ই হয়েছে। ভেঙে গেছে সংসার। লজ্জায়, বেদনায় গুমরে কাঁদছে কয়েকটি পরিবার। গত ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১১ইং দীর্ঘ পাঁচ মাস বিচ্ছিন্ন থাকার পর তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে। প্রভাদের বাসায় উভয় পরিবারের লোকেরা বসে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন। পত্রিকায় লিখেছে, এই বিচ্ছেদের কারণে অপূর্ব খুব ভেঙে পড়েছেন। কিন্তু প্রভার মধ্যে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। তিনি আগের

মতোই উচ্ছ্বল ও আনন্দে মশগুল রয়েছেন। বাইরে ঘুরছেন, আড্ডা দিচ্ছেন, গল্প করছেন। এমনকি আগের মতো আবার অভিনয় করতে চাচ্ছেন। কিন্তু বাঁধ সেধেছেন বাবা। সাধবেনই তো। একবার যে গর্তে পা দিয়েছেন এই বাবা, দ্বিতীয়বার সেই গর্তে পা দেয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদই জানাতে হয় বটে।

আজ অপূর্ব নির্বাক, স্তব্ধ, ভয়ংকর দুঃস্বপ্নে অসহায়। রাজিব তার হানিমুনের জন্য জমানো টাকা দিয়ে প্রথমে প্রাথমিক ধাক্কা সামলাতে ভারতের মুম্বাই গিয়েছেন। সেখান থেকে আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যে পড়াশোনা করে আজীবনের জন্য থেকে যাবেন। আর প্রভা? তিনিও আর নিজ দেশের মানুষকে ভেতরের চেহারাটা প্রকাশ হওয়ার পর বাইরের চেহারাটা দেখানোর সাহস পাচ্ছেন না। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লন্ডনে চলে যাবেন বড় ফুফুর কাছে। ওখানেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছেন।

তাদের ব্যক্তিজীবন যেভাবে এলোমেলো হয়ে গেছে, তেমনিভাবে আমাদের মুসলিম দেশটার জাতিসত্তাটাও অনেকখানি এলোমেলো হয়ে গেছে, মর্যাদায় লেগেছে মোটা দাগের অনেকখানি আঁচড়। আমরা আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ধর্মীয় ও নৈতিকতার কারণে গর্ববোধ করে থাকি, বিশ্বব্যাপী আমাদের অপার সুনাম। বিদেশীদের মনেও আমাদের প্রতি অন্য রকম শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু প্রভা-রাজিবরা যা করলেন, তাতে আমাদের এই মর্যাদা ও পরিচয়ে আঘাত করবে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, ইন্টারনেট এমন এক ঝড়, যা বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি মানুষের দুয়ারে

আছড়ে পড়ে। একারণে তারা যখনই এই চিত্রটা দেখবে, তখনই আমাদের প্রতি নাক সিটকাবে। আমাদের মর্যাদার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলবে।

তাই বলব পর্দা আর আল্লাহর বিধান সম্পর্কে। নিজের সতীত্ব আর আত্মমর্যাবোধ সম্পর্কে অন্তত এতটুকু শ্রদ্ধা রাখুন, যাতে আর যাই হোক-না কেন, অন্তত দেশের মর্যাদাটা ক্ষুণ্ণ না হয়, আমরা বহিঃবিশ্বে নিজেদের মুখ দেখাতে পারি সগর্বে। [সূত্র : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৯ই অক্টোবর ২০১০ ইং শনিবার এবং ২০ই ফেব্রুয়ারি ২০১১ ইং রবিবার]

ঘটনা-২ : আমাদেরকে বলা হয় গোঁড়া, জনবিচ্ছিন্ন। কারণ, আমরা সমাজের প্রচলিত পাপাচারের সঙ্গে মিশতে পারি না। পাপের ঢেউয়ে ডুবতে-ভাসতে জানি না। তাই বলে সমাজের অনাচার দেখে আমরা যে একদম চুপ থাকি কিংবা কিছুই জানি না, তাও নয়। সমাজের ব্যধিগুলোর খবর আমরাও নিই, দেখে ব্যথিত হই। চেষ্টা করি মানুষকে সতর্ক করতে। নিবৃত রাখতে। এগুলো করতে গিয়েই দুয়েকটি ঘটনা এমন এসে যায়, যে জগতের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্কই নেই, সেই জগত নিয়ে কথা বলতে হয়। তবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটাই, আমাদের যেসব মুসলিম বন্ধুগণ অনৈতিকতার পাপসাগরে ডুবে আছেন, তাদেরকে সলিল সমাধি থেকে উদ্ধার করা। এটা আমাদের কলমের নৈতিক দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা সঞ্চালিত হই, বাধ্য হই এসব বিষয় নিয়ে দু’-চার কথা লিখতে।

পত্রিকাওয়ালারা লেখে, এসময়টাতে নাকি শাকিব খান-অপু খুবই জনপ্রিয় জুটি চলচিত্রাঙ্গনে। সারাদেশের ভক্তকূলেরা তাদের অভিনীত ছবি দেখে মুগ্ধ হয়। বাহবা দেয়। প্রশংসা করে। এসব ভক্তকূলের উদ্দেশে একটি প্রশ্ন, তারা কি কখনও একথা ভেবেছেন যে, সিনেমার পর্দায় অন্তত এমন কোনও মানুষের মুখ দেখতে চাই না, যাদের ভেতরটাতে যাই থাকুক, অন্তত বাহ্যিক রূপটা তেমন কুৎসিত না হয়? সিনেমা জগতের অশ্লীলতার পঙ্কিলতা যতই গভীর হোক, একটি মুসলিম দেশের যুবকেরা কি এতটুকু দ্বীনি বোধ-বিশ্বাসও পোষণ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন? যদি তা-ই হয়, তাহলে বলব, আমাদের কপালে দুর্ভোগের ঘনঘটা নেমেই এসেছে। দুর্যোগের এই ঘনঘটার আশঙ্কা যে কেবলই অনুমাননির্ভর নয় বরং বাস্তবতার অনেক কাছাকাছি তার প্রমাণ দেখুন নিম্নের ঘটনায়।

প্রভা-রাজিবের ঘটনার পর এবার 'জনপ্রিয় জুটি' শাকিব-অপুর পালা! সিনেমাঙ্গনে বছর জুড়ে দাপিয়ে বেড়ালেও আগস্ট মাসে এসে তারা জুটি ভাঙার ঘোষণা দেন। হয়ত ভক্তরা তাতে হতাশ হন, কিন্তু বড় হতাশার কথা হলো, তারা এমন এক ঘটনার জন্ম দেন, একজন ভক্তের মধ্যে যদি সামান্যতম দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধও থাকে, তাহলে তিনি সিনেমা হলগুলোর দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতে হলে ঘৃণায় থুতু নিক্ষেপের জন্য তাকাবেন।

জানা যায়, অপুর সঙ্গে শাকিবের গভীর প্রেম রয়েছে। কারও-কারও মতে তারা বিয়েথাও করেছেন। অর্থাৎ- তারা স্বামী-স্ত্রী।

কিন্তু স্ত্রী অপুর চালচলনে মোটেও খুশি হতে পারছিলেন না শাকিব। তার দাবি, অপু একাধিক ছেলের সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে। একদিন শাকিব খান সংবাদ পান, অপু বাসায় রাত গভীরে এক তরুণ অভিনেতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটাচ্ছেন। খবর পেয়ে তিনি সেখানে ছুটে যান। পরে ঐ অভিনেতাকে বাসা থেকে বের করে দিয়ে অপুকে প্রচণ্ড মারধর করেন। অপুর মায়ের সামনেই অপুকে বেদম প্রহার করেন তিনি। এ নিয়ে অপুর মা কোনও উচ্চবাচ্চ করেন নি। খবরটি জানাজানি হলে অনেকের কাছেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বিয়ে না করলে শাকিব অপুকে মারতে যাবেন কেন? [সূত্র : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩ জানুয়ারি ২০১১ ইং]

তাদের এই জীবনের কুৎসিত দিকগুলো কেন বারবার মঞ্চায়িত হয়, তার কারণ জানুন মহানবীর পবিত্র যবান মোবারক থেকে।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ-

ইবন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে নারীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কী তা জানাবো? তা হচ্ছে, ওই নেক নারী, যার দিকে তাকালে সে খুশি করে, দূরে

থাকলে সে স্বামীর মর্যাদা রক্ষা করে এবং স্বামী কোনও কাজের আদেশ করলে তাতে আনুগত্য করে। [আবূ দাউদ : ১৬৬৪][4]

আলোচ্য হাদীসের মূল ভাষ্য হচ্ছে, সতী নারী সে, যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর মর্যাদা রক্ষা করে অর্থাৎ নিজের সতীত্ব রক্ষা করে।

আমরা কি তাহলে একথা বলতে পারি না যে, তারকারা অভিনয়ে যে চিত্র প্রদর্শন করেন, তা কল্পিত কিংবা অন্যদের জীবনের কোনও ঘটনা প্রদর্শন নয়, তাদের নিজেদের জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি? কিংবা তারা যা প্রদর্শনী করেন, বাস্তবজীবনেও তারা তারই প্রতিফলন ঘটান? একজন অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রী কারও জন্য আদর্শ না হলেও সাধারণ মানুষ যেহেতু তাদেরকে সিনেমার পর্দায় দেখে থাকে, তাই তাদের চারিত্রিক অধঃপতন দ্বারা তারাও প্রভাবিত হতে পারে। আর এটাই আমাদের সবচে' বড় শঙ্কার কারণ। একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী[5]র এধরনের চারিত্রিক অধঃপতনের ঘটনা হাজারও মানুষকে বিপথে চলতে উৎসাহিত করতে পারে। পাপের সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকা আমাদের দেশের লোকেরা যখন বাঁচাও বাঁচাও বলে হাপিত্যেশ

---

[4]. শায়খ আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। তবে অন্য শব্দে হাদীসটির অর্থ বিশুদ্ধ। সম্ভবত ইমাম নাওয়াওয়ী ও ইরাকী সহীহ বলেছেন। [সম্পাদক]

[5] যদিও খোদ অভিনয় বিষয়টি মিথ্যা হওয়ার কারণে ইসলামে এর বেশ কিছু বাধা রয়েছে। [সম্পাদক]

করছে, তখন তাদের এই স্খলন নিশ্চয়ই খারাপ প্রভাব ফেলবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই হলো তারকাদের জীবন! দর্শকরা পর্দায় তাদের দেখেন যে চেহারায়, তাদের আসল চেহারা তা নয়! পাঠক! পৃথিবীর অনেক ইতিহাস সাক্ষী। আল্লাহর বিধান ছাড়া শুধু ভালোবাসা কিংবা অন্য কোনও সম্পর্ক মানুষের পারিবারিক কিংবা দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখতে পারে নি। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক- তা যারই হোক না কেন- ধ্বংসের জন্য দায়ী অনেক কিছু। যেমন-

১. অনিয়ন্ত্রিত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন।

২. পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ মেলামেশা।

৩. ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

৪. প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি।

আর সবগুলোর জন্য দায়ী মুক্তবাস। পাঠক! শরীয়তে এর প্রত্যেকটি কাজ জঘন্যতম হারাম বলে বিবেচিত। তাই ইসলামের বিধান পালনকারী একজন ব্যক্তি এথেকে নিরাপদ। অতএব, আপনি চলে আসুন। ইসলামের নিরাপদ তাঁবুতে আপনাকে স্বাগতম!

পরকীয়ার শিকলে বাঁধা জীবন

পরকীয়া প্রেমটা যেন 'পরের বাড়ির পিঠা'র মতই রস-স্বাদ আর গন্ধে ভরা। নিজের বাড়ির পিঠা-পুলি খেতে রসনায় স্বাদ জোটে না, অথচ পরের বাড়ির পিঠার গন্ধ নাকে লাগলেই ওই রসনাই আকুলি-বিকুলি করতে থাকে! পরকীয়ার ব্যাপারটিও এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন। নিজের স্বামী অথবা স্ত্রী সংসারের গৌরবময় জীবন অনেকের কাছে গতহওয়া ক্যালেন্ডার বা ঠাণ্ডা চায়ের মতো মনে হয়। তাই অন্য নারী অথবা অন্য পুরুষেরা তাদের কাছে হয়ে ওঠে আরাধ্য ধন! নিজের স্বামী, সংসার আর সন্তান-সন্ততি নিয়ে তো বেশ আছো, তারপরেও কেন পরকীয়ার এই পঙ্কিলতায় পা ঢুকিয়ে দেয়া!

জীবন-যৌবনের সব সুখ তো আল্লাহ তা'আলা রেখেছেন বিবাহের পবিত্র বন্ধনের মধ্যে। এই ভালো পথ ছেড়ে কেন মন্দ পথে কদম চালানো? আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন-

﴿ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍۚ ﴾ [النساء: ٢٥]

... যাদের বিয়ে করবে তারা হবে পবিত্রা। **ব্যভিচারিণী কিংবা উপস্বামী** (পরকীয়ার স্বামী) গ্রহণকারীণী হবে না।' {সূরা নিসা, আয়াত : ২৫}

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিয়ে করার মূল উদ্দেশ্য এবং বিবাহিত নারী-পুরুষের মৌলিক গুণ কী হবে- তা বলে দিয়েছেন। আয়াতে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে উপপত্নী কিংবা উপস্বামী

গ্রহণ করতে। আর আজকের সমাজ এই মারাত্মক সমস্যার মরুভূমির চোলাবালিতে আটকে তা থেকে উদ্ধারের জন্য পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কী?

এই প্রশ্নের জবাব হয়ত একেকজন একেকভাবে দেবেন। একেকজনের দৃষ্টিভঙ্গি হবে একেক রকম। কিন্তু এক জায়গায় এসে সবাইকে একথা মেনে নিতে হবে যে, সামাজিক এই অশান্তির বিরাট এক দায়ভার পরকীয়ার, যার বাজার গরম করে তুলেছে বল্গাহীনও মুক্তবাসের অভিশপ্ত জীবন। নিচের ঘটনাটা দেখুন :

তিনি একজন নারীকল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী। কাজ করেন নারীদের কল্যাণের জন্য। নাম রহিমা খাতুন লিজা। মহিলার বয়স পঁয়ত্রিশের ওপরে কত হবে তা বলতে পারব না। তবে কম যে হবে না নিশ্চিত। মৌ ও দোলা নামের দুইজন কন্যা সন্তানের জননী তিনি। স্বামী আব্দুল জলিল ভুঁইয়া। স্বামী যে তাকে অর্থকষ্টে রেখেছেন তাও নয়। নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ায় তিনতলা বিল্ডিংয়ের মালিক আব্দুল জলিল। বস্তুজগতের বাজারে এই বাড়িটির মূল্য নেহায়েত কম নয়। তাই সম্ভবতই তিনি গর্বিত, আপ্লুত, উচ্ছসিত। কিন্তু এক জায়গায় এসে তার সকল উচ্ছ্বাস, আবেগ আর অনুভূতি থেমে যায়। ঘরের জগতটা তার কাছে স্রোতহীন, পানিবিহীন এক মরা খালের মত নির্লিপ্ত মনে হয়। কারণ, যার বুকের ভেতর তিনি ভালোবাসার উত্তাল ঢেউ আশা

করেছিলেন, সেই বুক এখন তার জন্য কেবলই মরীচিকা। এই মরীচিকা তাকে ভালোবাসা দেবার নামে যমের ঘরে নিয়ে যায়। কেননা, তিনি আজ শিকলে বন্দী। স্ত্রী লিজা নিজ হাতে তাকে বন্দী করে রেখেছেন। দুঃস্বপ্নে কেঁপে ওঠেন তিনি। নিজ বাড়িকে তার কাছে থেমে-থেমে গুয়ান্তানামো বে আর আবূ গারিবের মতো মনে হয়। চার চারটি দিন কেটেছে তার ইনজেকশনের নির্মম ব্যথায়। এ যেন ইংরেজ জন্তুদের নির্যাতনকেও হার মানায়!

স্ত্রী লিজা আজ আমেরিকান হায়েনাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যে স্ত্রী এক সময় তাকে লুকিয়ে মা-বাবাকে আড়াল করে সিদ্ধ ডিম আর সুস্বাদু শরবত খাওয়াতেন, আজ তিনি স্বামীকে করেছেন বন্দী! কেন? কারণ, ওই পরের বাড়ির পিঠার স্বাদ!

ঘটনাটা এমন : আবদুল জলিল বাড়ির নিচতলা ও দোতলা ভাড়া দিয়েছিলেন। আর তিনতলায় থাকতেন তিনি নিজে পরিবার নিয়ে। এই তিনতলারই দুটি রুম অফিসরুম হিসেবে ব্যবহার করতেন লিজা। অফিসটা ছিল 'নারী কল্যাণ সংস্থা' নামের একটি এনজিও প্রতিষ্ঠানের। অফিসের ম্যানেজার ছিলেন দিপু ভূঁইয়া। প্রায় ৩৫ বছরের কাছাকাছি বয়সের একজন নারী প্রেমে পড়লেন যুবক দিপুর। ভুলে গেলেন স্বামী সন্তান আর সংসারের পবিত্র বন্ধনের কথা। শুধু মনের আদান-প্রদানেই সীমাবদ্ধ থাকেন না তারা। মেতে ওঠেন পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য পাপকর্মে। হয়ত বহুদিন চলেছে তাদের এই অভিসারযাত্রা। বহুদিন ভেসেছেন পাপসাগরে।

ডুবে-ডুবে খেয়েছেন ঘোলাজল। ‘গৃহস্থের একদিন’ কথাটার সত্যতা প্রমাণের জন্যই কিনা একদিন তারা অভিসাররত অবস্থায় ধরা পড়লেন গৃহকর্তা আবদুল জলিলের হাতে। নিজ স্ত্রীকে এমন পাপদৃশ্যে দেখতে কার ভালো লাগে? ভালো লাগল না বলেই তিনি প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে যুগ-যমানা পড়েছে তাতে গৃহস্থ চোরকে আর শাসন করতে পারে কই? চোরই উল্টো গৃহস্থকে শাসন করে! তাই লিজা- দিপু কোনও রিস্ক নিতে গেলেন না। ‘কেন বাপু তুমি আমাদের কাজে বাঁধা দিচ্ছ’ বলে তাকে মোটা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। শুধু তা-ই নয়, অভিসারের নীরবদর্শক আব্দুল জলিলকে বাঁচিয়ে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না স্ত্রী লিজা। তাই স্বামীর ওপর চালালেন অমানুষিক নির্যাতন। লোহার মোটা রড দিয়ে ইচ্ছে মতো পেটালেন। কিন্তু একি! এ যে কৈ মাছের প্রাণ! মারার চেষ্টা ব্যর্থ হলে আরেক পন্থা অবলম্বন করলেন তিনি। ঘটনা যাতে ফাঁস না হয়, সে জন্য স্বামীর দেহে পুশ করলেন একে একে চেতনা নাশক ৪টি ইনজেকশন। এবার বেটা যাবে কই? আধামরা, অচেতন হয়ে নিজ ঘরে চার দিন মৃতবত পড়ে থাকলেন আব্দুল জলিল।

চারদিন আব্দুল জলিলের কোন খোঁজখবর না পেয়ে এলাকার লোকজন কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। এলাকাবাসী স্ত্রীর গুয়ান্তানামোবে কারাগার থেকে উদ্ধার করে স্বামী আব্দুল জলিলকে।

পত্রিকায় রিপোর্ট করেছে, স্বামী আব্দুল জলিলকে এক সময় খুব ভালোবাসতেন স্ত্রী লিজা। গোপনে সবার অলক্ষ্যে তাকে ডিম খাওয়াতেন, ক্লান্তদেহে বাড়ি ফিরলে চিরকোমল স্ত্রীসেবা নিয়ে তার কাছে ছুটে যেতেন। বুকে স্বামীপ্রেমের ঝড় উঠত তার। কোমল ঠাণ্ডা পানি পরিবেশন করতেন স্বামী সমীপে। সোহাগ দিয়ে, আদর দিয়ে মধুময় করে তুলতেন দাম্পত্যের পবিত্র বন্ধন।

কিন্তু আজ তা ধূসর অতীত। আল্লাহয়ী বিধান লঙ্ঘনের একটি অগ্নিশলাকা তাদের এই ভালোবাসার সবুজভূমিকে মরুপ্রান্তরে পরিণত করেছে। যুবক দিপুর সঙ্গে মেলামেশা লিজার মন থেকে কেড়ে নিয়েছে স্বামীর পবিত্র ভালোবাসা। বেপর্দা থেকে প্রেম আর প্রেম থেকে অবৈধ মিলন। অনৈতিক দৈহিক সম্পর্ক জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে ভালোবাসার পুণ্যভূমি।

এদিকে ধর্মের অপব্যবহার দেখুন! এই অনৈতিক সম্পর্কের স্বাদ আস্বাদন করতে প্রায়ই ঠেকে যেতেন লিজা। স্বামী-সংসারে তো আর প্রকাশ্যে এসব কাজ করা যায় না! লিজা নিজেও তা বোঝেন। তাই প্রায়ই স্বামীকে দূরে রাখার কৌশল আঁটতেন তিনি। তাকে দ্বীনকর্ম করার পরামর্শ দিতেন। এভাবে তাকে তিন দিন, সাত দিন এবং চল্লিশ দিনের জন্য চিল্লায় পাঠিয়ে দিতেন। সরলমনে, স্ত্রীকে বিশ্বাস করে তিনি যখন চিল্লার জন্য বের হতেন, তখন লিজার খুশি ধরত না। দিপুকে সঙ্গে নিয়ে মেতে উঠতেন আদিমআনন্দে। পরম অবৈধ-সুখ অভিসারে! তিনি নিজেও অনেক সময় ট্রেনিংয়ের কথা বলে পাঁচ দিন, সাত দিন করে ঢাকায় গিয়ে

থাকতেন। এসময় লিজার ওপর স্বামী আব্দুল জলিলের কোনও অধিকার থাকত না।

পাঠক! এবার আসুন আমরা এই ঘটনার পোস্টমার্টেম করি। আপনি জেনেছেন যে, লিজা এক সময় স্বামী আব্দুল জলিলকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। প্রাণভরে সেবা করতেন। কিন্তু কিসে আজ তাকে এত হিংস্র করে তুলল? কিসে তাকে স্বামীর গলায় শিকল ঝুলানোর শক্তি জোগালো? ওই যে বেপর্দা! অবৈধ মেলামেশা! পরকীয়া এবং ইলাহী বিধান লঙ্ঘন! [তথ্যসূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ০৪/১০/২০১০ ইং বৃহস্পতিবার]

ভাঙা সংসার বাড়ছে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন-

«بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ»

'আমি উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেয়ার জন্য (শিক্ষক হিসেবে) প্রেরিত হয়েছি।' [বাইহাকী : ২০৭৮২; শারহুস সুন্নাহ : ৩৬২২]

আলোচ্য হাদীসে একজন শিক্ষকের কাজ ও আদর্শ কী তা উল্লেখ করা হয়েছে। মানবজাতিকে আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা আর উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেয়াই একজন শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব এবং এতেই রয়েছে গৌরবময় কীর্তি। একারণে শিক্ষকতার পেশাকে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পেশা বলে মনে করা হয়।

কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে যদি আসমানী ইলমের যোগসূত্র স্থাপিত না হয় এবং নৈতিকতার মতো মহৎ গুণ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমৃদ্ধ না হন, তাহলে কামনার লেলিহান শিখা সেই গৌরবময় পেশাকে কী পরিমাণ কলঙ্কিত করতে পারে, তার বহু খারাপ দৃষ্টান্ত রচিত হয়েছে অতীতে এবং বর্তমানেও। এধরনের একটি প্রমাণ নিন :

চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিনোদপুর কলেজের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক আব্দুল লতিফ। এতদিন রসায়ন বিজ্ঞানের পণ্ডিতব্যক্তি জেনেই মানুষ তাকে সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে তার সামনে নিজেদেরকে কাচুমাচু করে উপস্থাপন করেছে। জ্ঞানসাগর ব্যক্তিটিকে তারা মাথার তাজ বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু মানুষকে আর কতদিন অন্ধকারে রাখা যায়! হয়ত শিক্ষক আবদুল লতিফ চাইলেন তার

আসল চেহারাটা উন্মোচন করতে। চাইলেন তিনি যে শুধু রসায়নেই পণ্ডিত তাই নয়, তার পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্র অনেক বেশি বিস্তৃত- একথার প্রমাণ দিতে। 'শিক্ষক'কে বিশ্বাস করে অভিভাবকরা তার হাতে যে আমানত তুলে দিয়েছিলেন, সেই আমানতের সঙ্গে খেয়ানত করে, নারীসম্ভ্রমকে ভূলুণ্ঠিত করে নিজ ছাত্রীর সঙ্গে অন্যায়কর্মে লিপ্ত হয়ে সেটির হাইলাইটস প্রচার করলেন তিনি কামুকবিশ্বের সামনে। নীতি, নৈতিকতা, জ্ঞান, চরিত্র আর আদর্শ প্রচারের বদলায় প্রচার করলেন লাম্পট্য আর ইজ্জত হননের ঘৃণিত দৃশ্য!

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী ঘোনাটোলা গ্রাম। নির্জনতা আর প্রাকৃতিক পরিবেশের এক নয়নাভিরাম দৃশ্য গ্রামটিকে দিয়েছে কাব্যময় সৌন্দর্য। আল্লাহপ্রদত্ত এই প্রকৃতির কোলকে আশ্রয় বানিয়ে কলেজ শিক্ষক আব্দুল লতিফ গড়ে তুলেছেন নয়নজুড়ানো বিল্ডিং বাড়ি। বাড়ির ছাদে স্থাপন করেছেন অত্যাধুনিক ক্যামেরা, টেকনোলজি। যুক্ত করেছেন দু'টি ডিশ অ্যান্টিনা।

বাইরের নির্জনতার সুযোগে আব্দুল লতিফ ভেতরের পরিবেশটাকে করে রেখেছিলেন পশুত্বের কোলাহলে মুখরিত। কিন্তু এ সম্পর্কে মানুষ ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। তিনি অতি অল্প সময়ে গড়ে তোলেন পাপের নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক উলঙ্গপনার, পশুত্বের, নির্জলজ্জতার সর্বোপরি মানুষের সম্ভ্রমের সঙ্গে গাদ্দারী ও প্রতারণা করার নেটওয়ার্ক।

কয়েক বছরের ব্যবধানে আবদুল লতিফ স্থানীয় কয়েকজন লোককে ব্যবহার করে অন্তত ২টি পর্নো সিডি তৈরি করেন। পর্নো ছবিগুলো তৈরি করতে তিনি ব্যবহার করেন একেবারেই ঘনিষ্ঠ ও কাছের নারীদেরকে। কৌশলে যেসব সরল নারীকে ঘটনার শিকারে পরিণত করেছেন, তারা হয়ত ঘটনার সময় শুধু ইজ্জত বিকাচ্ছেন ভেবে কিছুটা স্বস্তিতে থেকেছেন। কিন্তু অলক্ষ্যে যে ইজ্জতহননের বিজ্ঞাপনও প্রচার হচ্ছে, সে ব্যাপারে কি তাদের ধারণা হয়েছিল কখনও?

আব্দুল লতিফ এ ক্ষেত্রে একটা পশুর মধ্যে যে নৈতিকতাবোধ আছে, তাও ছাড়িয়ে যান। পশু-পাঠার সম্ভ্রমবোধটুকুও মনে হয় তার মধ্যে কাজ করে নি। তা না হলে তিনি আপনজনকে ব্যবহার করে কি করে সেই সিডি বাজারজাত করতে পারেন!

যে কোনও নারীরই ইজ্জত লুণ্ঠন করা মারাত্মক অপরাধ। অবস্থার তারতম্যে অপরাধের ভয়াবহতার পরিমাণ বেড়ে যায়। একারণে প্রতিবেশি নারীর ইজ্জতহানীকে এ সম্পর্কিত সবচেয়ে ভয়ানক অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

سُئِلَ - رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ، قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ»

'রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন গুনাহ সবচেয়ে বড়? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা। প্রশ্ন করা হলো; তারপর কোন গুনাহ? তিনি জবাবে

বললেন, নিজ সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করা যে, সে তোমার জীবিকায় ভাগ বসাবে। এরপর কোন গুনাহ? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, প্রতিবেশি নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করা। [বুখারী : ৪৪৭৭; মুসলিম : ৮৬]

একজন প্রতিবেশী নারী আমানত। তাকে বিপদে সহায়তা করা এবং তার সম্ভ্রমের নিশ্চয়তা রক্ষা করা একজন প্রতিবেশীর প্রধান ফরয দায়িত্ব। কিন্তু যাদের মধ্যে একটা জন্তুর সম্ভ্রমটুকুও কাজ করে না, সেই আবদুল লতিফদের কাছে হাদীসের বাণী পৌঁছলে তো! তাই তিনি অশ্লীল ভিডিও তৈরি করার কাজে অবলীলায় ব্যবহার করেছেন প্রতিবেশি ও ঘনিষ্ঠ নারীদেরকে। ধিক্ এই নোংরা মানসিকতার প্রতি। অভিশাপ সকল নারীর পক্ষ থেকে।

আব্দুল লতিফ এখানেই থেমে থাকার পাত্র নন। ঘনিষ্ঠদের ব্যবহার করার পর তার নজর পড়ে বিনোদপুরের এক সুন্দরী ছাত্রীর ওপর। শিক্ষকতার মহান পেশার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে এই ছাত্রীকে ব্যবহার করে তিনি আরও কিছু ভিডিও তৈরি করেন। আব্দুল লতিফের কাছে সম্ভ্রমহারা রিক্তপাত্র ওই ছাত্রীর বিয়ে হয়ে গেলে নতুন শিকারের পিছু ধাওয়া করেন তিনি। কামনার বারুদে আরও আগুন চাই তার। এই বারুদও হাতের নাগালে পেতে সময় লাগল না তার। ওই ছাত্রীর পর ছোবল দেন তিনি আরেক তরুণীর ওপর। এই ছোবলের বিষ শঙ্খচূড়া সাপের চেয়েও বেশি বিষাক্ত।

এই তরুণীকে ব্যবহার করে রিক্তপাত্র বানিয়ে ছেড়ে দেন আব্দুল লতিফ। এবারের নজর কলেজেরই আরেক ছাত্রীর ওপর। সম্ভ্রমহারা ওই ছাত্রী জানান, রসায়নে ভালো ফলাফল পাওয়ার আশায় আব্দুল লতিফের বাড়িতে গিয়ে প্রাইভেট পড়তেন তিনি। শিক্ষককে বিশ্বাস করতেন তিনি পুরো মাত্রায়। একজন শিক্ষককে বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণিত করলেন তিনি। বিশ্বাসের মর্যাদাকে করলেন ভূলুণ্ঠিত। কামনার উত্তাল জোয়ারে ভেসে গেছে তার সকল মূল্যবোধ। তাই সব সময় অনৈতিক প্রস্তাব দিতেন তিনি ওই ছাত্রীকে।

ওই ছাত্রী আরেকজনকে সঙ্গে নিয়ে প্রাইভেট পড়তেন আব্দুল লতিফের কাছে। একদিন তার সঙ্গী ছাত্রীটি পড়তে না আসায় সুযোগের একশ ভাগ সদ্ব্যবহার করেন আব্দুল লতিফ।

ঘটনাটি ২০০৭ ইং সালের ২২ই মার্চের। ওই দিন সকাল আটটার সময় প্রাইভেট পড়তে গিয়ে জীবনের সবচে' মূল্যবান সম্পদটুকু হারিয়ে আসেন ওই ছাত্রী। পানি পান করতে চাইলে আব্দুল লতিফ ঘুমের ঔষধ মেশানো পানি দেন তাকে। ওই পানি পান করে তিনি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। সেই সুযোগে আব্দুল লতিফ জেগে ওঠেন আপন পাশবিক সত্তায়। মৃতপ্রায় অচেতন ছাত্রীকে বিবস্ত্র করে তার সম্ভ্রমহানি করেন আব্দুল লতিফ। শুধু তাই নয়, অত্যাধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরার সাহায্যে সেই ঘৃণ্য চিত্র রেকর্ড করে রাখেন তিনি।

জ্ঞান ফেরার পর ওই ছাত্রী নিজের দেহে আবিষ্কার করেন বন্যজন্তুর দাঁতালো কামড়। সম্ভ্রমহারা দেহটা তার একটা খোসামাত্র। তিনি ভয়ার্তকণ্ঠে চিৎকার দিতে চান। কিন্তু পাকা খেলোয়াড় আব্দুল লতিফ তাকে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। আব্দুল লতিফ ওই ছাত্রীর ভিডিও ক্লিপ (একটা ৩৪ মিনিটের, অন্যগুলো ৯ থেকে ৪ মিনিটের মধ্যে) ইন্টারনেট ও মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকানসহ সিডি দোকানের মাধ্যমে এলাকায় ছড়িয়ে দেন।

একজন কলেজ শিক্ষকের এমন লাম্পট্য দেখে এলাকার মানুষের মধ্যে ছি ছি রব পড়ে যায়। বিক্ষুব্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে মিছিল করেন তারা। কিন্তু এই মিছিল কি পারবে সম্ভ্রমহারা ওই নারীর সম্ভ্রম ফিরিয়ে দিতে? এসব মিছিলে কোনও কাজ হয় না। হীতে বিপরীত হয়, পাপের গন্ধ আরও বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আসলে পাপের উৎস বন্ধ না করে কেবল হইচই করলে সেই পাপের দুর্গন্ধ আরও ব্যাপক হয়। আব্দুল লতিফের ঘটনা এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। কারণ, এসব মিটিং মিছিলের কারণে ঘটনাটি এলাকার সবার নজরে আসে। যাও কিছুটা গোপনীয় ছিল মিছিলের কারণে তাও ফাঁস হয়ে গেল। ওই ছাত্রীর জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল ভয়াবহ ঝড়, বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন। এমন স্বপ্নের তা‘বীর করতে গা শিউরে ওঠে তার। নারীর সবচে’ নিরাপদ ও কাঙ্ক্ষিত আশ্রয়স্থল থেকে তাকে বিতাড়িত করা হলো। স্বামীর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রথমে তিনি আশ্রয় নেন বাবার

বাড়ি। কিন্তু কলঙ্কের দাগ তাকে এখানেও থাকতে দেয় না। তাই বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেন এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ি। [তথ্যসূত্র : কালের কণ্ঠ, ২৩ অক্টোবর ২০১০ ইং]

এভাবেই পাপের বিষক্রিয়া বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনিসহ আরও অনেক ছাত্রী, নির্যাতিতা, ধর্ষিতা নারী। শিক্ষক আব্দুল লতিফ যাদের জীবন ও শরীর নিয়ে খেলা করেছেন, তাদের প্রকৃত সংখ্যা কত, তা তিনি আর আল্লাহ ভালো জানেন। কারণ, আল্লাহর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কেউ কোনও পাপ করে পার পেতে পারে না। শিক্ষার কথা বলে এভাবেই চাক থেকে মধু আহরণ করে চলেছেন আবদুল লতিফরা। তাদের হুলে, কামড়ে ভাঙছে অসংখ্য সংসার। রচিত হচেছ কলঙ্কের ইতিহাস। বিঘ্নিত হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, কেন হচ্ছে এসব? তাহলে আমি তার এই প্রশ্নকে একটা বিদ্রূপ বলেই ধরে নেব। কেননা, যেখানে অহরহ আল্লাহর বিধানের লংঘন হচ্ছে, বেআব্রুর সকল উপকরণ সস্তাপণ্যে পরিণত হয়েছে, ছাত্রী-শিক্ষকের প্রভেদের দেয়াল উঠে গেছে, স্বয়ং শিক্ষক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করছে, ছাত্রীকে ধর্ষণ করছে, তখন সমাজে এ ধরনের হাজারও আবদুল লতিফের জন্ম নেয়া বিস্ময়কর কিছু নয়। এদের এসব ঘটনা ভোরেরবেলার কাকের কর্কশ আওয়াজের মত শোনালেও করার কিছুই নেই। নিয়মিত আপনাকে এসব ঘটনা হজম বা শ্রবণ করে যেতে হবে। তবে যদি আপনি নাফরমানী ও মুক্তবাসের জীবনের ওপর আল্লাহর বিধান

ও পর্দার লাগাম পরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে এধরনের ঘটনার ধারাবাহিকতা অবশ্যই বন্ধ হবে, ইনশাআল্লাহ।

নিরত্যয় শিক্ষক : নিরিন্দ্রিয় অভিভাবক

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧ ﴾ [الانفال: ٢٧]

'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং নিজেদের মধ্যকর আমানতও জেনেশুনে ভঙ্গ করো না।' {সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ২৭}

রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন :

«لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ»

'যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই এবং যে অঙ্গীকার রক্ষা করে না, তার দ্বীনদারী নেই।' [মুসনাদ আহমাদ : ১২৫৬৭]

আলোচ্য আয়াত ও হাদীসে আমানত রক্ষার জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং যার আমানতদারী নেই তার মধ্যে দ্বীন নেই বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। স্মর্তব্য যে, আমানতের অনেক প্রকার রয়েছে। আর এগুলোর মধ্যে সবচে' বড় হলো সম্ভ্রমের আমানত। আর তা যদি হয়, বিশ্বাসনির্ভর কোনও ব্যাপার, তাহলে তার গুরুত্বের তো শেষই নেই। একজন অভিভাবক যখন তার কন্যাকে কোনও শিক্ষকের হাওয়ালা করেন, তখন বিশ্বাস করেই তা করেন। তিনি নিশ্চিত থাকেন যে, এ্যাকুরিয়ামের মাছ যেমন কাঁচের চার দেয়ালে নিরাপত্তায় থাকে, তেমনি তার কন্যাটাও শিক্ষকের আমানতদারীর চার দেয়ালে রক্ষিত থাকবে। কিন্তু সেই শিক্ষকের মধ্যে যদি ইসলামের আমানতদারী না থাকে, তাহলে

সম্ভ্রমের আমানতদারীও থাকার কথা নয়। যার মধ্যে আল্লাহকে ভয় করার গুণ নেই, তার মধ্যে মানুষের সমালোচনার আশঙ্কাও কোনও কাজ করে না। এর প্রমাণ রাখলেন আব্দুল লতিফের পর মতিয়ার রহমান।

রাজধানীর বনশ্রীর আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী কারিমা (ছদ্মনাম)। নবম শ্রেণীর ছাত্রী সে। সে একই স্কুলের শিক্ষক মতিয়ার রহমানের বাসায় প্রাইভেট পড়ত। দীর্ঘদিন থেকে ওঁৎ পেতে ছিলেন শিক্ষক মতিয়ার রহমান। ছাত্রীর সম্ভ্রমের দুর্গে আঘাত হানার প্রহর দীর্ঘ হচ্ছিল তার। কিন্তু তিনি নৈরাশ্যবাদী লোক নন। এসব ক্ষেত্রে নিরাশ হলে চলে না- এটাই তার দর্শন। কারণ, এই রণাঙ্গনের একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা তিনি। এর আগেও অভিজ্ঞতার প্রমাণ দিয়েছেন। তাই বলা যায়, অভিজ্ঞতার ঝুলি তার সমৃদ্ধ! সেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলের ঘটনা। এলাকাবাসী তখনই চিনেছে মতিয়ার রহমান আসলে কী চিজ! সে সময়ও তিনি ওই স্কুলের অন্য এক ছাত্রীর সম্ভ্রমহানীর ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু আজব এই দেশ! এদেশের কর্তৃপক্ষের ক্ষমার বদান্যতা সাগরের চেয়েও বিশাল। তাই এমন একটা অপরাধ করার পরও পার পেয়ে যান ওই শিক্ষক। স্কুল থেকে তাকে বহিষ্কার করা হলেও তদবির করে তিনি চাকুরী ফিরে পান। অকৃতজ্ঞের যে স্বভাব ফিরে এসে সেটাই করেন শিক্ষক মতিয়ার রহমান। বেশ কিছুদিন চুপচাপ থেকে তিনি আবার আবির্ভূত হন তার আসল চেহারায়। এবার তার লালসার শিকার মিউচুয়াল

ট্রাস্ট ব্যাংকের এক কর্মকর্তার মেয়ে নবম শ্রেণীর এক কুমারী মেয়ে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, কারিমা ওই স্কুলের গণিত ও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মতিয়ার রহমানের কোচিং সেন্টারে পড়ত। গত ৭/১০/২০১০ইং তার কাছে নিয়ম মোতাবেক পড়তে যায়। সেদিনটি ছিল শিক্ষক মতিয়ারের জীবনের হয়ত সেরা দিনের একদিন। যে দিনের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি বকের মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে। সে দিন বাসায় স্ত্রী ছিলেন না। তাই পুরোদমে সুযোগের (অ)সৎ ব্যবহার করেন তিনি। যুবক শিক্ষককে সম্ভ্রমের যামিন মনে করে সরল বিশ্বাসে তার কাছে প্রাইভেট পড়তে আসা কিশোরীর সঙ্গে প্রতারণা করেন তিনি। তার অজান্তে কোমল পানীয়ের সঙ্গে চেতনানাশক ওষুধ মিশিয়ে তাকে পান করিয়ে অচেতন করা হয়। এভাবে তার কামনার হীনস্বার্থ উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। একজন অচেতন যুবতী নারীর ওপর পাশবিকতার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মাস্টার মশায়! চেতনা ফিরে পেয়ে কারিমা দেখে তার সব শেষ হয়ে গেছে। মলমপার্টি, অজ্ঞানপার্টির খপ্পরে পড়ে মানুষ সম্পদ হারায়, তা জানা ছিল তার। কিন্তু সমাজের এমন এক ধরনের মলম পার্টিও আছে, যারা মলম বা চেতনানাশক ওষুধ ব্যবহার করে নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্ব লুটে নেয়, তা তার জানা ছিল না। এসব মলমপার্টি তাদের আসল চেহারা লুকিয়ে রাখে শিক্ষক, মন্ত্রী, পিএস ইত্যকার পদবীর নামে, তাও তার জানা ছিল না।

আক্ষেপ হয় কারিমার জন্য! সভ্যতার হাহাকারে এই সমাজে তাকে এই জ্ঞানটুকু অর্জন করা দরকার ছিল। তাহলে আজ তাকে সতীত্বের ভিখারী হতে হতো না। সতীত্বের বাজারে তাকে একজন রিক্তহস্ত মহাজন বনতে হত না। তাই অচেতনার জগত থেকে জেগে উঠে সে নিজেকে আবিষ্কার করেছে এক দাঁতালো বন্যজন্তুর সামনে। এই একটু আগে যার কাছে সে পরম শ্রদ্ধায় জ্ঞান শিখতে এসেছিল, সেই লোকটি এখন তার চোখে একটি নরখাদক, সম্ভ্রমলুটেরা ছাড়া আর কিছু নয়। যে তার সম্ভ্রমহানীর বদলা দিচ্ছে শয়তানী ক্রুর হাসি দিয়ে। শুধু তা-ই নয়। এই ঘটনা যেন ফাঁস না হয়, তার জন্য দস্তুরমত হুমকি দিয়ে চলেছে মতিয়ার রহমান! হায় সমাজ! ইজ্জত যাওয়ার অধিকার আছে, সম্ভ্রমহানীর সুযোগ আছে, কিন্তু প্রতিকার চাওয়ার অধিকার নেই!

আসলে এক গুহায় দুইবার পা দেয়া বুদ্ধিমান মানুষের কাজ নয়। হাদীসেও এসব লোককে অসম্পূর্ণ মুমিন বলে অভিহিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি দোষ দেব কারিমা, তার মা-বাবা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ সবাইকে। কারণ, শিক্ষক নামের এই শিয়ালপণ্ডিতের কাছে তারা নিজেদের সম্ভ্রমকে বর্গা না দিলেও পারতেন। কেননা, এই লোকটির এধরনের স্বভাব তো এই প্রথম নয়! এর আগেও তিনি এই স্কুলে থাকতেই এধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। সেবারও তিনি অন্য আরেকজন ছাত্রীর সম্ভ্রম লুট করেছিলেন। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে স্কুল থেকে চাকুরিচ্যুতও করা হয়েছিল। এতশত জানার পরও শিক্ষক মতিয়ার

রহমানকে কেন প্রশ্রয় দেয়া হলো এবং অভিভাবকরা তার প্রতি আস্থা রাখলেন কেন? সেই প্রশ্নও কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। এই প্রশ্নের সমাধান আনতে পারলে এ ধরনের পাপের অনেকাংশই লাঘব হতে পারে। যে মতিয়ার দমবার পাত্র নন, সমাজের অপ্রকৃতিস্থ লোকের সহায়তায় পার পেয়ে ফিরে এসে নিজ পাপ স্বভাবে জ্বলে ওঠেন এবং তার এই জ্বলে ওঠার দাবানলে পুড়ে খাক হয়ে যায় কারিমাদের সম্ভ্রমের কচি তাজা পাতা। সেটার জন্য এক মতিয়ারকে দোষ দেয়া উচিত হবে না। অন্যথায় অপরাধ সংঘটিত হওয়ার মূল কারণগুলো মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যাবে এবং পাপ তার আপন পথে বাধাহীন গতিতে চলতে থাকবে। তাই লেজ কাটা আর গায়ের রং বদলানো মতিয়াররা যেন আবার সম্ভ্রমলুটেরা হুক্কাহুয়ার ডাকে জেগে উঠতে না পারে, সে জন্য সকল মুসলিমকে বুদ্ধিমত্তার পরিচিয় দিতে হবে। সজাগ থাকতে হবে এরা যেন আর কখনও রচনা করতে না পারে কারিমাদের সম্ভ্রমহানীর কাহিনী।

কী বিচিত্র এই সমাজ! যে ছাত্রীরা ছিল শিক্ষকদের আমানত, তাদের কন্যার মতো, সেই শিক্ষকরাই আমানতগুলোকে এভাবে নষ্ট করছে, লুট করছে কন্যাতুল্য ছাত্রীদের সম্ভ্রম! হে মাবুদ! শিক্ষার আলো দ্বারা যারা আরো দশজনকে আলোকিত করবে বলে মানবতার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারাই মানবতাকে এভাবে পদদলিত করছে! হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই বিচিত্রতার কারণ বুঝার তাওফীক দাও। সবশেষে বলব, শিক্ষক সুযোগ পেয়েই

দুর্দমনীয় হয়ে উঠছেন। তাই তিনি নিরত্যয়, এদিকে অভিভাবকগণ যেন ইন্দ্রিয়হীন হয়ে পড়েছেন তাই তারা নিরিন্দ্রিয়। দুর্বোধ্য শিরোনামের মতোই আমাদের দুর্বোধ্য সমাজব্যবস্থায়। [তথ্যসূত্র : দৈনিক আমার দেশ, শুক্রবার ২রা নভেম্বর ২০১০ ইং]

মুক্তবাসের রক্তস্রোত

রক্তস্রোত যেন চিরকালের বহমান ঝর্নাধারা, যার চলার গতিতে ভাটা নেই, বিরাম নেই। এই প্রবল গতির রক্তস্রোতকে বেগবান করেছে মুক্তবাসের অভিশপ্ত জীবন, জারি করে চলেছে খুনের নতুন নতুন দরিয়া। রক্তের প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে মানুষের হৃদয়পট। রক্তের এই জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ছে মাতৃক্রোড়ে, বিধস্ত হচ্ছে মানব-উপকূল, ধ্বংস হচ্ছে অসংখ্য পরিবার, ভাঙছে হাজারও সংসার।

এবারের নারকীয় নির্মম ঘটনাটি ২রা অক্টোবর ২০১০ইং সালের। দিনটি বৃহস্পতিবার। চট্টগ্রামের কোতোয়ালী থানাধীন আমিরবাগ এলাকায় এদিন সংঘটিত হয় সেই নির্মম হত্যাকাণ্ডটি। মুক্তবাসের এক বিষাক্ত পরিণতির শিকার হন ভার্সিটির এক ছাত্রী। নাম সারিমা রহমান মৃধাতা। বয়স ঊনিশ। বিচিত্রময় এই ধরণীর অন্য দশটি বস্তুর সঙ্গে আরেকটি তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। সখ্য গড়েন এর সঙ্গে। তার নাম প্রেম। মুক্তবাসের এই সমাজে যাকে বাধা দেয়া বা প্রতিরোধ করার সাধ্য নেই কারও। ইচ্ছাও বোধ হয় নেই অনেকের। সমাজ-সংসার ভাঙলেও এবং সভ্যতার 'রোমনগরীটা' পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেলেও বোধ হয় তারা তৃপ্তির বাঁশি বাজাতে থাকবেন পোড়োবাড়ির সামনে! কত মৃধাতা যে রক্ত দিলে জেগে উঠবে এই সমাজ, সেই কঠিন প্রশ্নটার উত্তর জানা নেই কারও। যা হোক, এবার আসি আসল কথায়।

সারিমা রহমান মৃধাতা চট্টগ্রমের এক ভার্সিটির ছাত্রী। কলেজ পড়ার সময়েই ‘একস্ট্রা ডিউটি’ হিসেবে মাথায় তুলে নেন প্রেম-ভালোবাসার কঠিন বোঝা। জড়িয়ে পড়েন সৌরভ নামের এক ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে। বেশ কিছুদিন প্রেম চালিয়ে নেবার পর যে কোনও কারণেই হোক তাদের মধ্যে মনোমালিন্যের ঘটনা ঘটে। যার ফলে সৌরভ-সারিমার সম্পর্কের অবনতি হয়। তরুণ হৃদয়ের প্রেমের উত্তালতার ঝড় এখন অনেকটাই মৃদমন্দ বাতাসের মতো। তবে থেমে যাওয়া উচ্ছ্বাসের ঝড় ফাটল সৃষ্টি করেছে তাদের প্রেমমন্দিরে। আর সেই ফাটল সারানোর জন্যই সৌরভ একটা উদ্যোগ হাতে নিলেন। পুরনো সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে সারিমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গেলেন। সম্পর্ককে স্বাভাবিক করতে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের জুয়ার মেলা বসল। কেননা, মেহেদিবাগের ৬৬/ডি নম্বর পাঁচতলা ভবনের ছাদে এই ঝুটি ছাড়াও উপস্থিত হলেন আরেক ঝুটি ইশতিয়াক সাবাহ ও তার প্রেমিক ইয়াসিন (ছদ্মনাম)। সেই জুয়ার মেলা থেকেই প্রেমিকা সারিমাকে পুনরায় প্রেমবন্ধনে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখছিলেন সৌরভ। যুগল-ঝুটি বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে আলাপ ও গল্পের আসর জমালেন ওই ছাদে।

কিন্তু সৌরভের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। সারিমা রাজি হন নি বাসি জিনিস পুনরায় ভেজে খেতে। প্রেমের এই গরম বাজারে কে-ই বা চায় বাসি প্রেম নিয়ে মাথা ঘামাতে? তাই সারিমাও চান নি এই সম্পর্কটি তাজা করতে। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্ত নির্মম করে তোলে

সৌরভকে। ভেতর থেকে উদ্গীরণ করেন তার বিষাক্ত সিদ্ধান্তটা। ছাদে গল্প বলার এক ফাঁকে দূরে ও আড়ালে নিয়ে যান তিনি সারিমাকে। কথা কাটাকাটি ও বাক্যবিনিময়ের এক পর্যায়ে বড় সাইজের একটি ছুরি দিয়ে সারিমাকে আঘাত করেন সৌরভ।

হোক না সাবেক প্রেমিক! প্রেম সাবেক হয়েছে বলে হৃদ্যতাটাও একেবারে সালাম করে চলে গেছে তা ভাবেন নি সারিমা। তাই তার তরফ থেকে এত বড় একটি আঘাতের প্রত্যাশা করেন নি তিনি। স্নেহ-ভালোবাসা আর পৃথিবীর তাবত দয়া ও আনুকূল্য পাওয়ার দাবিদার যারা, তারা এত বড় আঘাত সইতে পারে না। তাই একজন যুবকের পূর্ণ শক্তির আঘাত সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। আঘাতের তীব্রতায় সঙ্গে সঙ্গে ছাদের উত্তপ্ত বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রেম নামের এক ঝঞ্ঝাবায়ু এভাবে একটি সম্ভাবনাময় জীবন প্রদীপকে অসময়ে নিভিয়ে দিয়ে যায়। সবচেয়ে ভারী বোঝা- পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ বহন করতে হলো ব্যবসায়ী পিতা মিজানুর রহমানকে। আর মা গাইনি ডাক্তার শাহনাজ আহমাদ সন্তানের রক্তাক্ত লাশ দেখে কেঁদে বুক ভাসালেন।

পুলিশ জানিয়েছে, এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে প্রেমঘটিত কারণে এবং পূর্বপরিকল্পিতভাবে। সৌরভ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন প্রেমের সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে সারিমার সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। একারণে ছাদে আসার আগে থেকেই ছুরি

জোগাড় করে রাখা হয়েছিল। যথাসময়ে যার সদ্ব্যবহার করেছিলেন তিনি। অবশ্য তিনি প্রেমিকার হৃদয় আকৃষ্ট করতে নিজেই আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু প্রেমিকার উপেক্ষা তাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। তাই তাকেই হত্যা করে বসেন তিনি।

কত নিষ্ঠুর প্রেমিক সৌরভ! আর কত নিষ্ঠুরতা এই প্রেমের মধ্যে! প্রেমিকাকে যদি ভালোইবাসতি, তাহলে তাকে না পেলে বিরহের ফুলচন্দন নিক্ষেপ করবি! সে জায়গায় ছুরির ঘা! এই ঘটনাটিও আমাদেরকে মুক্তবাস, অবাধ জীবন ও বেপর্দার বিষাক্ত ছোবলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বোন সারিমা! তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। বোন! তুমি যদি পর্দার বিধান পালন করতে, আল্লাহর বিধান মোতাবেক চলতে, তাহলে আমার বিশ্বাস তোমাকে নির্মম পরিণতির শিকার হতে হতো না। পিশাচীয় উন্মত্ততা নিয়ে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত না সৌরভ।

একজন ঘোর পর্দাবিরোধীও একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না যে, পর্দালঙ্ঘন তাকে এই পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই বিশ্বাস আরেকটু পোক্ত হচ্ছে যে, মুক্তবাস এভাবেই জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয়।

কন্যা হারিয়ে যে মা-বাবা আজ কষ্টের আগুনে দগ্ধ হচ্ছেন, সেই আগুনের ইন্ধন কি তারা নিজেরাই সরবরাহ করেন নি? অবুঝ কিশোরী কন্যাকে প্রেমনিবেদন করতে দেখে তারা নীরব থাকলেন কেন? মেয়েটি যখন প্রেমের সর্বনাশা ফাঁদে পা দিচ্ছিলেন, তখন

তারা গাফেল থাকলেন কেন? এই গাফলতির যে পরিণতি, তা কি আজ তারা বরদাশত করতে পারছেন? কিংবা অন্য মা-বাবারাও কি পারবেন এধরনের পরিণতি সহ্য করতে? যদি না পারেন, তাহলে উচিত এই পথ পরিহার করা এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসা।

সম্ভ্রমের ধ্বংসাবশেষ

সংসারের একঘেয়েমি কাটাতে কিংবা নাড়ীর টানে সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে সহোদরা দুই বোন বেড়াতে এলেন চাচার বাসায় নারায়ণগঞ্জ জেলায়। ঘটনাটি ২০১০ ইং সালের শুরুর দিকের। কিন্তু তাদের এই বেড়ানোটা কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মুক্তজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ঘুণেধরা এই সমাজের লাম্পট্যের ঘৃণিত ইতিহাস। লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল তাদের স্বাভাবিক জীবন। সময়ের বহু আগেই রচিত হয়েছিল তাদের স্বপ্নের সমাধি। পঠিত হলো স্মরণ-অযোগ্য এক ন্যাক্কারজনক ইতিহাস।

সুমা-সুষ্মা (ছদ্মনাম)-দের বড় স্বপ্ন ছিল। স্বামীকে তারা উপহার দেবে নিষ্কলঙ্ক সতীত্ব**।** নির্ভেজাল গর্ভে স্বামীর ঔরসে জন্ম হবে আদরের সন্তান। সন্তান আর স্বামীকে নিয়ে গড়বেন সুখের সংসার। আরও কত কী সুখস্বপ্ন! কিন্তু তাদের ভুল পদক্ষেপে আর ভঙ্গুর সমাজের চিটে লোকদের রিপুর কাঠিতে কামনার আগুন জ্বলে ওঠায় তাদের সেই সুখনীড় নিমিষেই জ্বলে ছাই হয়ে গেল। তাদের জীবনের এখানে-সেখানে কেবল পাশবিকতার ধ্বংসাবশেষ আর লাঞ্ছনার আবর্জনা। তাদের দেহের গাটে-গাটে এখন কলঙ্কের অদৃশ্য দাগ। নরপশুদের কামনার নখরাঘাত। প্রিয় পাঠক! ভূমিকাটা বড় হয়ে গেল। চলুন, এবার ঘটনার মূলে ফিরে আসা যাক।

সুমা-সুষ্মা বেড়াতে এলেন চাচার বাসায় সুদূর নারায়ণগঞ্জে। উত্তরবঙ্গ থেকে নারায়ণগঞ্জ আসার পথে দুচোখ ভরে তারা দেখলেন প্রকৃতির সৌন্দর্য। দুই ধারে সবুজের গালিচা। মুক্তবিহঙ্গদের ছোটাছুটি-কোলাহল। এসব দৃশ্য হয়ত তাদেরকে অন্য কিছু ভাবতে সহায়তা করেছিল। তারা নিজেরাও হতে চেয়েছিলেন বিহঙ্গদের মতো মুক্তবাসিনী। এসব অলীক ভাবনার মধ্যে ডুব দিয়ে তারা ভুলে গেলেন তাদের সৃষ্টিমাহাত্ম্যের কথা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজীবের মর্যাদাকে নিয়ে গেলেন জীবজন্তুদের স্তরে। আর ভুলে গেলেন মুক্তবাসের অভিশাপের কথা। নির্দয় সমাজের লাম্পট্যের আধিক্যতার কথা।

আর ভুলে গেলেন অথবা কোনোদিন হয়ত কানেই পড়ে নি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণীর কথা, যাতে তিনি নারীদেরকে সম্ভ্রম রক্ষার কৌশল বাতলে দিয়েছেন। করেছেন তাদেরকে অনাহুত বিপদ থেকে সতর্ক, সজাগ। আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ إِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ-

'নারী হলো পর্দাবৃত থাকার মানুষ। সে যখন পর্দা থেকে বের হয়ে আসে শয়তান, তখন তার দিকে খারাপভাবে উঁকি দিয়ে তাকায়।' [মুসনাদ বাযযার : ২০৬৫; সহীহ ইবন খুযাইমা : ১৬৮৫]

শয়তান শুধু নিজেই উঁকি দেয় না, বখাটে ইভটিজারদেরকেও উস্কে দেয়। সুমা-সুষ্মা এই হাদীসের সত্যতার চাক্ষুসদর্শী হলেন

নিজেদের অসতর্কতার কারণে। চাচার বাড়ি থেকে বিকেলবেলা বেড়াতে গেলেন আরেক আত্মীয়ের বাড়ি। তাদের এই গমনপথে তাদের দিকে উঁকি দিয়ে রাখল শয়তান ও তার দোসররা। সুমা-সুষ্মা নিজেরাই যাদের পথ সহজ করে দিয়েছিলেন।

অপরিচিত জায়গা, অপরিচিত মানুষের মধ্যে সেই আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরতি পথ ধরলেন রাত আটটায়। ফেরার পথটিও অনুকূল ছিল না। ঝোঁপঝাড়ের মধ্য দিয়ে অন্ধকার পথে চলতে হচ্ছিল তাদের। আর ঠিক সেসময়েই ঘটল তাদের জীবনের সবচেয়ে সর্বনাশা ঘটনাটা। নিজেদের হাতে রচিত দুর্ভাগ্য বিভীষিকা হয়ে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে। ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা হিংস্রদানবগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। চাচাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দুই বোনকে দুই দিকে নিয়ে গিয়ে তাদের লাঞ্ছিত ও সম্ভ্রমহানী করে।

একই সঙ্গে দুইবোনের সম্ভ্রমহানী! তাও আবার আপন চাচার সামনে! এর চেয়ে নিষ্ঠুর, নির্মম আর করুণ দৃশ্য আর কী হতে পারে? লম্পটদের রিপুর তাড়না যতক্ষণে নিস্তেজ হয়ে এসেছে, ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে সুমা-সুষ্মাদের। সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার ও সম্মানজনক জীবন যাপনের স্বপ্নের সমাধি ঘটেছে ততক্ষণে।

ঘটনাটি যাতে ফাঁস না হয়, তার জন্য বখাটেরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সমঝোতা করে। সমঝোতায় দুই বোনের সম্ভ্রমের মূল্য নির্ধারণ করা হয় দশ হাজার টাকা! হায় সমাজ! দুইজন যুবতী

নারীর সম্ভ্রমের মূল্য মাত্র দশ হাজার টাকা! ইজ্জতের বাজারে সম্ভ্রমের মূল্য এত কম? আচ্ছা, নারীর ইজ্জতের মূল্য পরিশোধ করা যায়? দশ হাজার টাকায়? দশ লক্ষ টাকায়? দশ কোটি টাকায়?

যা হোক, অভাগী সুমা-সুষ্মারা সমঝোতার চুক্তি মানেন নি। যাদের স্বপ্নই ধূলিস্মাৎ হয়ে গেছে, তাদের কাছে সমঝোতার মূল্য কী? তারা কি পারেন কষ্টের আগুন চেপে রাখতে? তাই বিচারের প্রার্থনায় আইনের লোকদের কাছে ছুটে গেছেন আর লুণ্ঠিত সম্ভ্রমকে সওদা বানিয়ে যারা ব্যবসা করে, সেই মিডিয়া রূপ-রস চড়িয়ে এই গল্পকে আকর্ষণীয় আকারে পেশ করে পুরো জাতির সমানে তুলে ধরে সুমা-সুষ্মাদের জীবনকে আরও বিষিয়ে তুলেছে। আজ তারা জাতির সামনে মুখ দেখানোরও অধিকার হারিয়েছে এই মিডিয়ার কল্যাণে(?)!

আমাদের জানাশোনার মধ্যে সংঘটিত হলো এমন একটি ঘটনা, যার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। আমরা ইচ্ছা করলে হয়ত সুমা-সুষ্মাদেরকে সমবেদনা জানাতে পারি। কেউ ইচ্ছা করলে আর্থিক সাহায্যও করতে পারি। কিন্তু যে ক্ষতি হয়েছে, তাতে তাদের ক্ষতির ভার কমবে না। তাই তাদের এই করুণ পরিণতি কেবলই ইতিহাস। আর আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে পারি। কেননা, ইতিহাস হলো মানুষের সার্বক্ষণিক উপদেষ্টা। এর থেকে সর্বদা উপদেশ নেয়া যেতে পারে। আমরা এখান থেকে যে শিক্ষা নিতে

পারি তাহলো; সুমা-সুষ্মারা এই পরিণতির শিকার হয়েছেন মূলত দুটি কারণে। এক. পর্দাহীনতা, দুই. অসতর্কতা।

অথচ এদুটি বিষয়েই কিন্তু শরীয়তের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এই দিকনির্দেশনা মানলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, তাদেরকে এই পরিণতির শিকার হতে হতো না। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আবার প্রমাণিত হলো, আসল সুখ 'অবরোধবাসিনী'তে; 'মুক্তবাসিনী'তে নয়।

নিন্দিত পথে জায়ার যাত্রা

জায়ারা হলেন সমাজ-সংসারের গুরুত্বপূর্ণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি। তাদের বক্রপথে চলায় শান্তি ও স্থিতিশীলিতা নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। রক্তস্রোত আর রক্তপাতের নতুন-নতুন ঝর্নাধারা প্রবাহিত হয়। আমাদেরকে আর কত লিখতে হবে রক্তপাত আর রক্তস্রোতের কাহিনী? এসব লিখতে-লিখতে যে হাত অবশ হয়ে এলো! শ্রেষ্ঠজীব মানুষের জীবন সৌন্দর্যের বদলায় রক্ত, রক্তপাত আর জীবনহরণের কাহিনী লেখায় রুচি জোগাড় করা সত্যিকার অর্থেই কঠিন। কিন্তু মুক্তবাসিনী বইটা লিখতে গিয়ে এই কঠিন পথেই পা মাড়াতে হচ্ছে। প্রেম, পরকীয়া আর বেপর্দা জীবনের বিষাক্ত ছোবল সম্পর্কে নারীজাতিকে সচেতন করতে আমাকে বারবার এসব কাহিনী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হচ্ছে। দৈনিক পত্রিকাগুলো হাতে নিয়ে কামনা করি যেন আর কোনও খুন, ধর্ষণ বা নারীহত্যার ঘটনা পাঠ করতে না হয়। কিন্তু চোখ আমাকে হতাশ করে। দুচোখের পাতায় ভেসে ওঠে নারী কিংবা পুরুষের রক্তপাতের নোনা কাহিনী। সেসব নোনা কাহিনীই পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে হয় আমাকে, জাতির বিবেক জাগ্রত করার ব্রতে। সেসব কাহিনীরই একটি নিচের কাহিনীটি।

পড়ুন : ৩রা নভেম্বর ২০১০ইং। রোজ বুধবার। এ মাটির চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র আর মানব-দানব প্রত্যক্ষ করল আরেকটি রক্তভেজা কাহিনী।

টাঙ্গাইলের গোপালপুর লাহিড়ী বাড়ির বাসিন্দা হাসান আলী। আট মাস আগে বাড্ডার মোল্লারটেকের বাসিন্দা নীলা মেহরুনকে বিয়ে করে নতুন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নতুন সংসার শুরু করেছেন তিনি। সংসারটাকে মধুময় ও দাম্পত্য জীবনকে নিষ্কণ্টক করতে স্ত্রীকে গাজীপুর নিয়ে আসেন হাসান আলী। তিনি গাজীপুরের একটি টেক্সটাইল মিলের কোয়ালিটি কন্ট্রোলার।

নববধূকে নিয়ে ভালোই কাটছিল বিবাহের নতুন দিনকগুলি। সুখের অধরা পায়রাগুলো একে একে লুটোপুটি খাচ্ছিল নবদম্পতির সুখ আঙিনায়। দুহাতে ঠেলেও সেই সুখ-পায়রাগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখা দায়! কিন্তু এমন সব মধুর ভালোবাসা আর সুখের অনুভূতিগুলো দীর্ঘ হলো না। পরকীয়ার একটি ঝড় এসে তাদের সুখপাখিটাকে অনেক দূরে নিয়ে গেল। ভেঙে দিল সুখপাখিটার ওড়ার ডানা।

দুই মাস আগে হাসান জানতে পারেন তার প্রিয়তমা স্ত্রী কেবল তার একার নয়! অন্য এক সুখপাখির ডানায় ভর করে আরেকটু সুখ পাওয়ার আশায় কিংবা ভালোবাসার নতুন নীড় রচনার আশায় নীলা মেহরুন নতুন স্বপ্ন গাঁথছেন। এই স্বপ্ন যে সর্বদাই অলীক স্বপ্ন হয়ে ধরা দেয়, মরীচিকার মতো আশাহত করে পিপাসার্ত পথিককে সে কথা ভুলে যান নীলা। এই স্বপ্নের পরিচিত ও আধুনিক নাম পরকীয়া। বুদ্ধিমান নারী-পুরুষের কাছে যা একটা জীবন্ত আতংকের নাম।

স্ত্রীর ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার থাকা একজন স্বামীর প্রত্যাশিত ও বৈধ অধিকার, ঠিক একইভাবে একজন স্বামীতে পূর্ণমাত্রার অধিকার থাকাও একজন নারীর পরম চাওয়া। এই প্রত্যাশা ও চাওয়াচাওয়িতে কোনও অপরাধ বা বাড়াবাড়ি নেই। বরং তা প্রশংসিত ও সর্বজন গৃহীত।

এই প্রত্যাশার বাইরে কেউ কোনও কিছু বরদাশত করে না। তাই সঙ্গত কারণেই হাসান আলী যখন জানতে পারলেন যে, স্ত্রী নীলার সঙ্গে তার সম্পর্ক কেবলই দেহকেন্দ্রিক, মনের আদান-প্রদান হয় বাড্ডার রাজু নামের এক যুবকের সঙ্গে, তখন তার মেজাজ তিন-চার রকমের হয়ে যায়। শুরু হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকর চির অবাঞ্ছিত অধ্যায়। ঝগড়া। এক পর্যায়ে গালাগালি এবং পরিণতিতে মারামারি। সেখান থেকে নারীর দুর্বল দেহের ওপর পুরুষের শাসন ও প্রহারের হাত। যা হোক, এই ঝগড়া-ফ্যাসাদের কবলে পড়ে মন বিষিয়ে ওঠে নীলার। রাগে-অভিমানে মায়ের কাছে চলে আসেন তিনি।

২রা নভেম্বর। মঙ্গলবার। অভিমানী স্ত্রীর মোবাইল নাম্বারে কল দেন হাসান আলী। ফোনে স্ত্রীকে দেখা করতে বলেন তিনি। আর যাই হোন না কেন, তার প্রথম পরিচয় হচ্ছে তিনি নারী। আর একজন নারীসত্তার স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেয়া চিরবাঞ্ছিত স্বভাব। তাই হাসানের আহবানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না নীলা। বহুদিন পর স্বামী-স্ত্রীর মিলনে পরিবেশটা মধুর হয়ে ওঠে। দু’জন মিলে সারাদিন ঘুরে বেড়ান তারা। আর বিকেলবেলায় আশ্রয় নেন

বনানীর পূর্ণিমা আবাসিক হোটেলের ১০৩ নং কক্ষে। সম্ভবত এই কক্ষের এক টুকরো মাটি কিংবা ধুলোবালির সঙ্গে নীলার দেহের যোগসূত্র ছিল। তাই এখানে এসে সেই লিখিত ভাগ্যের অনুবাদ ঘটল। হোটেল পূর্ণিমার ১০৩নং কক্ষে আসার প্রয়োজন ছিল নীলার পরযাত্রার পথ সুগম করার জন্য।

সারাদিন মাহেন্দ্রক্ষণের মধ্য দিয়ে কাটালেও রাতে পরকীয়ার ব্যাপার নিয়ে আবার ঝগড়া বাঁধে হাসান ও নীলার মধ্যে। থেমে-থেমে চলে এই ঝগড়া। রাতের এই ঝগড়ার জের থাকে সকাল পর্যন্ত। সকালে হয় আরেক দফা। ভোরের সময়কার ঝগড়ায় মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা ভুলে যান হাসান। ফলে ক্রোধে, উন্মত্ততায় হোটেল কক্ষের জানালার পাইপ দিয়ে স্ত্রীর মাথায় আঘাত করেন তিনি। আঘাতের প্রচন্ডতায় মাথা ফেটে রক্ত বের হয় নীলার। এ রক্ত পরকীয়ার পাপের আর হাসানের হিংস্র ক্রোধের।

সামান্য রক্তে শান্ত হন না হাসান। আরও রক্ত চাই তার। চাই পুরো প্রাণটাই। তাই উন্মাদনার সর্বোচ্চ শিখরে পা রাখেন তিনি। অসহায়, অবলা, আহত নারীর প্রতি একটুও মায়া জাগে না তার। নীলার অপরাধটাই শুধু বড় হয়ে দেখা দেয় তার কাছে। তাই ক্ষমা কিংবা আহত স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতির সংজ্ঞা মুছে যায় তার অভিধান থেকে। নীলার গলা চেপে ধরেন তিনি। শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে তবেই ক্ষান্ত হওয়া। মা-বাবা, ভাই-বোন আর আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টির আড়ালে স্বামীর প্রচণ্ড নির্মমতায় একটি অপরিচিত কক্ষে চিরদিনের জন্য শান্ত হয়ে যান লীনা। নির্মম পরিণতির

শিকার নীলার বিদেহী আত্মার প্রতি আমার সালাম ও মাগফিরাত কামনা।

হাসান পরে নিজেই জানিয়েছেন, ভোর পাঁচটার দিকে নীলার লাশ হোটেলকক্ষে রেখে নাস্তা আনার কথা বলে হোটেল থেকে বেরিয়ে যান তিনি। এই নির্মম ঘটনার জন্ম দিয়ে এক পর্যায়ে তার মধ্যেও ভাবান্তর ঘটে। স্ত্রীর সহযাত্রী হওয়ার পদক্ষেপ নেন তিনি। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে গিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান। কিন্তু ব্যর্থ হন। পরে শাহবাগ থানায় গিয়ে ডিউটি অফিসারের হাতে ধরা দেন। পুলিশের কাজ সহজ করে খুনি নিজেই নিজের হাতে শিকল পরেন। [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ ৪ঠা নভেম্বর ২০১০ইং বৃহস্পতিবার]

পাঠক, আসুন আমরা এই ঘটনার পোস্টমর্টেম করি। দেখুন, কে এমন নীরস প্রাণ যে, স্ত্রীকে ভালোবাসে না? নারীর মধ্যে আল্লাহ এমন এক আকর্ষণ গচ্ছিত রেখেছেন, যার টানে পুরুষরা কাবু হবেই। এমন এক শক্তির অধিকারী নারীকে যখন কোনও পুরুষ বধূর মর্যাদা দিয়ে ঘরে নিয়ে আসে, তখন স্বামী ওই নারীর প্রতি নিবেদন করে সারা জীবনের গচ্ছিত প্রেম, রক্ষিত ভালোবাসা। তাকে নিয়ে শুরু করে নতুন জীবন, পবিত্র বন্ধন। স্ত্রীর সুখচিন্তায় স্বামী সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়। হাড়ভাঙা খাটুনি করে। স্ত্রীর প্রতি এই ভালোবাসার কারণেই তো জগতের মাতৃকূলেরা বউদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, বৌটাই তার কাছ থেকে তার সন্তানটাকে কেড়ে নিয়ে গেল! একথা কিন্তু সত্য যে, বউদের আকর্ষণেই

ছেলেরা মা-বাবাকে ত্যাগ করে, যদিও এটা ক্ষমার অযোগ্য অমানবিক ও অনৈতিক কাজ।

তো যে নারীর কারণে একজন সন্তান তার জন্মদাতা মা-বাবা থেকে আলাদা হয়ে যায়, মায়ের অসীম ত্যাগ, কুরবানী ও স্নেহের কথা ভুলে যায়, সেই নারীর প্রতি কেন সে খড়গহস্ত হবে- এই প্রশ্ন কখনও করি আমরা? এই প্রশ্নের সমাধান করা প্রতিটি বিবেকবান মানুষের একান্ত দায়িত্ব এবং এর উত্তর খুঁজে বের করতে পারলেই কেবল এসব সমস্যার সমাধান বের হয়ে আসবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর প্রতি পুরুষের এই দানবতার মূল কারণ প্রেম, পরকীয়া এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন। আগে-পরের নানা ঘটনা আমাদেরকে এই তিক্ত বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য করে।

আলোচ্য ঘটনার প্রতিই নজর দিন। মাত্র আট-মাস বয়স বিয়ের। এই অল্প দিনে কী হলো যে, নিজ স্ত্রীর রক্ত প্রবাহিত করতে হবে হাসানের? হ্যাঁ, এখানে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে হাসানের দানবীয় হয়ে ওঠার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। কেননা, বিয়ের মাত্র কয়েক দিনের মাথায় হাসান জানতে পারেন যে, স্ত্রী নীলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজুর সঙ্গে প্রেমালাপ করে। স্বামীর তরে যে ভালোবাসা নিবেদন করার কথা, সেই ভালোবাসা, সেই আবেগ, সেই উচ্ছ্বাস নিবেদন করে অন্য পুরুষের সঙ্গে!

হাসানকে যুগপৎ সাধুবাদ ও নিন্দা জানাতে হয়। কারণ, প্রথমে তিনি স্ত্রীর এই পরকীয়া এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। দেখেও না দেখার ভান করেন স্ত্রীর পরকীয়া অভিসার। তাকে সাধুবাদ

স্ত্রীর প্রতি প্রথমেই খড়গহস্ত না হওয়ার জন্য আর নিন্দাবাদ ভাঙনের মুখে যথাসময়ে বাঁধ না দেয়ার কারণে।

তবে একথা সত্য যে, একজন পুরুষ ভাস্কর্য নয় যে, স্ত্রীর অনৈতিকতা দেখেও ভাস্কর্যসত্তা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে বহুকাল। সেই দর্শনেই হাসানের পুরুষসত্তা জেগে ওঠে সৃষ্টিগত ক্রোধমহিমায়। স্ত্রীর অনৈতিকতার জলোচ্ছ্বাসে তার ভালোবাসার মিনার ভেঙে পড়ে। ভালোবাসার সেই ধ্বংসস্তূপে নির্মিত হয় দানবতা আর রক্তপিপাসার নিষ্ঠুর প্রাসাদ। তাই স্ত্রীকে বেড়ানোর কথা বলে নিয়ে যান মৃত্যুকূপে। নিষ্ঠুর, নির্দয়ভাবে হত্যা করেন তাকে। এরপর ভালোবাসার হতাশা আর পরকীয়ার বিরক্তি নিয়ে পুলিশের হাতে নিজেকে ধরা দেন। এভাবেই স্ত্রী ও নিজের জীবনকে মূল্যহীন করে দেয় পরকীয়ার বিষাক্ত জীবন।

অনিরাপদ মাতৃক্রোড়

৫ই জুলাই জন্ম দিবস[6]। **জন্মদিবসে বাবার কাছে ছোট্ট বাইসাইকেল দাবি করে রেখেছে শিশু সামিউল।** বয়স মাত্র পাঁচ। জন্মদিনকে ঘিরে আবেগে-অনুভূতিতে হৃদয়টা নাচছে তার। কিন্তু সেই জন্মদিন ফিরে আসেনি সামিউলের, আসবেও না আর কোনও দিন। কেননা, মায়ের পরকীয়া কেড়ে নিয়েছে তার নিরাপরাধ জীবন। কেড়ে নিয়েছে জন্মদিনে কেক কাটার স্বাদ।

ঘটনাটা ২০১০ইং সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহ। আদাবর থানা এলাকা। ২৪ই জুন বৃহস্পতিবার নবোদয় হাউজিংয়ের একটি প্লটে লাশ পাওয়া যায় শিশু সামিউলের। ঘটনার বীভৎসতায় চমকে ওঠেন সবাই। **ঘটনা ও ঘটনার কুশীলবদের কাহিনী শুনুন আগে :**

এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বেশ কিছু দিন আগে নাদিরা জামান সাথী নামের এক মহিলা রেডিও আমার-এর 'আমার ভালোবাসা' অনুষ্ঠানে একটি লাইভ সাক্ষাৎকার দেন। সেই সাক্ষাৎকারে অশ্রুসিক্ত হন তিনি নিজে এবং অশ্রুসিক্ত করেন অসংখ্য শ্রোতাকে। তার কষ্টের কথা, দুঃখ ও আবেগের কথা শ্রবণ করে কাঁদেন নি সম্ভবত এমন শ্রোতার সংখ্যা খুব বেশি হবে না।

সেই সাক্ষাতকারে তিনি হুমায়রা আক্তার এশার সঙ্গে তার স্বামীর পরকীয়ার কথা উল্লেখ করেন। সাক্ষাৎকারে তিনি কয়েকবার রেডিওর মাধ্যমে এশার কাছে অনুরোধ করেন, যেন তার স্বামীকে

---

[6] যদিও ইসলামে জন্মদিবস পালন সমর্থিত নয়। [সম্পাদক]

সে ফিরিয়ে দেয়। তার আবেদনের ভাষা শুনে সেদিন বহু শ্রোতা চোখের অশ্রু ফেলেছিল, কেঁদেছিল সহমর্মিতায়।

পুরো ঘটনাটা শুনুন :

নাদিরা জামান সাথী বলেন, আমার সঙ্গে শামসুজ্জামানের পরিচয় হয় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আট বছর আগে। অপরিচিত নাম্বার থেকে আসা শামসুজ্জামান আরিফ নামের লোকটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। প্রথম দেড় বছর ফোনেই প্রেম। নতুন মোবাইল ব্যবহারকারী হিসেবে কথা বলতে-বলতে প্রেম। দেড় বছর গত হয়ে গেলে দুজন দুজনকে দেখার জন্য উদগ্রীব ও ব্যগ্র হয়ে উঠি। সেই ব্যগ্রতা থেকেই কথামতো শাহবাগ মোড়ে দেখা। মোবাইলের আরিফের সঙ্গে বাস্তব সুমনের মিল পাওয়া গেল না। কারণ, মোবাইলে শোনা আরিফের কণ্ঠস্বর সুন্দর হলেও দেখতে সুন্দর নন তিনি। তাই বাসায় ফিরে এসে অনেকক্ষণ কাঁদি।

তার পরও সম্পর্ক বিয়েতে গড়ায়। তখন আমার বয়স মাত্র বাইশ। যদিও এর আগে আমার একটি বিয়ে হয়েছিল। সেখানে বনিবনা না হওয়ার কারণে বিয়ে ভেঙে যায়। আরিফ তা জেনেই আমাকে বিয়ে করে। বিয়ের আগে জানতে পারি, সে বিবাহিত। এটা ছিল দ্বিতীয় আঘাত। কিন্তু এতদূর যাওয়ার পর ফিরে আসারও পথ খোলা ছিল না। তাই নিজের দ্বিতীয় বিয়ে হয় আরিফের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবেই। বিয়ের পর কিছুটা অবহেলিত অবস্থাতেই বসবাস শুরু হয় মোহাম্মাদপুরের ভাড়া বাসায়। প্রেম দিয়ে শুরু করা বিয়েতে একের পর এক আঘাত আসতে থাকে।

প্রথম আঘাতটা আসে আরিফের প্রথম স্ত্রীর পক্ষ থেকে। মোহাম্মাদপুরে যেখানে থাকতাম, একদিন আরিফের প্রথম স্ত্রী সেখানে হাজির হয়ে তাকে মারধর করে। স্ত্রীর কাছে ধরা খাওয়ার পর আরিফ জানায়, এই বাসা বদলাতে হবে। সতীনের রুদ্রমূর্তি দেখে আমি নিজেও ভয় পেয়ে যাই। তাই আরিফের কথামতো বাসা বদলিয়ে নতুন বাসা নিই শ্যামলীর নবোদয় হাউজিংয়ে। কিন্তু বাসা বদলালেও প্রথম স্ত্রীর নির্যাতন থেকে আরিফ রেহাই পাচ্ছিল না। স্ত্রীর চাপে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে আরিফ তার টঙ্গীর জায়গা প্রথম স্ত্রীর নামে লিখে দেয়। এর পরেও আরিফের সঙ্গে তার সম্পর্কের টানাপড়েন চলতে থাকে।

সাথী জানান, একপর্যায়ে আরিফ বড় বউয়ের কথামতো আদালতে গিয়ে তাকে তালাকও দিয়ে দেয়। কিন্তু তিনি অন্তঃসত্তা হওয়ার কারণে তালাক কার্যকর হয় নি (উল্লেখ্য, এটা ইসলামী বিধান নয়। কারণ, ইসলামী বিধানমতে স্ত্রী অন্তঃসত্তা হলেও তালাক কার্যকর হবে, তবে ইদ্দতে থাকাকালীন অন্য কারও সাথে বিয়ে বসতে পারবে না)।

আদালতের কারণে সাথীকে বিতাড়িত করতে না পেরে আরিফের প্রথম স্ত্রীর ক্রোধ যেন আগুনে পরিণত হয়। তাই তার প্ররোচনায় সাত মাসের অন্তঃসত্তা অবস্থায় আরিফ তাকে হত্যারও চেষ্টা করেছিল। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে- نِعْمَ الْحَارِسُ الأَجَلُ 'সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রহরী হচ্ছে মানুষের মৃত্যুভাগ্য।' অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর নির্ধারিত দিনক্ষণই তাকে অপমৃত্যু থেকে পাহারাদারী করে

রক্ষা করে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর সময় না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাকে মারতে পারে না। সাথীর ক্ষেত্রে এই প্রবাদ একশ ভাগ সত্য প্রমাণিত হলো। আরিফ তাকে হত্যা করার চেষ্টা করলেও সাথীর 'আজাল' তাকে এই অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে।

পরিকল্পনা ভেঙে যাওয়ার এক বছর পর আরিফ তা স্বীকার করে ক্ষমাও চেয়েছিলেন। সাথী নিজের সম্পর্কে জানান, ছোট একটি ভাই বাদে সংসারে আরও আছেন তার মা। বাবা থেকেও নেই। তবে তারা কেউই তার খোঁজখবর নেন না। আর স্বামী আরিফের আপন পাঁচ ভাই। নুরুজ্জামান নামের এক দেবরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রেডিওতে সাক্ষাতকার দিতে যান।

এশার সঙ্গে তার স্বামীর পরকীয়ার সূত্রপাত সম্পর্কে সাথী বলেন- বিউটি পার্লার দিয়েছিলাম ব্যবসার জন্য। এ পার্লারের কারণেই আমি আজ স্বামীহারা। আয়শা হুমায়রা এশা নামের প্রতিবেশী এক কাষ্টমার একপর্যায়ে আমার বান্ধবী হয়ে যায়। দ্রুত আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে যাই। এশার বাড়ি চট্রগ্রামে। বাবা জসিম উদ্দিনের সঙ্গে তার মায়ের বনিবনা না হওয়ার কারণে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এশা ও তার ভাই আকিব ও আলফিকে নিয়ে তার মা এক ডাক্তারকে বিয়ে করেন। এশার স্বামী আজম ওরফে রোজের বাড়ি রাজবাড়ির মাছবাড়িতে। সাথী বলেন, ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হওয়ায় এশার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। আলোচনায় থাকত নানা অন্তরঙ্গ কথাও। এসব অন্তরঙ্গ আলোচনার এক পর্যায়ে এশা মুখ ফসকে বলেই ফেলল, সে পরকীয়া প্রেমে জড়াবে! তার স্বামীর

কিছু (শারীরিক) সমস্যাও ছিল। আমার স্বামী কী পারে না পারে এসব বিষয়ে আমি আলোচনা করতাম (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীসুলভ দাম্পত্য বিষয়)। দেখতাম, এশা এতে বেশ আগ্রহ দেখায় এবং কৌতূহল অনুভব করে। স্বামীর শারীরিক সমস্যাই হয়ত তাকে অন্যের স্বামীর ব্যাপারে উৎসাহী এবং পরকীয়ায় জড়ানোর প্রতি অনুপ্রাণিত করত। কিন্তু তাই বলে যে সে আমার স্বামীর সঙ্গেই পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়বে, তা ভাবতে পারিনি কখনও।

আমার বাচ্চার জন্মদিনে এশা আসত। অনেক কাজেই তার সঙ্গে যোগাযোগ হত, আড্ডা দেয়া হতো। ব্যবসায়িক কারণে টাকা লেনদেনের সময় আরিফের সঙ্গে এশার পরকীয়ার ব্যাপারটি বুঝতে পারি নি। এরপর নবোদয় হাউজিং থেকে মালেক সাহেবেরে বাড়িতে বাসা স্থানান্তর করি। বাসা বদলের পর এশার সঙ্গে আরিফের পরকীয়ার ব্যাপারটি আমারে নজরে আসে। তারপর লোকমুখেও শুনতে পাই তাদের গোপন সম্পর্কের কথা। বেড়াতে যাওয়া, নগদ তিন লাখ টাকা লেনদেন ইত্যাদি তথ্য আমার কাছে প্রকাশিত হয়।

টাকা লেনদেনসহ আরিফের সঙ্গে এশার ঘনিষ্ঠতার কথা তার স্বামী আজম ভাইকে বলেও কাজ হয় নি। আজম ভাইয়ের নিরুত্তাপ ভাব এবং ব্যবস্থা না নেয়া দেখে এশার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিও মারাত্মক ক্ষিপ্ত হয়ে যাই। এরপর নানা রকম তথ্য পেয়ে একদিন এশার স্বামী এবং নীলা ও ননী নামের তার দুই বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হই। এমনকি এশার সঙ্গে জুতা মারামারি পর্যন্ত

হয়। এ সম্পর্ক নিয়ে অনেক সিনক্রিয়েট হয়েছে, আরিফ অনেকবার কুরআন ছুঁয়ে শপথও করেছে। তাতেও কাজ হয়নি। এশার স্বামী আজম ভাইকে তার শারীরিক সুস্থতার জন্য ডাক্তার দেখাতে বলেছি, যাতে তিনি এশার চাহিদা পূরণ করতে পারেন।
সাথী আরো বলেন, আরিফ ব্যবসার পাশাপাশি ইলেকট্রিক মিটার ট্যাম্পারিংয়ের কাজ করত। একাজে সে মাঝে-মধ্যেই ভৈরব যেত। অনেকদিন এশা তার সঙ্গে ভৈরব গেছে বলে জানতে পেরেছি। এশার ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি আরো বলেন, দুনিয়ায় হয় ও থাকবে, না হয় আমি থাকব। হয় ও মরবে, না হয় আমি মরব। আমি অসহায়। আমার শিক্ষা কম। এশাকে কতবার বলেছি, আমার স্বামীটাকে আমাকে ভিক্ষা দাও। আমার কাছে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও। পৃথিবীতে এর চেয়ে হৃদয়বিদারক আবেদন আর কী হতে পারে যে, একজন স্ত্রী তার স্বামীকে ভিক্ষা হিসেবে মাঙবে অন্য একজন নারীর কাছে?
কিন্তু এমন একটি আকুল আবেদনেও কাজ হয় নি। মন গলে নি এশার। পিছু ছাড়ে নি সে আরিফের। তাই একপর্যায়ে হতাশ হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করি। কিন্তু যেকোনও কারণে হোক, তাতেও সফল হতে পারি নি। অবশেষে নিজ স্বামীকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করি। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় সফলতা পাওয়ার আশা করা ছিল বাতুলতা মাত্র। আরিফ প্রথম বিয়ে করেছে ভালোবেসে। আমাকেও বিয়ে করেছে ভালোবেসে। এখন আবার এশার সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত! এশাকেও এবিষয়টি বুঝিয়েছি। তাকে বুঝিয়েছি,

আজ তোমাকে ভালোবাসার প্রলোভন দেখাচ্ছে, কাল তোমার সামনে অন্যকে প্রলোভন দেখাবে না, এর কোনও নিশ্চয়তা আছে? কিন্তু সে কিছুতেই দমেনি। কানে তোলেনি এসব অকাট্য যুক্তি। যে কোনও মূল্যে সে আমার স্বামী আরিফকে পেতে চেয়েছে।

আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে এশার পিছনে পড়ল কেন তা বুঝতে চেষ্টা করেছি। সে কি আমার চেয়ে সুন্দরী? আমি অনেক সময় রাস্তায় নেমে মানুষকে বলতাম, আচ্ছা ভাই, বলুনতো আমি কি অসুন্দর? পাগলের মতো আমি বহুদিন রাস্তায় নেমে এ ধরনের কথা বলেছি।

শুনেছিলাম ইয়াবা খেলে মানুষ সুন্দর হয়। আমি আরও সুন্দর হওয়ার জন্য কিছুদিন ইয়াবা খেয়েছিলাম। আরিফ এশাকে নিয়ে অন্য কোথাও ইয়াবা খায় শুনে আমারও আগ্রহ বেড়েছিল এ ব্যাপারে। তাই তাকে আটকানোর জন্য শেষ পর্যন্ত ইয়াবা ধরেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি।

আমি ভাবতাম, এশাতো আমার চেয়ে সুন্দরী নয়। তাহলে কেন আমার স্বামী তার পিছু নিল? তাই স্বামীর সামনে নিজেকে আরও সুন্দর করে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই এই সর্বনাশা ইয়াবা ধরেছিলাম। শুধু তা-ই নয়, আমি বহুদিন রাস্তায় নেমে পাগলের মতো প্রলাপ বকেছি এবং রাস্তার মানুষকে থামিয়ে থামিয়ে বলেছি, আচ্ছা ভাই, বলুনতো আমি সুন্দরী না! আমার জীবনটা ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেছে। শেষবারের মতো আবার আমি এশার কাছে আমার স্বামীটাকে ভিক্ষা চাই। এশা! তোমার সম্পদ-বিত্ত সবই আছে।

আছে ফ্লাটবাড়ি। কিন্তু দেখ, আমার কিছুই নেই। স্বামী হারালে দুটি সন্তান নিয়ে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো?

এই হলো সাথীর দেয়া নিজের সাক্ষাতকার। **এবার ঘটনা বিশ্লেষণে আসুন :**

পরিচয় থেকে প্রেমালাপ এবং শেষে গভীর প্রেম। দুজন দুজনকে দেখার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা। দেখা করার স্পট শাহবাগ। কথামতো দুজন দুজনকে দেখা। ভালোবাসার মানুষ আরিফ তথা শামসুজ্জামান বাক্কুকে দেখে প্রথমে হকচকিয়ে যান সাথী। চেহারা ও বয়স তাকে মর্মাহত করে। তবু ভালোবাসার মর্যাদা দিতে গিয়ে তিনি তার সম্পর্ক অটুট রাখার ঘোষণা দেন। প্রথম সাক্ষাতে আরেকটি বিষয় জানতে পারেন সাথী, শামসুজ্জামান বিবাহিত। ঘরে তার জ্বলজ্যান্ত স্ত্রী ও ছেলেসন্তান আছে। আরও মর্মাহত হন সাথী। ভালোবাসার তাগিদে এটাও মেনে নিতে হয় তাকে। তাছাড়া সাথী সুন্দরী হলেও তিনিও আগে অন্যের ঘর করে এসেছেন। তাই এবিষয়টাও মাথায় থাকে তার এবং একারণে সতীনের ঘর করতে রাজি হতে হয় তাকে।

এভাবে বেশ কিছুদিন গড়াবার পর শামসুজ্জামানকে বিয়ে করেন সাথী। মুখোমুখি হন এক তিক্ত অভিজ্ঞতার। প্রথম স্ত্রী তাকে নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত করে। এটাও মেনে নেন সাথী। মোটকথা, নতুন সংসার আর ভাঙতে চান না বলে সব অপ্রিয়তাকে মাথা পেতে বরণ করে নেন তিনি। অনেক যুদ্ধ-সংগ্রাম করে এগিয়ে নিয়ে যান সংসার। এরই মধ্যে মতিগতি পরিবর্তন হয়

শামসুজ্জামানের। প্রথম স্ত্রীর যোগসাজশে একবার সাথীকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেন। কোনো মতে সেবার বেঁচে যান সাথী। এভাবে আরও অনেকবার মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হয়। কিন্তু প্রতিবারই তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছেন।

সাথী বাস করতেন আদাবরে। প্রথম স্ত্রী ও তার ছেলে-সন্তান থাকায় সংসার চালাতে বেগ পেতে হয় শামসুজ্জামান বাক্কুকে। সাথী এখানে জোর খাটাতে পারেন না। কেননা, একে তো স্বামীর দ্বিতীয় ঘর, তারপর আবার তিনি নিজেও স্বামীফেরত। তাই সংসারে গতি আনতে এবং নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে উদ্যোগী হন। আদাবরে শ্রাবণী বিউটি পার্লার নামে একটি বিউটি পার্লার শুরু করেন। নিজেই ছিলেন বিউটিশিয়ান। নিজ পার্লার আর নিজেই পরিচালনায় বেশ ভালোই চলছিল পার্লার। পার্লারসূত্রেই পরিচয় ঘটে এশার সঙ্গে। এশা পার্লারে আসত সাজুগুজো করার জন্য। এই সূত্রে সাথীর সঙ্গে পরিচয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। তাদের বন্ধুত্ব বেশ জমে ওঠে এক সময়। এশা ধনাঢ্য স্বামীর স্ত্রী। হাত ভরে টাকা থাকত তার। সাথী মাঝেমধ্যে তার দ্বারা উপকৃত হতেন। বিশেষ করে সাথীর স্বামী যখন তেজগাঁওয়ে জামান প্লাষ্টিক কারখানা স্থাপন করে তখন এশার বেশি স্বরণাপন্ন হন তিনি। তার কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা এনে স্বামীর হাতে তুলে দেন সাথী। আর এ সময়েই সাথীর স্বামী সম্পর্কে ধারণা পান এশা। সাথী এশার কাছে তার স্বামীর খুব প্রশংসা করতেন। তার পৌরুষের কথা চিবিয়ে বর্ণনা করতেন।

এতে এশার মন হাহাকার করে ওঠে। কারণ, সাথীর বর্ণনা অনুযায়ী এশার স্বামী তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারতেন না। এখানেই মারাত্মক ভুলটা করেন সাথী। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا-

কোনও নারী যেন কোনও নারীর সঙ্গে একসঙ্গে শয়ন না করে অতপর এমনভাবে স্বামীর কাছে অপরজনের বিবরণ না দেয়, যেন স্বামী তাকে স্বচক্ষে দেখছে। [তিরমিযী : ২৭৯২]

এই হাদীসে অন্যের কাছে নিজ স্বামীর বিবরণ কিংবা কোনও পুরুষের কাছে নিজ স্ত্রীর বিবরণ দিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা নারী পুরুষের সম্ভ্রম রক্ষার নিরাপদ পরামর্শ। কিন্তু এখানে ভুল করেছিলেন সাথী। বান্ধবী এশার কাছে তিনি মন খুলে স্বামীর বিবরণ দিয়েছিলেন, স্বামীর পৌরুষের কথা রঙ চড়িয়ে বয়ান করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এশার নারীমন তখন পরপুরুষের জন্য হাহাকার করে উঠত। এই দুর্বলতার সুযোগে হয়ত নিজের অজান্তেই তিনি শামসুজ্জামানের প্রতি দুর্বল হতে থাকেন।

হাদীসে নিজ স্বামী কিংবা নিজ স্ত্রীকে নিরাপদ রাখার যে পন্থা বাতলে দেয়া হয়েছিল, তাতে কমতি করায় সূচনা ঘটে এশা, সাথী ও আরিফের পতনের। কারণ, সাথীর বর্ণনা অনুযায়ী আরিফ মোটেও সুদর্শন কোনও ব্যক্তি নয়। তাছাড়া বয়সটাও তো কম হলো না। তাই তার প্রতি এশার দুর্বল হওয়ার মূল কারণ তার

স্বামীর ফিজিক্যালি সমস্যা। যে সমস্যার দৃশ্যপট এশাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সাথী নিজে। আর এশাও এখানে শরীয়ত ও দেশীয় আইনের লঙ্ঘন করেছেন। কারণ, বাংলাদেশের নিকাহ রেজিস্ট্রি আইনের ১৮ নং ধারায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনও স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম হলে সে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে। শর'ঈ বিধানও এরূপ।

একবার রিফাআ নামক এক সাহাবীর স্ত্রী স্বামীর অক্ষমতার অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাকে এই অক্ষম স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুমতি দিলেন। তবে সেই সঙ্গে একথাও বললেন যে, তুমি তোমার এই স্বামীকে বর্তমান রেখে তা করতে পারবে না। অর্থাৎ একজনের ঘাড়ে থেকে অন্যজনের মাধ্যমে কামনা পূরণ করার সুযোগ নেই। নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রথম স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তবেই পরবর্তী কোনও স্বামীর কাছে যাওয়া যাবে। কিন্তু এশা-সাথীদের বেলায় শরীয়তের এসব মৌলিক বিধানগুলো পালিত হয়নি বলে দুঃখ ও পতন নেমে এসেছে পদে-পদে। পরকীয়া সাধন পূরণ করতে গিয়ে এশা হত্যা করেছেন পাঁচ বছরের নিষ্পাপ সন্তানটিকে। তার অপরাধ একটাই। সে আরিফের সঙ্গে মা এশাকে অপ্রীতিকর অবস্থায় দেখে ফেলেছিল! এশা কথাটা আরিফ ওরফে বাক্কুকে বারবার বলতও। সে বলত, আমাদের জন্য সামিউল হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে! তাকে দুনিয়া...

যেই ভাবা সেই কাজ। মায়ের অবৈধ প্রেম বৈধ সন্তান সামিউলকে পাঠিয়ে দিল এমন এক জগতে, যেখান থেকে সে আর মায়ের অবৈধ প্রণয়ের রাজসাক্ষী হয়ে তাদের বিঘ্ন ঘটাবে না কোনোদিন। মা থাকবেন না সন্তানকে নিয়ে শঙ্কিত। সামিউলের সবচেয়ে বড় দুঃখটা বোধ হয় জন্মদিনে ছোট্ট সাইকেলটা না পাওয়া! একটি শিশুর কাছে খেলনার বস্তুর চেয়ে প্রিয় আর কী হতে পারে!

বধূর জন্য লড়াই

বহু বছর আগে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের একটা ঘটনা পড়েছিলাম। পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গলের নির্জনতায় সভ্যতার আলো না পড়লেও এক হিন্দু গৃহস্থ্যের ঘরে সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ক্যামেরার আলো এবং সাংবাদিকের পা পড়েছিল ঠিকই। শকুন যেমন চারশো ক্রোশ দূর থেকেও মড়া দেখতে পায়, ঠিক তেমনি ওই সাংবাদিক বন-জঙ্গলের নির্জনতার অন্ধকারে খুঁজে বের করেছিলেন অন্ধকার জগতের আরেক গল্প। এই গল্প আমাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। বিবেককে করেছিল বিকল। হয়ত আমার বাড়াবাড়ি এটা। সামান্য ঘটনাকে বড় করে দেখার বাতিক রোগ। এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে প্রকাশ করার 'নিরুদ্দেশ' চেষ্টা। পাঠক! অন্তত এই ঘটনাটিকে আপনি এই দৃষ্টিতে দেখবেন না। বরং ঘটনাবিশ্লেষণে আপনিও শরীক হন আমার সঙ্গে।

মেঘালয় রাজ্য। পাহাড়-পর্বতের নির্জনতায় শিক্ষাহীন, আলোহীন, সভ্যতাহীন এক হিন্দু পরিবার। সংসারে গৃহকর্তা দুইজন আর গৃহকর্ত্রী একজন। গৃহকর্তা দুইজন হলেন সহোদর ভাই! তাদের পরিচয় এখানেই শেষ নয়, তারা আবার ওই গৃহকর্ত্রীর স্বামীও বটে! অর্থাৎ এক নারীর দুই স্বামী, সম্পর্কে যারা পরস্পরে সহোদরা!

পুরুষের ঔরস বিভক্ত হয়ে একাধিক নারীর গর্ভে প্রতিস্থাপন হতে পারে। তাই তারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে এবং তা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু একজন নারী কি পারে তার গর্ভকে বিভক্ত করতে? একেকজনের জন্য আলাদা আলাদা গর্ভ বানাতে? পারে না। তাই সঙ্গত কারণেই তারা পারে না একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে। পারে না একাধিক স্বামীর ঔরস নিয়ে নিজের গর্ভকে কলঙ্কিত করতে। এসব কল্পনা আমাদের মনে ঘেন্না সৃষ্টি করে। তা ভাবতে গেলে আমাদের রুচি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ওই দুই ভাই, দুই স্বামী এবং দুই স্বামীর এক স্ত্রীর এ নিয়ে কোনও ঘেন্না নেই। ধর্মীয় শিথীলতা আর জ্ঞান ও সভ্যতার আলোস্বল্পতা তাদের মন থেকে হয়ত এই মর্যাদাবোধ উঠিয়ে দিয়েছে। অতএব তাদের নিয়ে লেখালেখির প্রয়োজনয়ীতা বড় স্বল্প!

কিন্তু আঁধারের অসভ্যতার যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে, অন্ধকারের ঘটনার পুনর্জনম হয়, সভ্যতাকে কলঙ্কিত করা এধরনের কোনও ঘটনা ঘটে চোখের সামনে, তাহলে কি আর নিশ্চুপ থাকা যায়? তাই মেঘালয় রাজ্য ছেড়ে এবার আমাদের আলোর সভ্যতার মুসলিমদের বিবর্ণ সমাজের ঘটনা শুনুন : 'বউ ফিরে পেতে দুই প্রবাসীর লড়াই' শিরোনামে একটি সংবাদ ছেপেছে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা। **ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ :**

হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানার আউশকান্দি ইউনিয়নের দরবেশ গ্রামের লুৎফা বেগম। মনভরে ভালোবাসেন পাশের মিনহাজপুর গ্রামের নজরুল ইসলাম ওরফে ইয়াফিসকে। লুৎফার ভালোবাসায়

কোনও কমতি নেই। কিন্তু ইয়াফিসের ভালোবাসায় আছে প্রতারণা। তিনি তার বিবাহিত পরিচয় লুকিয়ে রেখে গভীর প্রেম চালিয়ে যান লুৎফার সঙ্গে। সরল লুৎফা প্রেমদরিয়ায় হাবুডুবু খাওয়ায় ভালোবাসার মানুষের আসল পরিচয়ের কিনারা খুঁজে পান নি। পরে অবশ্য ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়, ইয়াফিসের আসল পরিচয় বেরিয়ে আসে। কিন্তু লুৎফা অনড়। যে করেই হোক ইয়াফিসকেই তাকে চাই। পরিবারের বাধা-আপত্তি কোন ছাই! তার জেদ আর ভালোবাসার জয় হলো।

২০০৯ইং সালের ২৪ই মার্চ ভালোবাসার গলায় বিজয়ের মালা পরিয়ে সতীনের ঘর করতে গেলেন তিনি। পরিবারের সম্মতি অস্বীকার করে প্রেমিকযুগল পালিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লস্করপুর ইউনিয়নের কটিয়াদি বাজারের কাজি অফিসে তাদের বিয়ে হয়। **মোহরানা নির্ধারণ করা হয় দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আইনি ঝামেলা এড়াতে তারা একই তারিখে হবিগঞ্জ নোটারী পাবলিকে এফিডেভিট করেন। ইয়াফিসের পরিবার বিয়েটি মেনে নিলেও লুৎফার পরিবার তা মেনে নেয়** নি। তাই তার পরিবারের লোকদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয় ক্ষোভের ছাইচাপা আগুন। মা-বাবার দু‘আ-আশির্বাদহীন এই বিয়ের পরও বেশ সুখেই কাটছিল তাদের সংসার। তবে এর কিছুদিন পর ইয়াফিস আমেরিকায় চলে যান।

এবার পরিবারের লোকদের ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। তারা লুৎফাকে বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য চাপ দিতে থাকে। একই সঙ্গে

তারা ভুয়া নিবন্ধন কার্ড সংগ্রহ করে জোর করে ২ নভেম্বর ২০১০ইং লুৎফাকে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার কদমহাটা গ্রামের মৃত মকসুদ আলীর ছেলে যুক্তরাজ্য প্রবাসী সৈয়দ আফজাল হোসেনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে এই অবৈধ বিয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই বিয়ে এজন্য অবৈধ যে, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ তাদের নিজের পছন্দে বিয়ে করলে সামাজিক দৃষ্টিতে তা যত বড়ই অপরাধ এবং শরীয়তের নৈতিক দৃষ্টিতে দূষণীয় হোক না কেন- সেই বিয়ে সিদ্ধ ধরা হয়। এই বিয়ের মধ্যে অন্য কোনও বিয়ে বাঁধালে তা হবে অবৈধ ও নাজায়েয। এই বিয়ের মিলন হবে ব্যভিচার-যেনা। তো এই ব্যভিচারী বিয়ের কথাটা লুকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয় লুৎফার পরিবার। এলাকায় জানাজানি হয়ে যায় তা। শুরু হয় আসল স্বামী এবং নতুন অবৈধ স্বামীর মধ্যে বউ পাওয়ার লড়াই। আইনী লড়াইয়ের মাঠে নামতে চাচ্ছেন নজরুল ইসলাম ওরফে ইয়াফিস। কম যাচ্ছেন না নতুন স্বামী আফজাল হোসেনও। এই অপ্রিয় লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত যারই জয় হোক না কেন, আমাদের সামাজিকতা আর নৈতিকতার পরাজয় কিন্তু অবধারিত। আর জয় ইসলাম ও ইসলামের আদর্শের। ইসলামী আদর্শ ও নৈতিকার আশ্রয়ে থাকলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লুৎফা, নজরুল ও আফজাল কাউকেই এমন নোংরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হতো না।

আমাদেরও স্মরণ হতো না মেঘালয় রাজ্যের সেই অপ্রিয় কড়চা কথা।

সংযত বিয়ে নিরাপদ জীবন

মানবজাতির অপরিহার্য একটি সামাজিক আচার হচ্ছে বিয়ে। বিয়ের মাধ্যমে সমাজ-সংসার টিকে থাকে। বংশপরম্পরা অব্যহত থাকে। তাই মানবীয় এই প্রয়োজনটাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখে থাকে। বিয়েকে প্রয়োজন ও বাস্তবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে অনাড়ম্বরভাবে তা সম্পাদনের আদেশ দেয় ইসলাম এবং এধরনের বিয়েই পরবর্তীতে সুখ-সমৃদ্ধি বয়ে আনে বলে ঘোষণা দিয়েছে ইসলাম। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

«أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهَا مَئُونَةً»

‘সেই বিয়ে অধিক বরকতপূর্ণ, যা আড়ম্বরমুক্ত।’ [মুসনাদ আহমদ : ২৪৫২৯]

কিন্তু আফসোসের কথা হচ্ছে, মুসলিম জাতি আজ এই আদর্শ থেকে অনেক দূরে। বিয়েকে কেন্দ্র করে আজ যে পরিমাণ বেপর্দা আর অশ্লীলতার প্রদর্শনী হচ্ছে, তার মারাত্মক খারাপ প্রভাব পড়ছে আমাদের অন্যান্য সামাজিক জীবনে। বিয়ের সঙ্গে নানা ধরনের পাপ জড়িয়ে পড়ার কারণে বিয়ের কাঙ্ক্ষিত বরকত ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না। বরং সুফল পাওয়ার বদলায় এর কুফল প্রত্যক্ষ করছি নানাভাবে, নানা সময়ে। বিয়ের মধ্যে নানা অনাচারের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক হচ্ছে বেপর্দার চর্চা। বেপর্দার

একটি বিয়ে কী পরিমাণ অশুভ পরিণতি ডেকে আনতে পারে তার ছোট্র একটি উদাহরণ নিন।

শায়লা (ছদ্মনাম) সদ্য কৈশোর পেরিয়ে আসা যৌবনের কাঠি স্পর্শ করতে যাওয়া এক নারী। এ সময়টাতে এ ধরনের নারীদের বিপদ পদে-পদে। সম্ভ্রমখেকো শকুনরা ডালে-ডালে বসে আছে সম্ভ্রম লুণ্ঠনের মরা গরুর আশায়। উঠতি বয়সী এসব নারী তাদের প্রথম টার্গেট। তাই এই নারীদের চলতে হবে অতি সন্তর্পণে, সংযত পদক্ষেপে। কিন্তু পর্দাহীন মুক্তবাসিনী নারীকে যেমনিভাবে আল্লাহর বিধান পালনের ব্যাপারে উদাসীন করে তুলেছে, তেমনিভাবে নিজের মর্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষার তাগিদটুকুও ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই নারী কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে এবং এই যাওয়ার পরিণাম কী হবে- এসব আজ ভাবনার বিষয়ের মর্যাদা হারিয়েছে। আর এ কারণেই নারী-অলংকারটুকু আজ রক্ষিত থাকে নি। হাট-বাজারে, দোকান-মার্কেটে তা আজ বিকিকিনি হচ্ছে হাজারো মানুষের সামনে, সস্তা দরে!

তো শায়লার কথায় আসুন। ষোল বছরের মেয়ে শায়লা। আত্মীয়ের বিয়েতে ধুম পড়েছে। তাকেও সেখানে যেতে হবে। বোরকা, পর্দা এসব কী বিয়ের মতো মহাযজ্ঞে মানায়! তাই সে বোরকা-পর্দার কোনও তোয়াক্কা করল না। শত যুবক আর তরুণের সঙ্গে সেও মিশে গেল আনন্দযাত্রায়। এই আনন্দযাত্রায় ছিলেন একজন 'প্রবীণ' মুসাফিরও। বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে একচল্লিশে। ঘরে বধূ আছে। আছে ছেলেসন্তান সবই। কিন্তু যা

নেই তাহলো, আল্লাহর বিধানের প্রতি মর্যাদাবোধ, পর্দার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। তাই তিনি মুক্তবাসিনী শায়লার রূপে মুগ্ধ হলেন। এক বুড়ো প্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তিনি।

শায়লা কিন্তু এসবের কিছুই জানত না। একজন বুড়ো লোক তার প্রেমে পড়বে আর সে সেই প্রেমে সাড়া দেবে এমন কোনও কথা সাজে না শায়লার মতো একজন ষোড়শী যুবতীর বেলায়।

কিন্তু ওদিকে ঠিকই মরিয়া হয়ে উঠলেন সেই বৃদ্ধ। শায়লাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার জন্য যারপর নাই তদবিরে লেগে গেলেন তিনি। তবে কেউ তাকে সায় দিল না। হাসলো শুধু সবাই। 'বুড়োর ভীমরতি' বলেও বিদ্রূপ করল কেউ-কেউ। শায়লার অভিভাবকদের বলেও বুড়ো কোনও ফলাফল পেলেন না। সব পথে হেঁটেও কোনও পথ না পেয়ে তিনি হতাশ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। হাতে তুলে নিলেন নারী জাতির সবচে' আতংকের বস্তু এসিড নামের তরল আযরাঈলকে। স্ত্রী করে পাওয়ার কল্পনার মেয়েটি এবার বুড়োর অন্য লক্ষবস্তুতে পরিণত হলো। তিনি ওঁৎ পেতে থাকলেন। সুযোগ বুঝে নিক্ষেপ করলেন ষোড়শী শায়লার মুখে সেই দাহ্যপদার্থ। মুহূর্তের ব্যাপার। কয়েকটিমাত্র ক্ষণে নিঃশেষ ও ধ্বংস হয়ে গেল শায়লার সব স্বপ্ন, সব আশা। একটি ভুল, আল্লাহর একটি বিধান লঙ্ঘন মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল আশার একটি সুউচ্চ মিনারকে।

এ ধরনের আশার মিনার আর যেন ধ্বংস ও চূর্ণিত না হয়, সে জন্য এখনই সবাইকে পর্দার প্রাচীরে আশ্রয় নেয়া কাম্য। সম্ভ্রম তো একটাই। তাই তা রক্ষায় পর্দার বিধান চাই।

পর্দাঘেরা প্রতিবেশী : নিরাপদ জীবন

সৎ প্রতিবেশী হওয়া, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছে ইসলাম। আর একজন প্রতিবেশীর সবচেয়ে গুরুদায়িত্ব হচ্ছে অপর প্রতিবেশীর সম্ভ্রম রক্ষা করা। তাই প্রতিবেশী কোনও নারীর সম্ভ্রমহানী করাকে ইসলাম ক্ষমার অযোগ্য মারাত্মক অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো :

اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ ؟ فَذَكَرَ فِيْهِ الزِّنَا بِحَلِيْلَةِ الْجَارِ-

'কোন গুনাহ সবচেয়ে জঘন্য? তিনি উত্তর করলেন, প্রতিবেশির নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা।' [বুখারী : ৪৪৭৭]

অন্য আরেক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে : মেকদাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ-

'একজন সাধারণ নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করার চেয়ে প্রতিবেশী নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা দশগুণ বড় অপরাধ।' [মুসনাদ আহমাদ : ২৩৮৫৪]

কিন্তু একটি সমাজ থেকে যখন ইসলামের আলো সরে যায়, বেপর্দা ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তখন সেই সমাজে এধরনের অপরাধ অস্বাভাবিক কোনও ব্যাপার থাকে না। বেগম রোকেয়া যে সময় 'অবরোধবাসিনী' বইটি লিখেছিলেন,

তখন হয়ত সমাজে পর্দা পালনের কড়াকড়ির একটি চিত্রই দেখেছিলেন। সমাজের অপর পিঠ তিনি দেখার চেষ্টা করেন নি। পর্দার অপর পিঠ তথা বেপর্দা, উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচারের ক্ষতবিক্ষত যে পিঠটা আছে, তা তিনি দেখেন নি বা দেখার গরজ বোধ করেন নি। বেপর্দা নারীর সম্ভ্রম কোথায় নিয়ে যায়, আজকের ঘটনাবালীর দুয়েকটি যদি তিনি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করতেন, তাহলে হয়ত তার ভুল ভাঙত। কলমের নিব তিনি উল্টো পথে ধরতে বাধ্য হতেন। যাহোক, নিচের ঘটনাটি পড়ুন :

'আমার বিটির ইজ্জত লিয়ে ললি চিপি ধরি মুখে বিষ ঢালি দি মারচে। পুলিশেক আমরা কইচি। কিন্তু পুলিশেরা আমারে কতাই লেয় না। আরো ধমক দেয়। পুলিশ কইচে ওগুলি বিষের দাগ। এখন আনোয়ার হুমকি দিচ্চে। কাইচে, একজন গেছে আবার আরেকজনকে খুন করব।'

কথাগুলো একজন সন্তানহারা মায়ের, যিনি বেপর্দা জীবনের এক করুণ পরিণতির স্বীকার হওয়া মেয়ের মা। কাঁদতে-কাঁদতে এভাবেই আর্তি জানালেন নাটোরের লালপুর ভবানীপুর গ্রামের নিহত গৃহবধূ রিতার মা হিরা বেগম। গত ২রা সেপ্টেম্বর একই গ্রামের প্রভাবশালী আনোয়ার হোসেন ও তার সঙ্গীরা রিতাকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে পাশের আখ ক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে শেষে গলা টিপে ধরে। এরপর জোর করে বিষ পান করিয়ে হত্যা করে।

ভবানীপুর গ্রামে গিয়ে দেখা যায় ছনের বেড়া আর টিনের ছাপড়ার বাড়িতে মা আবিলা বেগম ও বাবা মহির উদ্দিনের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করতেন ছেলে কাবিল উদ্দিন ও ছেলের বউ রিতা বেগম। আবিলা বেগম বলেন, সংসার সুখের হবে এই আশায় একই গ্রামের হিরা বেগমের মেয়ে রিতা বেগমের সঙ্গে কাবিলের বিয়ে হয়। কিন্তু গরীবের ঘরের সুন্দরী বউয়ের ওপর লালসাভরা চোখ পড়ে প্রতিবেশী ধনাঢ্য কৃষক আকবর আলী মিস্ত্রির ছেলে আনোয়ারের। সে প্রায় সময় গৃহবধূ রিতাকে কুপ্রস্তাব দিত। গত ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর আনোয়ারের মামা সাজদার হোসেন কাবিলকে পাশের হাজীরহাট বাজারে নিয়ে যায়। রাত ৯টার দিকে বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েন। বাড়ির লোকজন ঘুমের সমুদ্রে ঢলে পড়ার পর সুযোগ কাজে লাগাতে দেরি করে না আনোয়ার।

আনোয়ার কিভাবে কী করে সর্বনাশা পদক্ষেপ নিয়েছিল তা জানা যায় নি। তবে হঠাৎ রিতার একটি ‘মা’ ডাক সবাইকে স্তম্ভিত করে দেয়। কল্যাণকামী মা একটিমাত্র ডাকে বিছানা ছেড়ে ধড়ফড় করে উঠে পড়েন। দৌড়ে যান রিতার ঘরের দিকে। কিন্তু ঘরের দরজা বাইরে থেকে শিকল দেয়া। মা হিরা বেগম তখন রিতাকে ডাকতে থাকেন। কিন্তু কোনও জবাব না পেয়ে কেঁদে ওঠে মা-সত্তা। তিনি চিৎকার করে ওঠেন। পরে বাড়ির একশ গজ দূরে আখক্ষেতের মধ্যে রিতাকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মৃত্যুপথযাত্রী রিতা কয়েকটিমাত্র কথা বলার সুযোগ পান। তিনি মাকে জানান,

'আনোয়ারসহ কয়েকজন লোক ধর্ষণ করে আমাকে জোর করে বিষ খাইয়ে দেয়। মা আমাকে বাঁচাও।' কথাগুলো বলার পর থেমে যায় রিতার কণ্ঠ। উদ্বিগ্ন মা রিতাকে বনপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর রিতা সেখানেই মারা যান।

রিতা জীবনের পাঠ চুকিয়ে এই সমাজের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা আর অধঃপতনের চরম অবস্থার অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে গেলেন। একজন মানুষ কত পাষাণ হলে, পর্দা ও নৈতিকতার পরিবেশ কতটা খারাপ হলে একজন সতী নারীর পিছু নিয়ে এভাবে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার সম্ভ্রম লুট করে শেষে জীবনটা পর্যন্ত কেড়ে নিতে পারে? আমরা তো সমাজ-সংসারের স্বার্থে বিভিন্ন রকমের হিসাব করে থাকি। দিনের হিসাব, সপ্তাহের হিসাব, মাসের হিসাব এবং বছরের হিসাব। বছর শেষে ব্যবসায়ীরা করে হালখাতা। কিন্তু আমরা কি কখনও আমাদের পরকালীন জীবন ও নৈতিকতার পরিসংখ্যান জানতে হিসাব কষেছি? একটি সমাজের চিত্র পাল্টে দেয়ার জন্য যথাযথ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি? যদি তা না করি এবং আমরা যদি এভাবে অনুভূতিহীন হয়ে যাই, তাহলে আমাদের পতন যে খুবই সন্নিকটে, তাতে সন্দেহ নেই। [সূত্র : দৈনিক কালেরকণ্ঠ ৫/১২/২০১০ ইং]

প্রেমশূন্য প্রেম

প্রেম মানে ভালোবাসা, স্নেহ, প্রীতি- এই সব। যার মধ্যে প্রেম থাকবে, তার মধ্যে ভালোবাসা, স্নেহ, প্রীতি সবই থাকবে এটাই বাস্তব সত্য। কিন্তু কৃত্রিমতার আঁধারে ঢেকে গেছে মানুষের স্বভাবজাত সব আলো। প্রতিটি মানুষের অন্তর যেন আজ প্রেম-প্রীতিহীন এক শুষ্ক মরুভূমি। আছে কেবলই লৌকিকতা, কৃত্রিমতা। এই লৌকিকতা আর কৃত্রিমতা ছাপিয়ে উছলে ওঠে প্রেম ও পরকীয়ার জোয়ার। এই দুটি বস্তু মনুষ্যত্বটাকে বিপুলভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে একথা অস্বীকার করার জো নেই। প্রেম ও পরকীয়া- যা বেপর্দা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতিফল- আজ আমাদেরকে এমন অভিজ্ঞতার আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, যাতে নিজেদের চেহারাকে আমরা মানুষ বলে মনে করতেও ভয় পাই! পড়ুন নিচের ঘটনাটি :

রাজধানীর মোহাম্মাদপুরে শিশু সামিউল হত্যার মতো এবার সাড়ে তিন বছরের শিশু তানহা মায়ের পরকীয়ার বলি হয়েছে। মা তমা ও তার প্রেমিকা রাজু তাকে হত্যা করে ফ্লাটের কার্নিশে ফেলে দেয়। তানহার কচি শরীর পঁচে দুর্গন্ধ ছড়ালে ফ্লাটবাসী তার লাশ খুঁজে পায়। ঘাতক মা পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তানহার বাবা ফারুক গাজী বাদী হয়ে মামলা করেছেন।

জেনিফার ইসলাম তানহার বাবা মুদি ব্যবসায়ী ফারুক গাজী জানিয়েছেন, রেজাউল করিম রেজার সঙ্গে তার স্ত্রী হালিমা

ইয়াসমিন তমার (২৭) অনৈতিক সম্পর্কের কথা। মিরপুরে তার বাসার সামনেই থাকত রাজু। সান্নিধ্যের সুবাধে দুজনের মধ্যে বোঝাপরা। এনিয়ে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে বকাঝকা করতেন। গত ২৭ই জুলাই স্ত্রী তমা তার সাড়ে তিন বছরের সন্তান তানহাকে নিয়ে উধাও হয়ে যান। স্বামী ফারুক স্ত্রী ও কন্যাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের সন্ধান করতে পারেন নি।

এদিকে তমা স্বামীর পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করে পঙ্কিলতার সাগরে গা ভাসিয়ে দেয়। অবৈধ বিছানায় শয্যাসঙ্গী হয় প্রেমিক রাজুর। সে খিলগাঁওয়ের সিপাহীবাগে রাজুর ভাড়া করা ফ্লাটে আশ্রয় নেয়। রাজু অবৈধ সম্পর্ক বাঁচাতে অবৈধ পরিচয়ের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তমাকে বোন পরিচয় দিয়ে ফ্লাটটি ভাড়া নেয় সে। এই পরিচয়েই রাজু-তমা সেখানে বসবাস করছিল।

ফ্লাটবাসীসহ অন্যরা জানতেন, তমার স্বামী মতিঝিলে চাকুরী করে, রাজু তার ভাই। কিন্তু মূল ঘটনার সূত্রপাত হয় ২রা আগস্ট সোমবারে। বাসার কেয়ারটেকার বসির মিস্ত্রিকে নিয়ে ফ্লাটে কাজ করতে গেলে উৎকট দুর্গন্ধ আসে। দুর্গন্ধের কারণ জানতে চাইলে মা তমা চরম মাতৃত্ব অবমাননার আশ্রয় নেন। নিজের কলজে ছেঁড়াধন, গর্ভের রত্ন, সাড়ে তিন বছরের নিষ্পাপ কন্যা তানহাকে তিনি ইঁদুরের পরিচয় দেন। ইঁদুর মরে গন্ধ ছড়াচ্ছে বলে তিনি কেয়ারটেকারকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন!

কিন্তু মাতৃমনের এই নির্দয় ভাষ্য মেনে নিতে কষ্ট হয় কেয়ারটেকারের। আড়চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সে তাকায় তমার

দিকে। তার এই সন্দেহের চাহনী ধরতে কষ্ট হয় না তমার। তাই রাতে ব্যাগ ও সামানপত্র নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু ফ্লাটের লোকদের কৌশলের কাছে হেরে গিয়ে তিনি পালাতে ব্যর্থ হন। ফ্লাটের অন্যান্য লোকজন কলাপসিবল গেটে তালা ঝুলিয়ে তাকে আটকে দেয়।

এর পরের দিন মঙ্গলবার কেয়ারটেকার বসিরসহ অন্যরা ফ্লাটে তল্লাশী চালায়। একপর্যায়ে রান্নাঘরের পাশের জানালার কার্নিশে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখে তারা। এতো অন্য কিছু নয়, পরকীয়ার বিষাক্ত ছোবলে জর্জরিত একটি নিষ্পাপ শিশুর পঁচা-গলা লাশ! কিন্তু এখানেও নিষ্ঠুর অভিনয় করেন মা তমা। তিনি মিথ্যা গল্প ফাঁদেন এবং বলেন, হাঁস এনেছিল, ওই হাঁস মরে যাওয়ায় জানালা দিয়ে তা ফেলে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু একটি নিষ্পাপ শিশুরও তো অভিশাপ আছে। এই অভিশাপ থেকে বাঁচার সাধ্য কার? তাই মায়ের মিথ্যাচারিতা ও প্রতারণা ধরিয়ে দেয় অন্য জগতের বাসিন্দা শিশু তানহা। কেন যেন নিজের মৃত্যু উপস্থিতিটা তানহা জানিয়ে দেয় নিজের দেহের দুর্গন্ধ দিয়ে। যার মা তাকে ইঁদুর বানিয়েছে, মরা পঁচা-হাঁস বানিয়েছে সে তো এতটুকু প্রতিবাদ করবেই। তাই তার ‘অব্যক্ত প্রতিবাদে’ ফেঁসে যান মা তমা। লোকজন কার্নিশে তানহার ঝুলন্ত লাশ দেখে তমাকে আটক করে।

যে প্রেমিকের সাধ পূরণের জন্য তমার এই নিষ্ঠুর অভিসারযাত্রা, বিপদের সময় সেই প্রেমিক পলাতক। তমাকে বিপদে পড়তে

দেখে রাজু গা ঢাকা দিয়েছে। হবে তো তা-ই। যে সম্পর্কের ভিত্তি এই পঙ্কিল-কাদা, সে সম্পর্কের অস্তিত্ব তো এমন দুর্বল হবেই!
বাবার কাছে যথা সময়ে পৌঁছে কন্যার এই করুণ পরিণতির সংবাদ। তিনি ছুটে আসেন কন্যার গলিত লাশের 'সমাধিপাড়ে'। কান্নায় হাউমাউ করে ওঠেন তিনি, কন্যাবিয়োগে পিতৃস্নেহে ভেঙে খান-খান হয়ে যায় তার কোমল হৃদয়। সন্তানহারা বাবা নিজেই স্ত্রীর পরকীয়া ও নানা অপকর্মের কথা প্রকাশ করেন পুলিশের সামনে। তিনি জানান-
পাঁচ বছর আগে তমাকে বিয়ে করেন ফারুক। সম্ভবত বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই আল্লাহপ্রদত্ত হালাল উপভোগ্যতার পরিবর্তে হারাম আস্বাদনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন তমা। এপথে তার যোগ্য সহযোগী প্রেমিক রাজু। এসব পরকীয়া প্রেমিক সমাজের বোঝা, জাতির কলঙ্ক। এরাই সমাজটাকে গলিত করে তুলছে। স্ত্রীদেরকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে স্বামীর পবিত্র বন্ধন থেকে। কখনও করছে বাবাকে সন্তানহারা। কখনওবা মাকে কাঁদাচ্ছে সন্তানহারার যন্ত্রণায়। এদের ফাঁদে পা দিয়ে বহু নারী এবং বহু পুরুষ নিজ স্ত্রী বা নিজ স্বামীর বন্ধন ছিন্ন করে পাপের পথে নামছে। যে পথের যাত্রা বন্ধুর, অসংলগ্ন এবং পরিণাম অশুভ।
পাঠক! এই ঘটনা আপনার মনে কতটুকু দাগ কাটলো, তা জানি না। কিন্তু ঘটনার নির্মমতা এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। তমাও তার প্রেমিক রাজু মিলে তানহাকে হত্যা করার পর লাশের বিহিত করতে তৎপর হয়ে ওঠে। প্রেমসাগরের ভ্রান্ত নাবিকেরা

যথাযথ হাল ধরতে ব্যর্থ হয়। তারা জানালা দিয়ে লাশ ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রিলমিস্ত্রি কী আর জানতো যে, কোনোকালে জানালার এই সংক্ষিপ্ত ফোঁকর দিয়ে কোনও মা তার আপন সন্তানকে হত্যা করে লাশ ফেলে দেবে! যদি জানত, তাহলে হয়তবা ফোঁকরটা পরিমাণে বড় রাখত। বেকায়দায় পড়তে হত না তমা ও রাজুকে। কিন্তু গ্রিলমিস্ত্রির সেই অদূরদর্শিতা (!) কাল হলো মা তমা ও তার প্রেমিক রাজুর। কারণ, জানালা সেই ফাঁক দিয়ে লাশ বাইরে ফেলা গেল না। তবে দমলেন না তারা। গ্রিলমিস্ত্রি লোহার ওপর যে চর্চা করেনি, তমা-রাজু সেই চর্চা করল শিশু তানহার কচি দেহের ওপর। তানহার লাশের মাথার যতটুকু অংশ জানালার ফোঁকরে আটকে গেল ততটুকু অংশ বটি দিয়ে কেটে ফেললেন তারা! এরপর তাকে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন! এই হলো আমাদের সমাজ, দেশ, নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবস্থা! [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ৫ আগস্ট ২০১০ ইং বৃহস্পতিবার]

জনতার হাটে সম্ভ্রম বিক্রি

১০ই ডিসেম্বর ২০১০ ইং ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে ২৫ হাজার দর্শক মেতে উঠেছিল আনন্দমেলায়। অশ্লীল নৃত্য আর উলঙ্গ বেহায়াপনায়। সেদিন বলিউড কিং শাহরুখ খানের লাইভ শো 'কিং খান লাইভ ইন ঢাকা' অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের পঁচিশ হাজার দর্শককে মাতাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন শাহরুখ খান। তাকে সঙ্গ দেয় ভারত থেকে আসা সহশিল্পীরা। অনুষ্ঠানে পারফর্ম করে রানী মুখার্জী, অর্জুন রামপালসহ দলের অনেকেই।

একটি বিদেশী সংস্কৃতি নিয়ে ঢাকায় বেশ কিছুদিন মাতামাতি চলে। টিকিট বিক্রি, প্রচার-প্রসার, বিলবোর্ড স্থাপন, রেডিও টিভিতে শোরগোর, মোবাইল কোম্পানিগুলোর উপরি আয়- সব মিলে এক পাগলামো বখাটেপনা!

টিকিটের দাম ছিল সর্বনিম্ন ৩,০০০ এবং সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা। পঁচিশ হাজার দর্শক টিকিট বাবদ মোট কত টাকা বহন করেছে তা সহজেই অনুমানযোগ্য। গড় হিসেবে তা অর্ধশত কোটি টাকার কম নয়!

আয়োজকরা প্রথমে বলেছিলেন শাহরুখকে দেয়া হবে ৫৫ লাখ টাকা। হাস্যকর বটে। শাহরুখ যেখানে নিজ দেশেই পাঁচ-ছয় কোটি রুপির কমে কনসার্ট করেন না, সেখানে অন্য দেশে এসে সে দেশের টাকার হিসেবে মাত্র ৫৫ লাখ টাকায় কনসার্ট করবেন? একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুও মনে হয় তা বিশ্বাস করবে না।

তাই স্বভাবতই এনবিআরও তা বিশ্বাস করে নি। ফলে আটকে দেয়া হয় শাহরুখের আগমনযাত্রা। তার আসার কথা ছিল বৃহস্পতিবার। করের বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় কাস্টমসের পক্ষ থেকে ছাড়পত্র আটকে দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে দেনদরবার করতে-করতে অফিস সময় শেষ হয়ে যায়। এবার উপায়! উপায় সরকারী ঊর্দ্ধতন মহল। কিন্তু তারাও তখন সংসদে ব্যস্ত। ফলে আয়োজক কমিটি পড়ে মহা ফ্যাসাদে।

কিন্তু যে সমাজ পাপের জন্য চাতক পাখির মতো হা করে থাকে, সেই সমাজে এ ধরনের এক অনুষ্ঠান আটকে যাবে শুধু দেশের স্বার্থে! তা কী করে হয়? তাই আঁধারের চুক্তিতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পর্দার আড়ালে কত হিসেবরই তো ল্যাঠা চুকে যায়! এটার পরিণতিও যে সে রকম কিছু একটা হয়েছিল, তা অনুমান করতে বেশি জ্ঞান থাকার দরকার হয় না।

শাহরুখ আসেন তার বিশাল বাহিনী নিয়ে। পরের সংবাদে জানা যায়, এক শাহরুখ খানকেই দেয়া হয়েছিল ১৮ কোটি টাকা। তারপরেও এনবিআর তাতে সন্দেহ পোষণ করেছে। তাদের ধারণা, প্রকাশ্যে এই পরিমাণ টাকার কথা উল্লেখ করা হলেও মূল পরিমাণ আরও অনেক বেশি।

বাংলাদেশের এই সময়টাতে এমনিতেই ইভটিজিং মহামারীর আকার ধারণ করেছে। আদালতে পর্দা-বোরকার বিরুদ্ধে রায় দেয়ার পর থেকেই ব্যাপারটি আল্লাহর গযব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আর এর জ্বালানী সরবরাহ করছে অশ্লীল নাচগান,

মোবাইল ব্লু-ফিল্ম, বিভিন্ন রকমের অপসংস্কৃতি বিশেষ করে ভারতীয় স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো। এমন এক নাযুক মুহূর্তে ভারতীয় উদ্দাম সংস্কৃতি আমদানী করা হলো!

শাহরুখ খানের উপস্থিতিতে লোকে লোকারণ্য হয় আর্মি স্টেডিয়াম। কিং খানের ভক্তদের পদভারে স্টেডিয়ামের কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। অনুষ্ঠানে প্রভাবশালী এক প্রতিমন্ত্রীকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে চেয়ার খালি না থাকার কারণে! যারা সরাসরি অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারে নি, তারা ভিড় করে টিভির সামনে। বৈশাখী টিভির কল্যাণে (?) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও এই অপসংস্কৃতির নোংরা দৃশ্য দেখে চোখ কচলানোর সুযোগ পায়!

বিপুল আয়োজন, উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে যে অনুষ্ঠানে পঁচিশ হাজার দর্শক মস্তি করতে গিয়েছিলেন, নিশ্চয় তারা ইসলামী ভাবধারার কোনও সংস্কৃতিক চিন্তা লালন করেন না কিংবা তা নিয়ে ভাবারও সময় হয়ে ওঠে না তাদের। সে হিসেবে দর্শকরা অনুষ্ঠানের সব কিছুতে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের সৃষ্টিগত রুচি-আভিজাত্য বলে তো একটা ব্যাপার আছে! তাই অনুষ্ঠানের কিছুসংখ্যক রুচিশীল দর্শক সবকিছু সমর্থন করতে পারেন নি। বিশেষ করে সংক্ষিপ্ত পোশাকে প্রায়নগ্ন ভারতীয় ললনাদের উদ্বাহু নৃত্য আর ভারতীয় সংস্কৃতি তুলে ধরার নির্লজ্জ প্রচেষ্টা তারা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন নি।

কিং খানের গ্রান্ড শো নিয়ে দর্শকদের যত আগ্রহ ছিল, তা মিইয়ে গেছে নিমিষেই। এসব অনুষ্ঠানে অশ্লীলতা আর বেহায়াপনা ছাড়া আর কিছু পাওয়ার আশা থাকে না কারও, কিন্তু নতুনত্ব বা সৃজনশীল কিছু আশা করেন দর্শকরা। কিন্তু তা থেকেও বঞ্চিত হন তারা। স্যাটেলাইট চ্যানেলে হরহামেশা যা দেখে থাকেন তারা, সরাসরী অনুষ্ঠানে এসেও তারই খণ্ডচিত্র দেখতে হয় তাদের। আর যারা সপরিবারে অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিলেন, তাদেরকে লজ্জায় মাথা কুটতে হয়েছে। বিব্রত অসহায় হয়ে তাদেরকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে থাকতে হয়েছে। স্বল্পবসনা সহশিল্পীদের উদ্দাম নৃত্য টিভিদর্শকদেরকেও অস্বস্তিতে ফেলেছে। এসব দর্শকরা বলেছেন, এধরনের উলঙ্গনৃত্য সাধারণত গুলশানের বিশেষ কিছু ক্লাব বা পাঁচতারা হোটেলগুলোতে হয়ে থাকে। কিন্তু আয়োজকরা এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উলঙ্গনৃত্যকে দর্শকের একেবারে মুখের সামনে নিয়ে আসার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন! পথভ্রষ্টতার যে পথ তারা আবিষ্কার করলেন, এদেশের সম্ভ্রমহারা মানুষ তাদের দীর্ঘশ্বাসের সময় স্মরণ করবে তাদের অবদানের (?) কথা!

এবার আসল কথায় আসা যাক। বেপর্দা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন মানুষের মর্যাদা, নৈতিকতা আর সম্ভ্রমবোধ অধঃপতনের কোন্ তলানীতে নিয়ে যেতে পারে, তার ক্ষুদ্র একটা ধারণা পাওয়া গিয়েছে এই নৃত্যবখাটেপনার মাধ্যমে।

অনুষ্ঠান শুরু হয় ৮টা ৭ মিনিটে। শাহরুখ মঞ্চে আসেন ৮টি ৪২ মিনিটে। তার সঙ্গে আসা উলঙ্গ নৃত্য শিল্পীদের সঙ্গে গান ও

পারফর্ম করার পর তিনি সবচেয়ে ন্যাক্করজনক ঘটনাটার জন্ম দেন। মঞ্চের সামনে বসা এক দম্পতিকে তিনি মঞ্চে ডেকে নেন। লায়লা নামের ওই মহিলাটিকে স্বামীর সামনেই তিনি আলিঙ্গন করেন। অসহায় স্বামী আধা হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন নিজ স্ত্রীকে অন্যের বাহুলগ্ন হওয়ার নির্মম দৃশ্য! কিন্তু এখানেই শেষ নয়। লম্পটরা কখনও এতো অল্পতে শেষ করে না। তাই শাহরুখ আলিঙ্গন থেকে মুক্তি দিয়ে ওই মহিলাকে চুম্বন করতে থাকেন বারবার!

একজন মহিলাকে স্বামীর সামনে হাজার-হাজার উপস্থিত দর্শক আর লক্ষ-লক্ষ টিভি দর্শকের সামনে চুম্বন করার দৃশ্য কতটুকু বেদনা ও লজ্জার তা বলে শেষ করা যায়! একজন মানুষের মধ্যে যদি বিন্দু পরিমাণ হায়া-লজ্জা থাকে, তাহলে কী সে এই ঘটনা দেখার পর বেঁচে থাকাকে প্রাধান্য দিতে পারবে? অবশ্য এটা আমাদের মূল্যায়ন। হয়ত আমরা এটাকে বেদনা ও লজ্জার মনে করছি। কিন্তু ওই স্বামী এবং চুম্বনখাওয়া স্ত্রী যদি নিজেদেরকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন? স্বামী যদি মনে করেন, আমার কত সৌভাগ্য, আমার চুম্বনের স্থলে কিং খান চুম্বন এঁকেছেন, আমার আলিঙ্গনের স্থানে তিনি আলিঙ্গন করেছেন! স্ত্রী যদি মনে করে, জীবন আজ ধন্য, কিং খান আমাকে চুম্বন দিয়ে ধন্য করেছেন! সারা জীবন যদি তিনি পরিচিত আর স্বজনদের কাছে এ নিয়ে গর্ব করেন!

এই ধারণা মোটেও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সংবাদে প্রকাশ, শাহরুখ তাকে নিয়ে মস্তি করার সময় সে খুব উৎফুল্ল ছিল এবং আনন্দের আতিশয্যে সে বারবার নিজের পরিচয় দিয়ে বলছিল, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আমার দাদি। হয়ত সে মনে করেছিল, আজ যে সৌভাগ্যের মালা সে গলায় জড়িয়েছে এই মাহেন্দ্রক্ষণে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ না করলে কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় না। সত্যি যদি সে সে সময়কার প্রধানমন্ত্রীর নাতনী হয়ে থাকে, তাহলে সে তার দাদির কতটুকু সম্মান বাড়ালো, এতে তার সম্মান বাড়লো না কমলো, তা যেন দাদি যাচাই করে দেখেন। কারণ হাদীসে আছে-

فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ،

'চোখ ব্যভিচার করে, চোখের ব্যভিচার হলো অবৈধ পাত্রে দৃষ্টি দেয়া। হাত ব্যভিচার করে, হাতের ব্যভিচার হলো অবৈধ নারীকে ধরা, (মুখ ব্যভিচার করে। মুখের ব্যভিচার হলো অন্য নারীকে চুম্বন করা)।' [মুসনাদ আহমদ : ৮৫২৬]

লায়লা কি শাহরুখের জন্য বৈধ ছিলেন? তাকে ধরা, স্পর্শ করা এবং চুম্বন করা কি শাহরুখের জন্য বৈধ ছিল? হাদীসের ভাষ্যমতে সেটা কি ব্যভিচার নয়? হয়ত ছোট ব্যভিচার। পঞ্চাশ টাকার নোটও টাকা, একশ টাকার নোটও টাকা এবং পাঁচশ টাকার নোটও টাকা। কিন্তু এক হাজার টাকার নোটের তুলনায় ছোট। তাই বলে তো টাকার বাইরে নয়। শুধু সরাসরি যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়াই ব্যভিচার নয়। উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী

পরনারীকে ধরা, আলিঙ্গন করা এবং চুম্বন করাও ব্যভিচার। আর প্রকাশ্য জনসমুদ্রে এরূপ ব্যভিচার করে কেউ যদি গৌরববোধ করে এবং আনন্দের আতিশয্য নিজের পরিচয়টা লুকিয়ে রাখার লোভ সংবরণ করতে না পেরে প্রধানমন্ত্রীকে নিজের দাদি পরিচয় দেয়, তাহলে এখানে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শুধু লায়লাই নয়, শাহরুখের আলিঙ্গন আর চুম্বন পাওয়ার জন্য আরও অনেকেই মুখিয়ে ছিলো। হুমায়রা হিমু নামের এক অভিনেত্রী নাকি শুধু হাসফাস করেছে তাকে কখন শাহরুখ মঞ্চে ডেকে নেবে এই আশায়! হায় সমাজ! ব্যভিচারটাকে তুমি এত সহজে আপন করে নিতে পারলে?

অবশ্য কখনও কখনও মন আমার ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই সমাজের পঁচনটা শুরু হয়েছে ঠিক; কিন্তু এখনই তা এত গভীর পৌঁছেছে বলে মনে হয় নি, যার কারণে একজন স্বামী নিজের সামনে স্ত্রীকে পরপুরুষের বাহুলগ্না হতে দেখে, চুম্বিত হতে দেখেও কিছু মনে করবে না, তার পৌরুষের আঁতে ঘা লাগবে না। আমি যখন দুয়েকজনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি, তারা আমার সঙ্গে একমত পোষণ করেন নি। তারা বলেন, দেখুন গিয়ে, ওই দম্পতি নির্ঘাত গৌরববোধ করছে। বন্ধু-বান্ধবদের বলে বেড়াচ্ছে যে, দেখ দেখ...।

ওই দম্পতির মানসিক অবস্থা যা-ই হোক না কেন, এই ঘটনাটি কিন্তু আমাদেরকে দারুণ শঙ্কিত করেছে। বেপর্দা, মুক্তবাসের ছোবল আমাদের দেশে এভাবে এত জোরে এখনই হানা দেবে তা

আশা করিনি। মানুষের রুচিবোধ এত গলিজ হবে, তাও মেনে নিতে কষ্ট হয়। তাই যারা এখনও কিছুটা দূরে আছেন, তারা সতর্ক হন এবং পতনের এই তুফান থেকে নিজের পরিবার, দেশ ও সমাজকে রক্ষা করুন। ইসলামী সভ্যতা, ইসলামী রুচিবোধ ও পর্দার নিরাপদ জীবনে অভ্যস্থ হোন। ইসলাম আপনাকে ঠকাবে না, যিল্লতীর হাত থেকে বাঁচাবে কেবল।

ছাত্রীদের করুণ বিলাপ

পর্দাবিহীন মুক্তবাসের জীবন আমাদেরকে পরিণতির কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে কিঞ্চিত ধারণা দেয়ার জন্য আপনাদেরকে আমি নিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তরে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাক্ষেত্রে।

ঘটনা-১ : কুমিল্লার চান্দিনা এলাকার ঘটনা এটি। সংঘটিত হয়েছে ৭ এপ্রিল ২০১০ইং সালে। ছাত্রীর পিতার লিখিত অভিযোগে জানা যায়, চান্দিনা রেদোয়ান আহমদ কলেজের এক ছাত্রী কলেজে যাওয়া-আসার সময় মাহারৎ গ্রামের শাহ আলমের পুত্র সায়মন (২৫) প্রায়ই তাকে প্রেম প্রস্তাব দিত। কিন্তু ওই ছাত্রী তার আহ্বানে সাড়া দেয় নি। পরিবারের লোকজন তা জানতে পেরে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং তার লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসীরা মোবাইলে তার ছবি তুলে পরে তা কম্পিউটারে নগ্নভাবে প্রকাশ করে বাজারজাত করে।

এটা হলো অভিযোগকারীর নিজস্ব অভিযোগ। কিন্তু গ্রেফতার হওয়ার পর পাওয়া যায় ভিন্ন তথ্য। সায়মন জানায়, প্রথমে তাকে উপেক্ষা করলেও পরে ওই ছাত্রী তার প্রেম প্রস্তাবে রাজি হয়। রাজি হওয়া থেকে ঘনিষ্ঠতা এবং ঘনিষ্ঠতার সুযোগে একজন নারীর সম্ভ্রম ক্ষয়। শুধু তাই নয়, মোবাইলে সেই কুৎসিত দৃশ্য ভিডিও করে তা বাজারজাত করা। সায়মন জানায়, এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু পরে তাকে বাদ দিয়ে অন্যজনের সঙ্গে তার বিয়ে

হয়ে গেলে সে ক্ষোভ, অভিমানে মোবাইল ও ভিডিও দোকানে সেসব দৃশ্য সরবরাহ করে। তবে ক্ষোভ থেকেই হোক আর যে কোনও কারণেই হোক এভাবে কিন্তু ওই ছাত্রীর জীবন ঠিকই বিষিয়ে উঠেছে। বস্তুত প্রেম ও বেপর্দা একজন নারীর জীবনকে এভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

ঘটনা-২ : এ ঘটনাটি ফরিদপুরের চরভাদ্রসনের আলমনগর এলাকার। ১৪ বছরের এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে ধর্ষণের চিত্র ভিডিও করে তা বাজারে ছেড়েছে এক ধর্ষক। অবুঝ মেয়েটি ধর্ষণের বিভীষিকার মধ্য দিয়েই ঘটনা শেষ হবে মনে করেছিল। মনের দুখ মনে চাপা দিয়ে রেখে চৌদ্দ বছরের এই মেয়েটি নতুন করে জীবন শুরু করতে চেয়েছিল। কিন্তু এ সমাজের বাস্তবচিত্র সম্পর্কে তার ধারণা ছিল অসম্পূর্ণ। সে জানে না যে, ধর্ষকরা এখন অল্পতে তুষ্ট থাকার পাত্র নয়। ধর্ষণ করে সেই দৃশ্য অন্যকে না দেখালে এখন আর তাদের তৃপ্তি হয় না। তাই ধর্ষণ করে পরে সেই চিত্র তারা বাজারজাত করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। এখানেও ঘটল তা-ই। মেয়েটি জানতেই পারেনি যে কী সর্বনাশ অপেক্ষা করছে তার জন্য। একদিন দর্জির দোকানে গিয়ে সে জানতে পারে, এখানকার একটি মেয়ের ধর্ষণের চিত্র বাজারের বেশ খানিকটা জায়গা দখল করে রেখেছে। এ ব্যাপারে সকলের আগ্রহ এখন তুঙ্গে!

বিদেশী নারীদের নগ্ন অভিসারদৃশ্য দেখে এখন দর্শকরাও ক্লান্ত। তারা চায় দেশী মেয়েদের এমন দৃশ্য! তাই বাজারে এ ধরনের

কোনও দৃশ্য এলে তা মুহূর্তের মধ্যে বাজার দখল করে। মেয়েটি কিন্তু তখনও বুঝতে পারে নি আসল ঘটনা। পরে যখন জানতে পারে, তখন কী অবস্থা হয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পত্রিকার বিবরণ দেখুন :

১. মেয়েটির বয়স ১৪ বছরের বেশি নয়।

২. প্রথমে মেয়েটির গলা চেপে ধরা হয়।

৩. ধর্ষণের পুরো সময়টিতে সে ডুঁকরে কেঁদেছে।

৪. অনেকজন তাকে ঘিরে রেখেছে এবং একজন ভিডিও করেছে।

৫. তার কান্নার মধ্যেই ধর্ষকরা তাকে ধর্ষণ করে উৎফুল্লতা প্রকাশ করে নারকীয় উল্লাস প্রকাশ করেছে।

পাঠক! আপনি চিন্তা করতে পারেন মানবতা, সভ্যতা আর নৈতিকতার কী পরিমাণ ধস নামলে এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হতে পারে?

ঘটনা-৩ : টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার এক কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। শুধু ধর্ষণ করে তো আর এ যুগের বাঁদররা থামতে নারাজ। তাই এর সঙ্গে ওই কিশোরীর যৎকিঞ্চিত আড়ালে থাকা সম্ভ্রমটুকুও নিলামে তুলেছে। ধর্ষণের ভিডিও ছবি ধারণ করে ধর্ষকরা তা বাজারে ছেড়ে দিয়েছে। সম্ভ্রম হারিয়ে মামলা করলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ওই নষ্ট বাঁদরদেরকে আটক করে নি। উল্টো ধর্ষিতার পরিবার সম্ভ্রম হারানোর পর এবার জীবন হারাতে রাজি নয় বলে সেখান থেকে পালিয়ে গেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মেয়েটি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে হাবিবুল্লাহ ইতিহাস ওরফে হাবিব, আরিফ আহমেদ, বাবুল আজাদ তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে মোটর সাইকেলে সখীপুর হাজীপাড়ায় আলমগীর হোসেনের এক ছাত্রাবাসে নিয়ে যায়। পরে হাবিবুল্লাহ ইতিহাস তাকে ধর্ষণ করে। তার সহযোগীরা সেই ধর্ষণের চিত্র ভিডিও করে। তার কামনার আগুন নির্বাপিত হলে আরেক জানোয়ার মেয়েটির দিকে অশুভ হাত এগিয়ে দেয়। কিন্তু এই সুযোগে মেয়েটি কোনও মতে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। তারা তাকে ধাওয়া করেও নাগালে পেতে ব্যর্থ হয়।

মেয়েটি সে সময় তাদের হাত থেকে ছাড়া পেলেও চূড়ান্ত অর্থে ছাড়া পায় নি। কেননা, সারা জীবন তাকে বয়ে বেড়াতে হবে কলঙ্কের দাগ। যে দাগের সাক্ষী হবে হাজারো মানুষ। মোবাইল কিংবা ভিডিও দোকানে ছেড়ে দিলে তো কথাই নেই। হয়ত তার মৃত্যুর পরেও বহুকাল পরজগতের বাসিন্দা হয়েও সে আত্মার চোখ দিয়ে দেখতে পাবে সম্ভ্রম হারানোর করুণ দৃশ্য, যে দৃশ্য দেখে লালায়িত দর্শক শয়তানী মুগ্ধতায় মুগ্ধ হবে! কামনা করবে তার বিদেহী দেহের অবৈধ সঙ্গ!

ঘটনা-৪ : গোপালগঞ্জ ইডেন কলেজের রসায়ন বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্রী সাদিয়া নূর মিতা (২২)। মিয়াপাড়ার বাসিন্দা লিয়াকত হোসেনের কন্যা তিনি। মিতাও গলিত সমাজের এক নিষ্ঠুর পরিণামের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এক করুণ গল্পের প্রয়াত নায়িকা।

কলেজ বন্ধ হওয়ার পর 'আজ আমাদের ছুটি ও ভাই আজ আমাদের ছুটি'র আনন্দ নিয়ে বাড়ি এসেছেন। মা-বাবা, ভাই-বোনের সঙ্গে মিলেমিশে রোযা পালন করবেন, ঈদ করবেন এমনসব সুন্দর-সুন্দর ইচ্ছা তার। কিন্তু বখাটে আর সমাজের লম্পটেরা সত্য হতে দিল না তার সুন্দর ইচ্ছাগুলো। কামনার অগ্নিতে ছাই হয়ে গেল তার এই সুন্দর ও পবিত্র ইচ্ছাগুলো।

২৪ আগস্ট নিখোঁজ হলেন তিনি। সাহরী খাওয়ার সময় একজন যুবতী নারীর নিখোঁজ হওয়া কম উৎকণ্ঠার কথা নয়। পরিবারের সকলে মিলে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকলেন তাকে। সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজা হলো তাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল এমন জায়গায় আর এমন অবস্থায়, যার কল্পনা করতে পারে না কোনও মা, কোনও বাবা, কোনও ভাই, কোনও বোন এমনকি কোনও দুশমনও। স্থানীয়রা মিয়াপাড়ায় হাসানুর রহমানের পুকুরপাড়ে তাকে পড়ে থাকতে দেখা যায় লাশ অবস্থায়, ধর্ষিতা অবস্থায়!

এ যেন মিতার লাশ নয়, গোটা বিশ্বের অধঃপতিত সমাজের মৃত অস্তিত্বের সাক্ষী তিনি।

ঘটনা-৫ : এটাও কলেজ ছাত্রীর সম্ভ্রমহানীর ঘটনা। তাও একেবারে দিনদুপুরের ঘটনা। কলেজের ক্যাম্পাসের মধ্যে!

কলি (ছদ্মনাম) খুব নিশ্চিন্তে হেঁটে যাচ্ছিলেন কলেজ ক্যাম্পাসের সামনে দিয়ে। ঢাকা পলিটিকনিক্যাল কলেজের ছাত্রী তিনি। একজন ছাত্রী কলেজ ক্যাম্পাসে নিরুদ্বিগ্ন থাকবেন, নিশ্চিন্তে

বিচরণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে সমাজ আর সভ্যতার কোলে আমরা বসবাস করছি, সে সমাজ আর সভ্যতার যোগ-বিয়োগের ফলাফল ভিন্ন। এখানে দুইয়ে-দুইয়ে চার হয় না, বাইশ হয়! ফলে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত সব হিসেব লিখিত হয় আমাদের হিসেবের খাতায়। কলির বেলায়ও তা-ই হলো। যে ক্যাম্পাসকে তিনি নিরাপদ মনে করে দিনে-দুপুরে নিশ্চিন্তে হেঁটে যাচ্ছিলেন, সেই ক্যাম্পাসই তার সবচেয়ে দুঃসহ স্মৃতির ট্রাজেডিময় স্থান হয়ে থাকল। মোবারক ও অনিত নামের দুই ছাত্র ২৪ এপ্রিল রবিবার কলিকে ক্যাম্পাসের একটি কক্ষে নিয়ে পালাক্রমে লাঞ্ছিত করে। শিক্ষা নিতে এসে শিক্ষা ক্যাম্পাসে লাঞ্ছিত হয়ে এই সমাজ সম্পর্কে কী মন্তব্য করবেন কলি, তা বড় বেশি জানতে ইচ্ছা করে। এই নির্মম পরিণতির শিকার হওয়ার পর ইসলামের আদর্শের মধ্যে শান্তি খুঁজে পাওয়ার, পর্দার নিরাপদ বিধানের প্রতি তার শ্রদ্ধা জাগে কিনা তাও জানতে ইচ্ছা করে। [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, সেপ্টেম্বর ২০১০ ইং]

ঘটনা-৬ : 'আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই, ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার বাড়ি যাই' কবিতার এই চরণগুলো হয়ত চিরদিনের জন্য ভুলে যেতে চাইবে তুলি (ছদ্মনাম)। কারণ, সে মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে হারিয়ে এসেছে তার সবচেয়ে দামি সম্পদটুকু। মাত্র ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী সে। বাড়ি পিরোজপুরে। কোনও এক ছুটিতে হল্লা করে বেড়াতে গিয়েছিল নানার বাড়ি চরভদ্রাসনে। কিন্তু মেজবানরা তার মেহমানদারী করেছে তার

সম্ভ্রম কেড়ে নিয়ে। প্রত্যন্ত গ্রামের এক পাটক্ষেতে তার সম্ভ্রমহানী করা হয়। ধর্ষক আহসান কবির মামুন, তুষার, কালামসহ মোট চার যুবক এই পাপক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। তারা শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয় নি। পাটক্ষেতে সংঘটিত ক্ষমার অযোগ্য এই অপরাধচিত্র নিয়ে আসে জনসম্মুখে। লক্ষ মানুষের দৃষ্টিতে। সহযোগীদের দিয়ে ধর্ষণের সেই ভিডিও দৃশ্য ধারণ করে বাজারজাত করে তারা। পাপের আঁধারচারীরা দেখে তৃপ্ত হয় একটা অসহায় কিশোরী কিভাবে সম্ভ্রম হারাচ্ছে! লম্পটরা তার থেকে কী ঘৃণ্যভাবে ফায়দা তুলে নিচ্ছে।

ঘটনা-৭ : আরও নারকীয় ঘটনা এটি। ২৭ ও ২৮ বছরের দুইজন পাক্কা যুবকের একজন তৃতীয় শ্রেণীর কাঁচা দেহের ওপর হামলে পড়া! ঘটনাটি কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানার নারায়ণপুর গ্রামের। মেয়েটির নাম ফারজানা। আবূ বকর সিদ্দিকের মেয়ে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী এই ফারজানা। বুধবার ওয়াহেদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে আবদুর রশিদ (২৭) এবং বশির (২৮) তাকে পাটক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে। কিন্তু পরিচয় ফাঁস হওয়ার ভয়ে শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয় না তারা, মুখের ভেতর কাঁদা ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে হত্যা করে তারা। ওই দিন মেয়েটিকে খোঁজাখুঁজি করে উদ্ধার করার পর ভূতের আছরে মারা গেছে বলে প্রচার করে দাফন করা হয়। কিন্তু পরে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করলে আসল ঘটনা বেরিয়ে আসে। আসল ঘটনায় জানা যায়, সেই ভূতটা ছিল রশিদ ও বশির নামের দুই পিশাচ। তারাই

ফারজানার সামনে ভূতের ভয়ার্ত চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তাকে ধর্ষণ ও হত্যা করেছে!

ঘটনা-৮ : যশোর জেলার অভয়নগর থানার আলমডাঙ্গা গ্রাম। গ্রামের রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী রেশমা বেগম। বয়স মাত্র সাত বছর। এ বয়সে যেখানে সবার আদর আর সোহাগ পাওয়ার কথা, সে বয়সে সে পেয়েছে লাঞ্ছনা আর নির্মমতা। সমাজের আয়না আজ এত বিচ্ছিরি হয়েছে যে, এর দিকে তাকাতেও ঘৃণা ধরে যায়। স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার পথে একই গ্রামের হান্নান মোল্লার ছেলে জাকির হোসেন (১৮) তাকে পেঁপে খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে পাশের কুলক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর ঘটনা ফাঁস হওয়ার ভয়ে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে সে। দীর্ঘক্ষণ মেয়েকে না পেয়ে মা এদিক-ওদিক খোঁজাখুজি করেন। দুপুর ২টার সময় পাশের সাদেক আলীর স্ত্রী আছিয়া বেগম কুলক্ষেতে রেশমাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। তার মুখে সে সময় কাদা ঢুকানো ছিল। এই কাদা আসলে আমাদের বিবর্ণ সমাজের নোংরা পঙ্কিলতা মাত্র!

বিনাশী পরকীয়া : বিচূর্ণ দর্পণে আমাদের সমাজ অবয়ব

মানুষের নৈতিক অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। গ্রাম-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার মধ্যে বেপর্দা আর মুক্তবাসের করুণ পরিণতির আভাস দেখা যাচ্ছে খুব সুস্পষ্টভাবে। প্রেম-পরকীয়া আজ গোপন বা মানুষের দৃষ্টিতে নিন্দাযোগ্য কোনও অপরাধ নয়! একারণে সমাজ-জীবনে ভয়ানক ব্যধি হিসেবে এই রোগটা আত্মপ্রকাশ করলেও চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। আর নেয়া হবেই বা কেন? একটা লোক যদি তার রোগকে রোগই মনে না করে, তাহলে তার চিকিৎসা নিতে যাবে কেন সে? আমাদের সমাজের চিত্র ঠিক এরূপই। প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে নিয়মিত টকশো চলছে, রেডিওগুলোতে নিয়মিত উৎসাহ দেয়া হচ্ছে প্রেম-ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়তে, এমনকি ভালোবাসার কাহিনীগুলো সরাসরি প্রকাশ করার সুবিধার্থে লাইভ সাক্ষাৎকারেরও আয়োজন করা হচ্ছে! তো এই সমাজে প্রেম-পরকীয়াঘটিত কারণে নারী-পুরুষের প্রাণ যাবে না- এই আশা করা অসারতা ছাড়া আর কী হতে পারে! আপনি যদি সমাজের অনাচারগুলো নিয়ে ভাবতে যান, তাহলে আপনাকে এমনসব বিচিত্র ও নির্মম ঘটনার সামনে পড়তে হবে, যা দেখে-শুনে আপনার কলিজায় কাঁপন না ধরে থাকবে না। নিচের ঘটনা দিয়ে অবস্থা আঁচ করার চেষ্টা করুন :

‘প্রেমিকা জেসমিন, সঙ্গে এক লাখ টাকার ব্যাগ। দুটোই পেতে চেয়েছিলাম। স্বপ্ন দেখছিলাম ঘর বাঁধার। বিভোর স্বপ্নে এমন সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাই নি আমি। সামলে রাখতে পারি নি নিজেকে। তাই রাজী হয়ে জেসমিনের কর্মক্ষেত্রে যাই দক্ষিণ বনশ্রীতে। দুইজন মিলে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করি সুমাকে।’ কথাগুলো জেসমিনের প্রেমিকা রহমতুল্লাহর। সে তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলে প্রেমিকার গৃহকর্ত্রীকে হত্যা করেছে। মূল ঘটনায় আসুন।

রহমতুল্লাহ ছয় মাস আগে মুহাম্মাদপুরের ব্যবসায়ী মাহফুজ উল্লাহর বাসায় বদলী কাজ করত। সেখানে গৃহপরিচারিকার কাজ করত জেসমিন নামের এক মহিলা। সেই সূত্রে উভয়ের পরিচয়। পরিচয় থেকে ভালো লাগা এবং ভালোলাগা থেকে প্রেম তথা পরকীয়া। কেননা, এর ছয় বছর আগেই জেসমিনের বিয়ে হয়েছিল আবদার আলী নামের জনৈক রিক্সাচালকের সঙ্গে। তার ঔরসে একটি কন্যাসন্তানও আছে জেসমিনের। কিন্তু এই দরিদ্রতা আর বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে পরকীয়া। এই পরকীয়াই শেষ পর্যন্ত একজন মানুষের জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরকীয়ার সম্পর্ক হওয়ার পর একযোগে ওই বাসায় কাজ ছেড়ে দেয় জেসমিন ও রহমতুল্লাহ। জেসমিনের স্বামী গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডতে বসবাস করায় তাতে কোনও সমস্যাই

হয় না তাদের। স্বামীর অনুপস্থিতিতে মাঝে মধ্যেই তারা মিলিত হতো গোপন অভিসারে, নাপাক সুখ কামনায়।

এখানে কাজ ছেড়ে দিয়ে জেসমিন কাজ নেয় দক্ষিণ বনশ্রীর এফ ব্লকের সাত নম্বর সড়কের সোমা আক্তার সুমীর ঘরে। এই বাড়ির মালিক হলেন নাদিরা বেগম। তিনি থাকেন চতুর্থ তলায়। নাদিরার ভাগিনা দ্বীপর সঙ্গে আবার সম্পর্ক সুমার। সোমা নিজ স্বামী ও সংসারের কথা ভুলে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন বাড়িওয়ালার ভাগিনা দ্বীপর সঙ্গে।

চমৎকার! বাসাওয়ালাও পরকীয়ার অভিযাত্রী, কাজের বুয়াও পরকীয়ার অভিযাত্রী! সোমার সঙ্গে বেশ কিছুদিন চুটিয়ে প্রেম করে দ্বীপ হাঁপিয়ে ওঠে। সে পুরোনো ঠাণ্ডা চায়ের পরিবর্তে নতুন তাজা চায়ের পেয়ালার দিকে হাত বাড়ায়। প্রেম করে লন্ডনপ্রবাসী এক নারীর সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গেই বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সোমাকে ছেড়ে দ্বীপ বিয়ে করার পর সে নিজে পড়ে অস্বস্তিতে আর সোমাকে ফেলে মর্মপীড়াতে।

পরকীয়া প্রেমিকের এই অকৃতজ্ঞতা দেখে ভেঙে পড়ে সোমা। মানসিকভাবে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে। অবস্থা যে কোনও মুহূর্তে ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হওয়ার আশঙ্কা করে দ্বীপ। তার আশংকা, পরকীয়ায় ব্যর্থ হওয়ায় মানসিক রোগে আক্রান্ত সোমা যে কোনও মুহূর্তে তার স্ত্রীর কাছে ঘটনা ফাঁস করে দিতে পারে। তাই আপদ দূর করার জন্য সোমাকে সে বাসা ছেড়ে দিতে বলে। কিন্তু সোমা তাতে কর্ণপাত করে নি। শোকের সঙ্গে যোগ হয় জেদ। সে

প্রতিজ্ঞা করে বাসা না ছাড়ার। তাকে কোনওভাবে বাসাছাড়া করতে না পেরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় দ্বীপ। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেয় খালা নাদিরা। আর তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় জেসমিন ও তার পরকীয়া প্রেমিক রহমতুল্লাহর ওপর। তাকে দুটো বস্তুর লোভ দেখানো হয়। কাজটা করে দিতে পারলে এক লাখ টাকা এবং রহমতুল্লাহর সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা। এক পরকীয়াকে বাস্তবতার রূপ দিতে আরেক পরকীয়ার অভিযাত্রীর জীবনলীলা সাঙ্গ করার মহাপরিকল্পনাই বলা যায় এটাকে। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে রাজী হয়ে যায় জেসমিন, সঙ্গে রহমতুল্লাহও।

হত্যা পরিকল্পনায় শামিল থাকে দ্বীপর খালা নাদিরা। পরিকল্পনা মোতাবেক রহমতুল্লাহকে আহ্বান করে জেসমিন। গৃহপরিচারিকা হওয়ার সুবাদে সোমার ঘরে অন্য কাউকে ঢুকানো কঠিন ছিল না তার জন্য। তাই রহমতুল্লাহকে সে ঘরে প্রবেশ করতে দেয়। সে সময় সোমা খাটে শুয়ে ছিলেন। ঘরে প্রবেশ করা মাত্র কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই রহমতুল্লাহ সোমার গলায় কাপড় পেঁচিয়ে ধরে। খাটের এক পাশে সোমার প্রতিবন্ধী ছেলে নকীবও শোয়া ছিল। কিন্তু মাকে বাঁচানোর মতো কোনও শক্তি ছিল না তার। তাই অসহায় অবস্থায় মায়ের মৃত্যুদৃশ্য হজম করতে হয় তাকে। রহমতুল্লাহ সোমাকে পেঁচিয়ে ধরার পর জেসমিন তাকে লাথি দিয়ে খাট থেকে ফেলে দেয়। দুইজনের সম্মিলিত শক্তির কাছে হেরে যান সোমা। এক সময় ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। এভাবেই

রচিত হয় দ্বৈত পরকীয়ার অশুভ পরিণতির নির্মম আখ্যান। একটা সমাজ অধঃপতনের কোন তলানীতে ঠেকলে এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা ভাবতে মনে হয় খুব বেশি জ্ঞান খাটানোর প্রয়োজন নেই। মানুষের নৈতিক অবস্থার অবনতি, ধ্বংসাত্মক পরিণাম আমরা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করে চলেছি। সামাজিক অবক্ষয়ের বিষয়টি মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকমাত্র বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা এমনও নয়। আমরা সবাই বুঝি সমস্যার কথা, পরিণতির ভয়াবহতার কথা। কিন্তু সমাধানের জন্য আমরা সরল পথে হাঁটছি না। অবলম্বন করছি নানান বক্রপথ। সত্যিকার অর্থেই যদি আমরা সমাধান চাই, এ ধরনের করুণ ও নির্মম দৃশ্য না দেখতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সরলপথে আসতে হবে। সেই সরল পথ আল্লাহর পথ, আল্লাহর বিধান ছাড়া আর কীসেইবা মানুষের মুক্তি নিহিত থাকতে পারে?

অসময়ের করুণ প্রস্থান

‘যারা আমার চিঠি পড়বেন, তাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আমার মতো আর কারও জীবন যেন নষ্ট না হয়। এই সব বখাটে ছেলেদের কবলে যেন আমার মতো আর কারো শিকার হতে না হয়।’

হৃদয়বিদারক এই চিঠিতে এভাবেই ফুটে উঠেছে আমাদের করুণ সমাজের রুগ্নদশা। আমরা দিন-দিন বর্বরতার কোন্ গহীন অরণ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তা নির্দেশ করে ছোট্ট এই চিঠিটি। যেসব ‘চিরকুটে’ প্রাণ হারানো, সম্ভ্রম হারানো, লাঞ্চিত হওয়ার দলিল রয়েছে, হাজারও নারী, কন্যা, জায়া জননীর সেসব চিরকুটের একটি হলো চৈতির এই চিঠিটি।

এটি এই সমাজের রুগ্নদশার ছোট্ট একটা উপমা। চিঠির অল্প কয়েকটি বাক্যই বিষ মাখানো ছুরির ফলা হয়ে বিদ্ধ হয় চিন্তাশীল মানুষের বুকে। কেন এই চিঠি লিখেছিলেন চৈতি? কী পরিণাম হয়েছিল তার? বিবরণ পাঠ করুন :

মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক শাহাদাত হোসেনের মেয়ে চৈতি আক্তার (১৭) কালকিনি উপজেলার সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের মানবিক প্রথম বর্ষের ছাত্রী। মেধাবী ও বেশ দর্শনধারী। কিন্তু মাত্র সতের বছর বয়সে দুনিয়ার রূপ-রস আর সৌন্দর্য দেখার আগেই

দুনিয়া তাকে সালাম বলেছে। হয়েছেন তিনি সামাজিক পাপ আর ইলাহী বিধান লঙ্ঘনের নির্মম শিকার।

তিনি তার শেষ ডায়েরিতে লিখেছেন- 'আমার জীবনের মায়া ত্যাগ করলাম শুধু একটি ছেলের কারণে। তার নাম সাগর। একটি মেয়ের জীবনে যা অমূল্য ধন হিসেবে তোলা থাকে, তা আমার কাছ থেকে ওই ছেলেটি ছলেবলে কৌশলে আদায় করে নিয়েছে। এমনকি আমার বোনকে নষ্ট করার হুমকি দিয়েছে। তাই আমি ভাবলাম, আমার জীবন নষ্ট হয়েছে; কিন্তু আমার বোনের জীবন নষ্ট হতে দেব না। আমার এত কষ্ট, আমার এই কথাগুলো কাউকে বলে যেতে পারতাম না। পরে শেষে আমার বোন চাঁদনীর কাছে বলেছিলাম। আমার বাবা খুব রাগী, তাকে খুব সম্মান করি। তাই তার কাছে বলার সাহস করি নি। পরে চাঁদনী ছোট মামীর কাছে ব্যাপারটা জানায়। কিছুদিন আগে সাগর অতিরিক্ত ভয় দেখিয়ে উত্যক্ত করায় আমি না বলে পারি নি। একটা মেয়ে কখন তার জীবনের মায়া ত্যাগ করে? কিন্তু আমি যে বাঁচব, তার কোনও কূল ছিল না। আমি জানি, আত্মহত্যা মহাপাপ। তার পরেও আমাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে।'

পাঠক! এতক্ষণ পর্যন্ত তো আমিই ঘটনা বিশ্লেষণ করলাম। এবার এই দায়িত্বটা আপনি নিন। চিন্তা করুন আমাদের সামাজিক অবস্থার কথা। আজ পর্দা ভেদ করে সমাজ শুধু পাপের সাগরেই ডুবে যায় নি, নাযুকতার এমন এক পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়েছে, যেখানে পাপিষ্ঠকে প্রতিরোধ করা যায় না। গোটা দুনিয়াটা যেন

বাঘ-ভল্লুকদের অভয়ারণ্য। যারা নিরপরাধ থাকতে চায় তারা নিরস্ত্র শিকার। তাদের যে যেভাবে ইচ্ছা আক্রমণ করবে, ভোগ করবে এবং এক সময় বাসি হয়ে গেলে তাকে ত্যাগ করে আরেকজনের সর্বনাশ করবে। ওই বনের অলিখিত সংবিধান, কেউ বাধা দিতে পারবে না। বাধা দেয়ার পরিণাম ভালো হবে না। কোথায় গেল সেই নববী আদর্শ, যেখানে প্রতিটি মুসলিম ছিল তার মুসলিম বোনের সম্ভ্রম রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী? কোথায় তাদের উত্তরসূরী, যারা বিশ্বের কোথাও কোনও বিধর্মী শাসক কর্তৃক কোনও মুসলিম নারীর সম্ভ্রমে সামান্যতম আঁচড় কাটলে ঝাঁপিয়ে পড়ত সেই পাপীর ওপর? আমরা কি পারি না সেই সোনালী ধারা ফেরত আনতে? না পারলেও অন্তত তাদের অনুসরণ করতে? পারি না আমরা প্রত্যেকেই মুসলিম নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জামিন হতে? আর মুসলিম বোনেরা কি পারি না নিজের সম্ভ্রমটাকে পর্দার দুর্গে নিরাপদ রাখতে? এ আমাদের পারতেই হবে। আমরা আর কত দেখব মা-বোনদের এমন নির্মম পরিণতি, করুণ আখ্যান? আমরা আর তা দেখতে চাই না। এ অতীত ভুলে ফিরে যেতে চাই আগের অতীতে।

এলোমেলো পরিচয়

مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি তার মাহরামের সঙ্গে পাপে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয় তাকে হত্যা করো। [মুস্তাদরাক হাকেম : ৮০৫৪][7]

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : اِنَّ خَالَهُ بَعَثَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِاِمْرَأَةِ اَبِيْهِ اَنْ يَقْتُلَهُ وَيُخَمِّسَ مَالَهُ-

‘বারা ইবন ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে হত্যা ও তার সম্পদ জব্দ করার নির্দেশ দেন এ কারণে যে, সে তার সৎ মা (মাহরাম নারী) এর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল।’ [আবূ দাউদ : ৪৪৫৬]

اِلاَّ اِذَا كَانَ يُخَافُ عَلَيْهَا اَوْعَلَى نَفْسِهِ الشَّهْوَةَ فَلاَ يَنْظُرُ وَلاَ يَمْسُ ... وَحُرْمَةُ الزِّنَا بِذَوَاتِ الْمُحَارِمِ اَغْلَظُ فَيَجْتَنِبُ -

‘তবে যদি পাপে পতিত হওয়ার আশঙ্কা করে, তাহলে নিজ মাহরাম তথা মা, বোন, ভাই প্রমুখের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না এবং তাদের স্পর্শও করবে না। কেননা, পরনারীর সঙ্গে ব্যভিচার

---

[7]. হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন। তবে অন্য অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটির সনদ পর্যালোচনা করে এটিকে যঈফ বলেছেন। তবে দ্বিতীয় হাদীস থেকে আমরা এ হাদীসের বক্তব্যের সমর্থন পাই।

করার চেয়ে মাহরাম নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করার অপরাধ অনেক বড়।' [হেদায়া : ৪/৪৬২]

হাদীস ও ফিকহের ভাষাগুলো কেমন কঠিন মনে হয়! তাই না? ভাই বোনকে দেখতে পারবে না! চাচা ভাতিজীকে দেখতে পারবে না! নানা নাতনীকে দেখতে পারবে না! এ কেমন কথা? তথাকথিক নারী স্বাধীনতাবাদীদের কথা না হয় বাদই দিলাম। যারা রক্ষণশীল মুসলিম, তারাও সম্ভবত প্রথম চোটে হোঁচট খাবেন ইসলামী বিধানের এই কঠোরতা দেখে। ভড়কে যাবেন, চমকে উঠবেন। মুখ ফস্কে না বললেও হয়ত মনে উদয় হবে, ইসলামের বিধান এত কঠিন? এত শক্ত? নাহ্ আরা পারা গেল না...।

কিন্তু কোনও শিশুর হাতে অস্ত্র দেখে তা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়াকে কেউ কি অভিভাবকের নিষ্ঠুরতা বলবেন? অভিভাবকের এই কঠোরতায় কার লাভ কার ক্ষতি? সামাজিক জীবনের এই সহজ অনুভূতিগুলো মাঝে-মধ্যে কাজ করে না বলে আমরা বিভ্রান্ত হই। অবিবেচকের মতো কথা বলি।

শরীয়তের বিধান হলো, নারী-পুরুষ মিলে একটি পরিচ্ছন্ন জীবন গঠন করবে। এতে থাকবে না ক্লেদ, অপবিত্রতা ও নোংরামী। সামাজিক এই ভারসাম্যতার জন্য যতটুকু কঠোরতা প্রয়োজন, ইসলাম তাতে কোনোরূপ ছাড় দেয় নি। তাই কখনও-কখনও আমাদের কাছে এধরনের কঠোরতা বাড়াবাড়ি পর্যায়ের মনে হয়। কিন্তু এর পেছনে যে যৌক্তিকতা আছে, নিরাপত্তা আছে, সে বিষয়টি আমাদের চিন্তায় আসে কম। একথা ঠিক যে, একজন

মাহরাম তার মাহরামকে দেখতে পারবে না- এই বিধানটি বেশ কঠিনই। কিন্তু কখন এই বিধান? এই বিধান কিন্তু তখনই, যখন ওই মাহরামের মধ্যকর নিরাপত্তার দেয়ালটা ধসে যায়। পবিত্রতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে মোড় নেয় কলঙ্কের দিকে। যে আশঙ্কার কারণে এধরনের কঠিন বিধান আরোপ করা হয়েছে, সেই আশঙ্কাটাই যথার্থ কিনা- তা নিয়েও প্রশ্ন করেন অনেকে। এই প্রশ্ন যারা করবেন তাদের জন্য তুলে দেয়া হলো নিচের ঘটনাটি :

গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানার একটি গ্রাম। এখানে বহুপ্রাচীন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাইস্কুল আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেই বৃটিশ আমলে আর হাইস্কুল **১৯৬৭**ইং সালে। এই স্কুলেরই অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রী হয়েছে ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য এক কলঙ্কের শিকার। যে বিধানের কথা শুনে আপনি থমকে গেলেন, ভড়কে গেলেন এবং কুরআন-হাদীসের বিধানকে কঠিন বলে মনে করলেন, সেই বিধানে ত্রুটি হওয়ার কারণেই রচিত হয়েছে এই কলঙ্কজনক অধ্যায়। ঘটনার শিকার মেয়েটিকে এ কারণে এমন এক স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হবে সারা জীবন, যার ক্ষত কখনও শুকাবে না। মৃত্যুও মনে হয় তাকে এই শোক ভুলিয়ে দিতে পারবে না।

কনা (ছদ্মনাম) মেয়েটির স্বাস্থ্য ইদানিং বেশ বেড়ে গেছে। সবাই দেখে অবাক হয়। সখীরা খুনসুটি করে, কী লো তুই এতো মুটিয়ে যাচ্ছিস কেন? স্বাস্থ্য প্রত্যাশী ক্ষীণদেহী বান্ধবীরা বলে, তুই কোন্

দোকানের চাউলের ভাত খাস লো? আমাদেরকেও সে দোকানের চাউলের ভাত খেতে হবে যে!

সখী-বান্ধবীদের এসব হাসি-কৌতুকে হাসি মিলিয়ে যায় কনার। মুখটা হঠাৎই পানসে হয়ে যায়। প্রসঙ্গ পাল্টাতে মুখ কালো করে বলে- হু, ডাক্তার বলেছে আমার নাকি মেদ হয়েছে! কিন্তু কনা আসলে জানে এটা কিসের মেদ। পেটে কীসের মেদ এবং কীসের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে সে!

এভাবে চলতে চলতে এক সময় স্কুলই বন্ধ হয়ে গেল কনার। সখী-বান্ধবীরা কিছুদিন খোঁজ করার পর তার কথা ভুলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই বিস্মৃতির মধ্যেই টনক নড়ল সবার। সখী কনার কথা এখন বান্ধবী, এলাকাবাসী এবং মহল্লার প্রতিটি মানুষের মুখে-মুখে। সে এখন কেবল সাধারণ একজন ছাত্রী নয়, আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক ঘটনার জননীও বটে!

মাস্টার আব্দুল লতিফ সাহেবের গিন্নি চমকে উঠলেন। তার বাড়ির পাশেই কনাদের বাড়ি। কনার বাবা থাকে বিদেশে। বাড়িতে মা ও নানা। এছাড়া অন্য কোনও মানুষের অস্তিত্ব নেই। এ বাড়ি থেকে শিশু বাচ্চার কান্নার আওয়াজ তো আসার কথা নয়? তাও নতুন অতিথি শিশু! তিনি খেয়াল করলেন বেশ কিছুদিন ধরে কনাদের বাড়ির গেট সবসময় বন্ধ থাকে। ওদের বাড়ির কেউ সচরাচর বাইরে বের হয় না। আগে কনা মেয়েটি আসত, এখন সেও আসে না। অন্য কেউ তাদের বাড়িতে গেলে তারা অস্বস্তি প্রকাশ করে।

সপ্তাহখানেক হয় কে একজন মহিলা যেন ওদের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে! এ ব্যাপারটিও ভাবালো তাকে।

যাহোক, তিনি চমকে গেলেন। কৌতূহলী হলেন। কচি শিশুর কান্না তাকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলল। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে কনাদের গেটের কাছে গেলেন। ইতিমধ্যে আরও অনেকেই এখানে সমবেত হয়েছে। সকলে মিলে কনাদের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। ভেতরে গিয়ে যা দেখলেন, তাতে তাদের বেহুঁশ হওয়ার দশা। নবজাতক একটি শিশুকে বড় এক ড্রামের মধ্যে ফেলে রেখে ড্রামের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে! ভবের সদ্য আলো-বাতাস দেখা শিশুটি নিঃশ্বাস ফেলতে না পেরে করুণ কান্না করছে। প্রথমে তারা শিশুটিকে উদ্ধার করলেন। তারপর মনোনিবেশ করলেন ঘটনার রহস্য উন্মোচনের প্রতি। ঘটনা শুনে উপস্থিত নারীরা আকাশ থেকে পড়লেন। বাচ্চাটির মা ওই কনা, যে পেটে মেদ হয়েছে বলে বান্ধবীদের চোখে ধূলা দিয়েছিল!

এক পর্ব শেষ করে দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে সন্তানের উৎস অনুসন্ধানের পালা। উৎস সম্পর্কে যা বলা হলো, তাতে বিশ্বাসের কান পাততে যে কোনও মানুষের ধাক্কা লাগা স্বাভাবিক। তবু বিশ্বাস করতে হলো। কেননা, কখনও-কখনও এমন সব ঘটনাও ঘটে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা না হলেও তা বিশ্বাস করতে হয়।

নানার ঔরস নিয়ে প্রেগন্যান্ট হয়েছিল কনা! একথা কারই বা বিশ্বাস হয় এবং কারই বা শুনতে ভালো লাগে? ভর্ৎসনা, ঘৃণা আর ধিক্কারের থুতু নিক্ষেপ করা শুরু করলেন উপস্থিত সবাই। এ

নিয়ে কথা আর আগে বাড়াতে চাই না। তবে একটি কথা হলো; এই পরিবারের সবার পরিচয় এখন সম্পূর্ণ এলোমেলো। নাতনী হয়েছে সন্তানের মা। নানা হয়েছে সন্তানের বাবা। মেয়ে হয়েছে শাশুড়ী! কী জঘন্য চিত্র!

কনার মা বারবার বিলাপ করে বলছিলেন- হায়, আমার এ কী হলো! কনা আমাকে আগেই ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তা বুঝি নি। সে বলত- আম্মু, নানা আমার সঙ্গে কেমন কেমন যেন করে। আমি বলতাম, নানা তো নাতনীর সঙ্গে ইয়ার্কি-দুষ্টামি করবেই। নানার সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা বলা হলে কিংবা বাড়িতে যাওয়ার কথা বলা হলে কনা যেতে চাইত না এবং বলত, নানা আমার সঙ্গে দুষ্টামি করে। কিন্তু মায়ের মনে তখন দুষ্টামির বাইরে ভিন্ন কিছু ভাবার সুযোগ হয় নি। এ কারণে মেয়ের কথায় পাত্তা দিতেন না কনার মা। এর পরিণাম আজ সবার সামনে। আজ সংসার সমুদ্রে পালভাঙা, মাস্তুলহারা এক নৌকার নাবিক কনা এবং তার মা।

পাঠক! এবার বুঝে এসেছে তো, কেন মাহরাম পুরুষ, ভাই-বোনে, নানা-নাতনীতে সময় সময় পর্দা করতে হয়? বুঝে আসছে তো 'মাহরামের সঙ্গে ব্যভিচারের অপরাধ অন্য নারীর সঙ্গে ব্যভিচারের অপরাধের চেয়ে জঘন্য' কথাটার তাৎপর্য? বুঝে আসছে তো অন্য নারীর সঙ্গে ব্যভিচারের গ্লানি আর মাহরামের সঙ্গে ব্যভিচারের ধিক্কারের পার্থক্য? দেখলেন তো, মাহরামের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে পরিচয়টা কতদিক থেকে এলোমেলো হয়ে যায়?

এবার আল্লাহর বিধানের সামনে নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করে বলুন- ইসলামের সব বিধান মনেপ্রাণে মেনে নাও তবে শান্তি।'

হীনস্বার্থের প্রলোভন

নারীদেহের প্রতি হীনচরিত্রের পুরুষের লোভ চিরদিনের। বৈধ-অবৈধ যে কোনও পন্থায় নারীদেহ পাওয়ার চেষ্টা এধরনের পুরুষের অন্যতম ধ্যান-জ্ঞান। যেন গুরুত্বপূর্ণ কর্মযজ্ঞ। তাই পুরুষমুখে শরীয়তের পক্ষ থেকে শক্তিশালী লাগাম পরিয়ে দেয়া হয়েছে। সীমানারক্ষী দেয়াল। যাকে আমরা পর্দা বা হিজাব বলে চিনে থাকি। জন্তুর মুখে টুলি না পরালে সে শস্যক্ষেতের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বারবার মুখ দেয় কৃষকের কষ্টের ফসলে। ধ্বংস করে কিছু, নিজের পেটে তোলে কিছু। একারণে কৃষক দেয় তার ক্ষেতের পাশে বেড়া আর পশুর মালিক দেয় পশুর মুখে বেড়া। পশু এতে যতই হাঁসফাঁস করুক না কেন এতেই কৃষক ও মালিকের নিরাপত্তা, শান্তি।

ঠিক তদ্রূপ মানুষের মধ্যেও একটা পশুসত্তা বাস করে। সেই পশুসত্তাটাকে যদি বেঁধে রাখা না হয়, তাহলে সে সমাজ-সংসারের সম্ভ্রমের মুখে হানা দিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে দেয়, অশান্তি ডেকে আনে। তাই শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে, নারীলোভী এসব লোকের হাত থেকে বাঁচতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। সেই চেষ্টা না করলে কী ক্ষতি হতে পারে, তা দেখুন নিচের ঘটনা দু'টি পাঠ করে।

ঘটনা : প্রাইভেট পড়ার সূত্রে পরিচয় হয় তুলি (ছদ্মনাম) ও আকন শিকদারের ছেলে পারভেজ শিকদারের মধ্যে। ঝিনাইদহ জেলার ফুলহারী গ্রামে তাদের বাস। দুইজনেই কলেজ শিক্ষার্থী। পরিচয়সূত্রে প্রেম। নতুন বন্ধনের উত্তেজনায় শিহরিত হন তুলি। প্রেম তার গভীরতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তিনি যত নিজেকে উজাড় করে দেন ভালোবাসার মানুষের মন জয় করার জন্য, তার ভালোবাসার মানুষটি ততই উন্মুখ হয়ে থাকে সুযোগ পাওয়ার লোভে। অবশেষে প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয়। পারভেজের বাসনা পূরণ হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়।

৯/৯/২০১০ইং তারিখে ঝিনাইদহের কন্যাদহ গ্রামে খালার বাড়ি বেড়াতে যান তুলি। বেড়ানো শেষে ২২ তারিখে রওয়ানা হন নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে। ভ্যানযোগে ভাটই বাজারে আসার পর সেখানে দেখা হয় পারভেজের বন্ধু মধুর সঙ্গে। বন্ধুর প্রেমিকা বলে মধু তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার কথা বলে ভ্যান থেকে নামিয়ে মোটরসাইকেলে তুলে নেয়। সরল বিশ্বাসে তার পিছনে চড়ে বসেন তুলি। কিছুক্ষণ পরেই তার বিশ্বাস ভাঙতে থাকে। মধু তাকে তাদের বাড়িতে না নিয়ে পারভেজদের বাড়িতে নিয়ে যায়। তুলি তখনও বুঝতে পারেন নি তার জন্য কী পরিণতি অপেক্ষা করছে। প্রেমিকের বাড়ি এ-ই তো! ভয়ের কী আছে? হয়ত এই ছিল তার ভাবনা।

কিন্তু পারভেজ ও তার অন্য বন্ধু রাসেল তার জন্য অপেক্ষা করছিল পশুসত্তার দানবীয় রূপ দেখানোর জন্য। আমি বলছিলাম

না, সমাজে কিছু মানুষ আছে, যাদের পশুসত্তার মুখে লাগাম পরানো নেই- তারা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে? পারভেজ-রাসেল আর মধুরা তো সেই শ্রেণীর পশুসত্তার অধিকারী মানুষ। তাদের দ্বারা সমাজের শান্তি নষ্ট তো হবেই এবং হলোও তা-ই। পারভেজ তার ভালোবাসার মানুষটির সম্ভ্রম লুট করল পশুর নির্লজ্জতা নিয়ে। একবারও তার অন্তর কেঁপে উঠল না একথা ভেবে যে, এই নারীটি তো আমাকে ভালোবাসে! আমাকে নিয়ে ভালো কিছুর স্বপ্ন দেখে! তার সম্ভ্রম রক্ষা করা আমার দায়িত্ব আর যদি ভালোবাসার মানুষ ভাবতে না পারিস, তাহলে অন্তত একথা কি ভাবতে পারলি না যে, মেয়েটি তো আমার বোনের মতোই, মায়ের মতোই। আমার বোন বা মায়ের সম্ভ্রম কেউ নষ্ট করতে চাইলে আমি কি তা মেনে নিতে পারবো?

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের কাছে অবিবাহিত যুবক এসে বললেন, তিনি অবৈধ পথে তার মনোবাসনা পূরণ করতে ইচ্ছুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, আচ্ছা তোমার বোন বা তোমার মায়ের সঙ্গে অন্য কোনও পুরুষ যদি এইভাবে মনোবাসনা পূরণ করতে চায়- তাহলে তুমি কি তা মেনে নেবে? জবাবে ওই যুবক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ আমার বোন বা মায়ের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকালে আমি তার ঘাড় থেকে ধড় নামিয়ে ফেলব। তখন তিনি বললেন, তোমার মা- বোনের বেলায় যেমন চাওনা কেউ তাদের দিকে এই দৃষ্টিতে তাকাক, অন্যের মা-বোনের বেলায়ও তোমার

দৃষ্টিভঙ্গি অনুরূপ হওয়া দরকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের কথা শুনে যুবকটি তাওবা করে অন্য নারীদেরকেও নিজের মা-বোনের মতো সম্মানের দৃষ্টিতে দেখার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফিরে গেলেন।

এতো হলো ওই যুবক যার মধ্যে অন্যের মা-বোনকে নিজের মা-বোনের মতো করে দেখার গুণ ছিল। কিন্তু আমাদের আলোচিত যুবকটির কাণ্ড দেখুন, সে ওই নারী যাকে ভালোবাসে বলে অভিনয় করেছিল, তার সম্ভ্রম শুধু সে-ই নষ্ট করল না, অন্য বন্ধুদেরকেও লেলিয়ে দিল এই কাজে। ঘটনা এখানেই শেষ হলে হয়ত বেঁচে যেতেন তুলি। কিন্তু এই নরপশুরা তাকে ততটুকুও বাঁচার অধিকারও দিল না। ‘ধর্ষণের স্বীকৃতি’ লাভের জন্য সেই দৃশ্য ভিডিও করে তাকে দেখিয়ে বলা হলো, আমরা যা করেছি, তা চুপচাপ মেনে নাও। কারো কাছে তা ফাঁস করবে না। করলে সকলকে তা দেখিয়ে বেড়াবো বলে দিলাম!

হতাশ, ক্ষুব্ধ আর সদ্য স্বপ্নভাঙা তুলি তাও মেনে নিয়েছিলেন। মুখ না খোলার বদৌলতেও যদি অবশিষ্ট সম্ভ্রমটুকু রক্ষা হয় তাও বা কম কী! কিন্তু তার সেই আশাটুকুও পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রতারকদের নির্মমতার আগুনে। তুলি কথা রাখলেও সেই প্রতারক, লম্পটরা কথা রাখে নি। দেড় মাস পরে তুলি যে তথ্য পান, তাতে তার মাথায় আকাশটাই ভেঙে পড়ে। বেশ কিছুদিন ধরে ঝিনাইদহ শহরে একটি মেয়ের ধর্ষণের ভিডিওচিত্র পুরুষদের মোবাইলের মেমোরির বিরাট একটা স্থান দখল করে আছে তা

শুনেছিলেন অনেকের কাছে। কিন্তু হতভাগা মেয়েটি কে তা জানা ছিল না। যখন জানলেন তখন নিজের কাছেই নিজের পরিচয় দিতে ঘৃণা হলো তার!

কলেজছাত্রী তুলির পরবর্তী অবস্থা কী হয়েছিল তা জানি না। আল্লাহ করুন তিনি যেন পর্দার আবৃতে এসে হারানো সম্ভ্রম ফিরে পাওয়ার কসরত করেন এবং তার যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে পারেন।

ঘটনা ২ : দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে মোবাইলপ্রেম। কতশত কথা ভালোবাসার মানুষকে ঘিরে! কত স্বপ্ন! কত আশা! কিন্তু আশার পালকগুলো একে একে ডানা থেকে খুলে পড়ল প্রেমিকের ভেতরের চেহারাটা দেখে। পাঁচটি বছরের ওপর দাঁড়িয়ে যে স্বপ্নটা বোনা হয়েছিল, সেই স্বপ্নটা সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। স্মীতা (ছদ্মনাম) থাকেন ঢাকার মিরপুরে। আর প্রেমিকা মো.আলীর পুত্র মাসুম ব্যাপারী। বাড়ি মুন্সিগঞ্জ পৌর এলাকায়। আধুনিক যুগে এতটুকু দূরত্ব নেহায়তই কম। তারপর আছে মোবাইল! তাই প্রেমের বন্ধন-বাঁধনে কোনও বাধা থাকে না। এভাবে প্রেম চলে তার নিজ গতিতে। দীর্ঘ পাঁচ বছর। কিন্তু এভাবে আর কত দিন? চাই সফল পরিণতি তথা বিয়ে।

বিয়ের প্রস্তাব উঠলে মাছুম তাকে ৯ই ডিসেম্বর ২০১০ইং নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ডেকে নিয়ে আসে। এখানে এলে সে তাকে কাশীরপুর এলাকায় মামার বাড়ি নিয়ে যায়। মামী তাকে যোগ্য সহায়তা করে। স্মীতাকে বিয়ে না করে মাসুম একাধিক বার

লাঞ্ছিত করে। পাঁচ বছরের প্রেমের ফসল ঘরে উঠায় সে দুইদিনে। এ কয়দিন সে তাকে নিয়মিত লাঞ্ছিত করে। কিন্তু বিয়ের পিঁড়িতে পা রাখার নাম করে না।

অবস্থা বেগতিক দেখে কৌশলে পালিয়ে আসে স্মীতা। প্রেমিকের চরিত্রে ভালোবাসার বদলে কেবলই কামনার আগুন। তাই সম্ভ্রমলুটের ইতিহাসকে দীর্ঘায়িত না করে কেটে পড়েন তিনি। ঢাকা মেডিকেলে পরীক্ষা করান এবং রিপোর্ট নিয়ে ধর্ষক প্রেমিকের বিরুদ্ধে মামলা করেন। [সূত্র : ইন্টারনেট তারিখ : ২৯/২/২০০৯ ইং]

পর্দাহীন শিক্ষা : শেষ সম্বল চোখের জল

ইসলাম সব সময় শিক্ষার কথা বলে। নারী-পুরুষের কোনও ভেদাভেদ নেই এখানে। শিক্ষার গুরুত্ব ইসলামে যেভাবে দেয়া হয়েছে, অন্য কোনও ধর্মেই সেভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

'ইলম অন্বেষণ করা (নারী-পুরুষ) সব মুসলিমের জন্য ফরয।' [ইবন মাজাহ্ : ২২৪]

তবে এই শিক্ষার পরিবেশ নিয়ে ইসলামের চিন্তা ও দৃষ্টিভিঙ্গ আলাদা। ইসলাম চায়, নারীরা একটা নিরাপদ পরিবেশে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। এমন পরিবেশে, যেখানে সম্ভ্রমখুনের দাঁতালো কোনও জানোয়ার প্রবেশ করতে পারে না। মানবজীবের আকৃতি ধারণকারী কোনও জন্তু তাদের গায়ে আঁচড় কাটতে পারে না। অবাধ মেলামেশা ও পর্দাহীনতার সুযোগে কোনও নারী কিংবা কোনও পুরুষ সম্ভ্রমলুটের শিকার হয় না।

ইসলামের এই চাওয়া, এই দাবি কি অযৌক্তিক? বাড়াবাড়ির কিছু? সাম্প্রতিক সমাজ এবং বর্তমান ঘটনাবলীই এসব প্রশ্নের যথাযথ জবাব। **আজ যেদিকে তাকাই**, সেদিকেই এমন এমন অভিজ্ঞতা আর দুর্যোগের ঘনঘটা পরিলক্ষিত হয়, যা ইসলামের এই চাওয়াকে অতি যৌক্তিক ও সামাজিক নিরাপত্তার সবচেয়ে উপযোগী বলে প্রমাণিত করে। ইসলামের চাওয়া যদি বাস্তবায়ন

করা হতো, তাহলে আজ আমাদের সামনে এসব ঘটনা ঘটত না, যা আমাদের সমাজ ও দেশের অবস্থাকে দিন দিন নাজুক করে তুলছে। আজ মাত্র ষোল বছরের একটি মেয়ে বেপর্দার সুযোগে সমবয়সী একজন ছেলের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে, মা বাবার সঙ্গে প্রতারণা করে সমাজ-সংসারে তাদের মুখে চুনকালি মেখে দিচ্ছে। এধরনের ঘটনা খুব কম ঘটছে কিংবা দুর্লভ- তা নয়। বরং অহরহ ঘটছে এসব ঘটনা। আর এসব অবুঝ কচি মেয়েদের সরলতার সুযোগে প্রেমিক নামের প্রতারকরা তাদের সম্ভ্রমের অমূল্য ধনটুকু কেড়ে নিচ্ছে দেদারছে। তাই ইসলামের কঠোরতার সমালোচনা না করে সমাজব্যবস্থার নাজুকতার দিকে তাকান। দেখুন দেশজুড়ে কী ঘটছে... আরেকটা ঘটনা বলি।

এবারের ঘটনার নির্মমতার শিকার চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার বাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়নের অজোবড়া গ্রামের নুরেসা খাতুন (১৬) নামের এক স্কুলছাত্রী। গত রবিবার সে মৃত্যুর এই নির্মম পেয়ালা পান করেছে। এই পেয়ালার সাকি তার কথিত প্রেমিক মাহবুব! মেয়েটির পরিবারের অভিযোগ, নুরেসার প্রেমিক মাহবুব পাশবিক নির্যাতন করে তাকে হত্যা করেছে। ঘটনার পর স্থানীয় এলাকাবাসী মাহবুব ও তার বন্ধু আজিমকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

এলাকাবাসী জানায়, বাঙ্গাবাড়ী ইউনিয়নের বেগুনবাড়ী গ্রামের মনিরুল ইসলামের মেয়ে স্থানীয় বিআইবি বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী নুরেসার সঙ্গে অজোবড়া গ্রামের আবদুল

ওয়াহাবের ছেলে মাহবুবের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাহবুব বাঙ্গাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র!

কী অদ্ভূত কাণ্ড দেখুন! মাত্র নবম শ্রেণীর একজন ছাত্র! সেও সমাজের পঙ্কিলতায় কীভাবে দু'পা ডুবিয়ে দিয়েছে! কী নিষ্ঠুরভাবে পদস্খলন হচ্ছে এসব অবুঝ কিশোরদের! যে বয়সে প্রেম-ভালোবাসা আর নারী সম্পর্কে ধারণা থাকারই কথা নয়, সেই বয়সেই সে জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তটা নিতে কার্পণ্য করছে না! কাঁচা বয়সের এসব তরুণরা অপরিপক্কতার কারণে ভয়ানক সব দুর্ঘটনা ঘটিয়ে সমাজব্যবস্থাকে অস্থির, বেচাইন করে তুলছে।

আর বালিকাদের অবস্থাও দেখুন। নুরেসার বয়স মাত্র ষোল। এদেশের অদ্ভুত আইন অনুযায়ী এই বয়সের একটা মেয়ে সাবালিকাই নয়। সেই বয়সেই সে কী না করছে! প্রেম করছে, পরিণামের কথা না ভেবে প্রেমিকার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। আর শেষ পর্যন্ত মুখে বিষ নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে! নুরেসার পুরো ঘটনাটা এরূপ :

রোববার বিকেলে নুরেসা প্রাইভেট পড়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়ে অজোবাড়া গ্রামে যায় মাহবুবের সঙ্গে দেখা করতে। ওই গ্রামে মাহবুবের বন্ধু আজিমের বাড়িতে তারা দীর্ঘক্ষণ একসঙ্গে কাটায়। হঠাৎ করে মাহবুব ও আজিম স্থানীয় এলাকাবাসীকে জানায়, নুরেসা বিষপান করেছে। গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার সময় সে মারা যায়।

নুরেসা বেগমের মা নাসিমা বেগম অভিযোগ করেছেন, মাহবুব ও তার বন্ধুরা গণধর্ষণের পর নুরেসাকে হত্যা করেছে। তিনি বলেন, ঘটনার পর মাহবুব তাকে ফোন করেছে। নুরেসার শরীরে ধর্ষণের বিভিন্ন আলামত থাকায় তিনি নিশ্চিত তাকে পাশবিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ২/১২/২০১০ ইং]

তো যে তরুণী বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী শিশু- এই বয়সেই প্রেম মদিরায় ডুবে যায়, সে কি কখনও ভেবেছিল এই পিচ্ছিল পথে পা ফেলার অশুভ পরিণামের কথা? তার শিক্ষা কী তাকে এই পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল কখনও? প্রচলিত শিক্ষা কি শুধু জাগতিক জাগ্রনেই সীমাবদ্ধ ছিল না? যে শিক্ষা একজন তরুণীর পদক্ষেপ গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারে না, সেই শিক্ষা পুরো জাতিকে কতদূর নিয়ে যেতে পারবে? যে শিক্ষা তাকে এই ঘটিত বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারত, সেই শিক্ষা, সেই ইসলামী আদর্শ ও পর্দা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কেন এতো সংগ্রাম, বিদ্রোহ?

আল্লাহয়ী বিধান ও পর্দাপালন ছাড়া কোনও নারীর মুক্তি নেই। নুরেসাদের নির্মম পরিণতির অশ্রুসজল কাহিনী আমাদেরকে যেমনিভাবে ব্যথিত করে, তেমনি শিক্ষাও দিয়ে যায়। কিন্তু আমরা শিক্ষা নিই না; বরং শিক্ষার পথকে কর্দমাক্ত করি।

বোন নুরেসা! যে বয়সে আইন (দেশীয়) তোমাকে সাবালিকা বলেই স্বীকার করে না, সেই বয়সে তুমি এমন খেলা কেন খেলতে

গেলে যার জন্য সারা জীবন তোমার বিদেহী আত্মা তোমাকে ভর্ৎসনা করবে? যখন সমাজের প্রতারক প্রেমিকদের না চিনে ডেটিং করতে গিয়েছো, তখন কি একবারও ভেবেছ তোমার পারিবারিক মর্যাদার কথা? এই পাপযাত্রার সময় একবারের জন্যও কি মনে হয়নি তোমার মা বাবার কথা? কিংবা তোমার নিজের কথা? সৃষ্টিকর্তা তোমাকে যে মহামূল্যবান আমানত দান করেছেন, সেই আমানতের মর্যাদা রক্ষার কথাও কি মনে হয়নি অন্তত একবার? তুমি গ্লানী আর লাঞ্ছনাকে সঙ্গী করে পরপারের বাসিন্দা হয়েছো, কিন্তু তুমি তোমার মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনের জন্য কী রেখে গেছো? চোখের পানিই কী একজন সন্তানের কাছে মা-বাবার একমাত্র প্রাপ্য!

মা-বাবা কী চোখের পানির জন্য সন্তান জন্ম দেয়? কিংবা কোনও বাবা কি চায় পৃথিবীর সবচে’ ভারি বোঝা- সন্তানের লাশটা- কাঁধে তুলতে? কবে হবে এসব সমস্যার সমাধান? কবে নাগাদ আমরা পাবো এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর?

যেদিন আমরা আল্লাহর বিধান আঁকড়ে ধরব, পর্দার মধ্যে আমাদের নারী সমাজের মর্যাদা ঢেকে রাখবো, কেবল সেদিনই মিলবে এসব প্রশ্নের উত্তর।

বিষোপঢৌকন

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اَنْ لاَ تَفْعَلُوْهُ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ عَرِيْضَةٌ فِى الاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ

'তোমাদের নিকট কেউ বিয়ের পয়গাম দিলে তার দ্বীন ও চরিত্র যদি পছন্দনীয় হয়, তাহলে তার সঙ্গে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তা না করো, তাহলে জমিনে ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে এবং দীর্ঘস্থায়ী ফাসাদের কারণে সমাজে অশান্তি দেখা দেবে।' [তিরমিযী : ১০৮৪]

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا عَلِيُّ ثَلٰثٌ لاَ تُؤَخِّرْهَا اَلصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالاَيْمُ اِذَا وُجِدَتْ لَهَا كُفُوٌ

(আমাকে উদ্দেশ্য করে) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হে আলী! তিনটি কাজে কখনও বিলম্ব করবে না। এক. সালাতের সময় হলে তা আদায় করা। দুই. লাশ উপস্থিত হলে জানাযার সালাত। তিন. উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী পেলে বিয়ে দেয়া। [তিরমিযী : ১/৪৩]

আল্লাহর এই বিধান সকলের জন্যই পালনীয় ও নিরাপদ। একজন পুরুষের জন্য যেমন নারীর প্রয়োজন, তেমনি একজন নারীর জন্যও একজন পুরুষ প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজন পূরণের জনই বিয়ে। অতএব, উপযুক্ত পাত্র কিংবা পাত্রী পাওয়া গেলে

বিলম্ব না করে এই জরুরী চাহিদা পূরণ করা একটি নিরাপদ পন্থা। অবশ্য উপযুক্ততার ক্ষেত্রে দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তো উপযুক্ত পাত্র কিংবা পাত্রীর ব্যবস্থা হওয়ার পর বিয়েতে বিলম্ব করা উচিত নয়। এই বিধানে ব্যত্যয় ঘটলে জীবনে আসবে লাঞ্ছনা, ব্যর্থতা আর গ্লানি। শেষে চরম পরাজয়। এবারের ঘটনাটা এই বিধান লঙ্ঘনের পরিণতি ও পরিণাম সম্পর্কে। পড়ুন নিচের ঘটনাটি :

১৯৯৮ইং সালে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে প্রথম ঢাকায় আসা। মিরপুরের এক বিখ্যাত মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া। সে বছর নবীনদের মধ্যে ছিলেন আজকের ঘটনার নায়ক, মুখলিস ভাইও। আমি সিরাজগঞ্জের আর তিনি টাঙ্গাইলের। আমরা দুইজনেই নবীন। মুখলিস ভাই এক সময় সিরাজগঞ্জের এক মাদরাসায়ও লেখাপড়া করেছেন বেশ কিছুদিন। তাই আমার সঙ্গে বেশ সম্পর্ক হলো তার। দেখতে সুদর্শন, যাকে বলে হ্যান্ডসাম। মেধাও কম নয়। প্রথম থেকেই তা বোঝা গেল। ক্লাশে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করা নিয়ে ব্যঘ্র-সিংহের যে লড়াই হয়, তাতে তিনি ছিলেন আমার নিয়মিত প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য আল্লাহর ফযলে আমিই আগে থেকেছি সব সময়। শোকর আল্লাহর! আমি অনুমতি নিয়েই তার জীবনের ঘটনাটি লিখছি। এবার আসল কথায় আসি।

আমরা প্রায় তিন বছর সহপাঠী ছিলাম। তিন বছর একসঙ্গে লেখাপড়া করার পর তিনি লালবাগের এক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। তখন থেকে বেশ কিছুদিন যোগাযোগ বন্ধ। এরপর লালবাগ থেকে

চলে এলেন তেজগাঁওয়ে। ভর্তি হলেন নতুন এক প্রতিষ্ঠানে। এখান থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। একটি অসুস্থতা বিরাট এক ঘটনার জন্ম দিল। তিনি কানের সমস্যায় ভুগছিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অপারেশন করার পরামর্শ দিলেন। অপারেশনের জন্য ভর্তি হলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে।

সময়মতো অপারেশন করা হলো। যে ডাক্তার অপারেশন করলেন, তার বোন তখন নার্সিং প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। নাম সানজিদা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত মেজর। বিপুল বৈভব। উত্তরায় সাততলা বাড়ির মালিক। ব্যবসা-বাণিজ্য সুপ্রসারিত। পিতার এই অপরিমিত সম্পত্তিতে অংশীদার মাত্র সানজিদা আর তার একমাত্র ভাই।

সানজিদা মুখলিস ভাইয়ের প্রেমে পড়লেন। বড় অদ্ভুত কারণে! রোগীর দেহে ইনজেকশন পুশ করলে দেখা গেল মুহূর্তের মধ্যে দেহ থেকে রক্ত ইনজেকশনের সুঁইয়ের মধ্যে উঠে আসছে। ব্যস, সুঠাম ও সুদর্শন একটা মানুষের দেহের এমন অবাক ব্যাপার সানজিদার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। তিনি রোগীর প্রেমে পড়ে গেলেন! শুরু হলো লুকোচুরি খেলা। গোপনে রোগীর গতিবিধি খেয়াল রাখতেন তিনি, রোগী কী করে গভীরভাবে তা পর্যবেক্ষণ করতেন কেবলই মনের টানে।

সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে চলে এলেন মুখলিস ভাই। বিদায়ক্ষণে সানজিদা উপস্থিত ছিলেন না। হাসপাতালে এসে রোগীকে দেখতে না পেয়ে মনটা আকাশসম শূন্যতায় হাহাকার করে উঠল তার। এরপর কী করতে হবে নিমিষেই তা ঠিক করে ফেললেন তিনি।

ক্লাস করছেন মুখলিস ভাই। অপ্রত্যাশিতভাবে দারোয়ান এসে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, একজন মহিলা আপনাকে খুঁজছে।

সহপাঠী ও শিক্ষকের সামনে হকচকিয়ে গেলেন মুখলিস ভাই। ঢাকার তার কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই। বাড়ি থেকেও কোনও মহিলা আসবে এমন সম্ভাবনা উত্তর আকাশে চাঁদ উদিত হওয়ার মতোই অসম্ভব ব্যাপার। তাই অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালেন দারোয়ানের দিকে। কিন্তু দারোয়ান তাকে তাড়া দিয়ে বলল, মহিলাটি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে!

শিক্ষক অনুমতি দিলেন। ধীরপায়ে অতিথির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন মুখলিস ভাই। গেটে এসে বড্ড অবাক হলেন তিনি। প্রাইভেট কার নিয়ে অপেক্ষা করছেন সানজিদা! কী জন্য এসেছেন তা ঠাওর করতে পারলেন না মুখলিস ভাই। ডাক্তার তো কখনও পাওনা ছাড়া রোগীর বাড়িতে আসে না! এ ধরনের কোনও হিসাব আছে কিনা সানজিদার সঙ্গে, তাও মনে মনে ভেবে নিলেন তিনি। কিন্তু এখানেও হিসাব মিলানো গেল না। অগত্যা আগন্তুকের মুখেই আগমনের হেতু জানার জন্য অপেক্ষা করতে হলো তাকে।

আগন্তুকের সম্বোধন আর ভাষার অভিমান দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মুখলিস ভাই। অভিভূত হবেন, না শিহরিত হবেন, না পায়ের তলা থেকে রাস্তার পিচগুলো সরে যাচ্ছে তা পরখ করবেন, এর কোনোটাই ঠাহর করতে পারলেন না। সানজিদার অভিমান মেশানো অভিযোগ, তাকে না বলে হাসপাতাল থেকে চলে আসা হলো কেন? এতে তিনি ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন! এরপর

ভাইয়ের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে অনেক কষ্টে এখানে আসতে হয়েছে! তার অভিমানের জবাবী ভাষা মুখে এল না তার। মনের অজান্তে কেবল গোটা শরীরটা একবার শিহরিত হলো।

এরপর থেকে শুরু হলো দুজনের এক রেখায় পথচলা। উত্তরা থেকে নিজে ড্রাইভ করে সানজিদা দেখতে আসতেন মুখলিস ভাইকে। ভালোবাসার মানুষের জন্য গাড়িতে করে নিয়ে আসতেন মায়ের হাতের তৈরি নানারকম সুস্বাদু খাবার। শুধু দেখতে আসা নয়, মা-বাবার সম্মতিতে তাকে বাড়িতেও নিয়ে যান সানজিদা।

মা-বাবার আদরের কন্যা সানজিদা। তাই তারা কন্যার মতের বাইরে যান না। তাদের এক কথা, মেয়ে যাকে নিয়ে সুখে থাকবে বলে মনে করে, তাকেই তারা বিনাবাক্যে মেনে নেবেন। তাছাড়া মুখলিস ভাইয়ের দসাসই চেহারা তাদের ও সানজিদার বান্ধবীদেরকেও মুগ্ধ করে। তাই সানজিদার উৎসাহ বহুগুণে বেড়ে যায়।

মুখলিস ভাই এখন উত্তরায় মেজর সাহেবের পরিবারের নিয়মিত সদস্য। সানজিদার মা তাকে পুত্রবত স্নেহ করেন। বাবা ছাড়া মুখে সম্বোধনই রোচে না। মধুর হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে সানজিদা-মুখলিসের মনের আদান-প্রদান এগিয়ে চলে। মুখলিস ভাইয়ের পড়াশোনা পাঠ এখনও চুকেনি। তার সহপাঠী ও শিক্ষকরাও জানে তার এই ব্যাপারটি। অনেকে তাকে দেখে ঈর্ষা করে। এমন বড়লোক ঘরের সুন্দরী মেয়ে তার বধূ হতে যাচ্ছে, ঈর্ষাকাতর হওয়ার মতোই ব্যাপার বটে!

এরই মধ্যে সানজিদা মুখলিস ভাইকে নিয়ে তাদের গ্রামের বাড়ি নাটোর বেরিয়ে এসেছেন। প্রাইভেটকারযোগে সানজিদা, তার ভাই এবং ভাইয়ের হবু স্ত্রী আর মুখলিস ভাই এই চারজন মিলে চলতো এই সফর। সফরের সময় মুখলিস ভাইয়ের পকেটে হাজার হাজার টাকা ঢুকিয়ে দিতেন সানজিদার মা তথা মুখলিস ভাইয়ের ভাবি শাশুড়ী। এমন সব ভালোবাসা আর স্নেহসিক্ত মধুর পরিবেশের মধ্য দিয়ে দিনগুজরান হচ্ছিল মুখলিস-সানজিদার।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আমি এর কিছুই জানতাম না। অপারেশন করার পর তাকে দেখতে গিয়ে শুনলাম এসব ঘটনা। পুরান ইতিহাসের সঙ্গে নতুন ইতিহাস যোগ করে মুখলিস ভাই বললেন, বর্তমানে সম্পর্ক স্থগিত আছে। কারণটা সঙ্গত। কাহিনীটা এই :

আর্থিকভাবে মুখলিস ভাই বেশ দুর্বল। তাই বিয়ের প্রশ্নে সানজিদাদের পরিবার থেকে আপত্তি থাকার কথা থাকলেও আপত্তি উঠলো মুখলিসের পরিবার থেকে। তারা সংসারসমুদ্রের ছোট্ট ডিঙির মাঝি হয়ে এতো বড় জাহাজের নাবিক হবেন কী করে? তাই তাদের সন্দেহ দূর হয় না। মনে হয় এ এক কল্পজগত। ঘুমের মধ্যে তাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়ে চলেছে সানজিদার পরিবার!

কিন্তু তা স্বপ্নজগতের কোনও ঘটনা ছিল না**। এ ছিল বাস্তবজীবনের এক প্রেমনাট্য। তবু মুখলিসের বড় ভাই সম্পর্কের গভীরতা যাচাই করতে চাইলেন। বিয়ে প্রায় পাকাপাকি। কথা ছিল বিয়ের পর মুখলিস ভাই সানজিদাদের বাড়ির সামনের প্রায় এক বিঘা খালি**

জায়গা আছে, তাতে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। তার ভাই সেই কথাটা তুললেন। বললেন, বিয়ের আগে কথাটি পুনরায় পাকাপাকি করে নাও এবং জায়গাটা আগে ওয়াক্ফ করে দিতে বলো তাদেরকে।

কথাটা সানজিদার পরিবারকে জানালেন মুখলিস ভাই। সানজিদার পরিবারের লোকেরা কথাটা শুনে মর্মাহত হলেন। তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল এতে। বিশেষ করে সানজিদার মামা মারাত্মক ক্ষিপ্ত ও আহত হলেন। আমাদেরকে অবিশ্বাস! তার মুখে ছিল কেবল এই একটিমাত্র বাক্য। মনা কষাকষি থেকে সম্পর্কের পতন এবং বর্তমানে তা স্থগিত।

শেষের কাহিনী শুনে ব্যথিত হলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন আরেক সহপাঠী। তার নামও মুখলিস। মোমেনশাহী বাড়ি তার। দুজনে চোখে চোখ রেখে কথা সেরে নিলাম। মুখলিস ভাই কথাপ্রসঙ্গে যতটুকু ঠিকানা বলেছিলেন, তাকেই সম্বল বানিয়ে আমরা রাস্তায় নেমে পড়লাম। দিনটি ছিল ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৫ইং সালের বৃহস্পতিবার। বিজয় দিবসের সরকারী ছুটি থাকায় আমরা ছুটলাম উত্তরার দিকে। উদ্দেশ্য সানজিদাদের বাড়ি খুঁজে বের করে তাদের মধ্যকর অভিমান ভাঙানোর চেষ্টা করা। আধাপাকা আধাকাঁচা ঠিকানা- সাততলা সাদা বিল্ডিং, অবসরপ্রাপ্ত মেজর এতটুকু পরিচয় সম্বল করে আমরা দুজন নিকুঞ্জ থেকে শুরু করে উত্তরা পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুজি করলাম। কিন্তু ব্যর্থ হলাম। নিরাশ হয়ে একবার মুখলিস ভাইকে ফোনও দেয়া হলো কৌশলে পুরো

ঠিকানাটা নেয়ার জন্য। কিন্তু তিনি হয়ত চান নি আমরা ঠিকানা উদ্ধার করে কিছু একটা করি। তাই আমাদের উদ্দেশ্য টের পেয়ে ঠিকানা দেয়া থেকে বিরত থাকলেন, তথ্য দিলেন না। আমরা সারাদিন খোঁজাখুঁজি করে ক্লান্তি আর ফলাফল শূন্যতাকে সঙ্গী করে নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলাম।

সানজিদার মামা বা তার পরিবারের লোকেরা সহজেই বিয়ের আয়োজন নাকচ করে দিতে পারলেও দুজন যুবক-যুবতীর মনের আদান-প্রদান তো আর বন্ধ রাখতে পারেন না। তাই আমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেও প্রেম তার আপন পথে ঠিক-ঠিক মতোই ধাবমান হলো পুনরায়। আবার সম্পর্কের পুনস্থাপন হলো। হৃদ্যতা হলো আগের মতোই। কারণ, সানজিদার মানসিকতা দেখে তার বাবা-মা সিদ্ধান্ত নিলেন, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে তারা তাদের মেয়ের মন ভাঙবেন না।

তাই সঙ্গত কারণেই বিয়ের কথাটা আবার উঠল। তবে সানজিদার বিয়ের আগে তার বড় ভাইয়ের বিয়ের আয়োজনটা তারা সম্পন্ন করতে চাইলেন। পাত্রী আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। তার মামাতো বোন। সেও কোটিপতির মেয়ে। বাবা গুলশানের বিশাল মার্কেট আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। মহা ধুমধামের সঙ্গে আয়োজন করা হলো বিয়ের। দাওয়াত পড়ল মুখলিস ভাইয়েরও। এত বড় আয়োজনে তিনি কী আর সাধারণভাবে শরীক হতে পারেন! তাছাড়া কিছুদিন পর যেখানে তাকেও বরবেশে যেতে হবে! তাই তিনি তার সাধ্যের বাইরে গিয়েও অনেক কিছু

করলেন। প্রাইভেটকার ভাড়া করলেন। মূল্যবান গিফ্ট ক্রয় করলেন এবং বিয়ের দিন সানজিদাদের বিয়ে বাড়িতে হাজির হলেন।

বিয়ে বাড়িতে হাজির হয়ে তিনি যা ভেবেছিলেন, দেখলেন তার চেয়ে অনেক বেশি আড়ম্বরতা। সানজিদাদের পারিবারিক স্ট্যাটাস এত সমৃদ্ধ যে, তা মুখলিস ভাইয়ের ভীতির কারণ হয়ে গেল। ঢাকার বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যবসায়ী আর এক নামে চেনা প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই শুধু অতিথি নন, বাঘা বাঘা যত মন্ত্রী-মিনিস্টার আছেন তারাও আজকের বিয়ের অতিথি! এত রথ-মহারথীর মধ্যে কুচকে গেলেন মুখলিস ভাই। পার্থিব সম্পদের বিচারে এই বিত্তশালীদের মহাসমুদ্রে তাকে ছোট্ট একটি পুসকরনির মতো ক্ষুদ্র বলে মনে হলো। তিনি তৎক্ষণাত সিদ্ধান্ত বদলে ফেললেন। মন চালাচালির জগত থেকে ফিরে এলেন বাস্তবতার জগতে। ইশারা-ইঙ্গিতে কথাটা জানালেন সানজিদাকে। কিন্তু সানজিদা প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখলিস ভাইয়ের অর্থবিত্ত দেখবেন না। অর্থবিত্ত তো আর তার কম নেই। বাবার সম্পত্তির বৃহৎ অংশটাই তার জন্য লিখে দেয়া আছে। তার ভাই তাতে মোটেই আপত্তি করেননি। বরং একমাত্র ছোটবোনকে খুশি রাখতে তিনিও সব দাবি ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত।

তাই মুখলিস ভাইয়ের আশঙ্কা বা তার নারাজির কথা কানে তুললেন না সানজিদা। এক্ষেত্রে ঘটল উল্টো ঘটনা। মানুষ যেখানে

বিত্তশালীকে ম্যানেজ করে সেক্ষেত্রে বিত্তশালীই বিত্তহীনকে ম্যানেজ করতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু মুখলিস ভাইকে আমরা দেখেছি, তার মধ্যে একরোখা ভাব আছে অনেকটা। কোনও কিছুর সিদ্ধান্ত নিলে তা থেকে টলানো বেশ মুশকিলই বটে। তার এই স্বভাবের বলি হলেন সানজিদা। এতে কপাল পুড়ল তার, যিনি অনেক ভালোবেসেছিলেন তাকে।

আমরা প্রথম থেকেই মুখলিস ভাইকে বলে এসেছি, এটা কোনও শর'ঈ কাজ নয়। দুইজন বেগানা নারীপুরুষের এভাবে সম্পর্ক দীর্ঘায়িত করা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। যেহেতু বিয়ের কথা হচ্ছে আর তারাও পারিবারিকভাবে রাজি, তাই বিলম্ব না করে কাজটা সম্পন্ন করে ফেলুন। অন্তত শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন হওয়ার হাত থেকে তো বাঁচা গেলো!

কিন্তু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, বিলম্ব হতেই থাকল। এক পর্যায়ে আমরাও সৎ পরামর্শ দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেলাম। তাছাড়া ব্যস্ততার কারণে যোগাযোগও কমে এলো। দূর থেকেই শুনতে পেলাম, তিনি বিয়ের জন্য অন্যত্র পাত্রী খুঁজছেন! মনে মনে দুঃখ হলো সানজিদার জন্য। ভাবতেই হলো যে, প্রেম-ভালোবাসা, বেপর্দা আর গাঁটছাড়া জিনিসের পরিণতি সুখকর হয় না। **কোনও না কোনও দিক থেকে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেই। হয়ত এসব ক্ষেত্রে** আল্লাহর রেজামন্দী থাকে না বলেই এমন হয়!

মুখলিস ভাই সানজিদার পরিবারে বিষয়টি কিভাবে তুলে ধরেছিলেন, তা বলতে পারি না। কিন্তু সানজিদা বেচারী যে তাতে নিদারুণ শোক পেয়েছিলেন তা কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারি। কারণ, মুখলিস ভাইয়ের ভাষ্যমতে সানজিদা সত্যিকার অর্থেই মুখলিসকে মন থেকে অনেক ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু শুধু আর্থিক ও সামাজিক তারতম্যের ভয়ে মুখলিস ভাই তার মনের চাওয়া আর ভালোবাসার মূল্য দিলেন না। তার এই এড়িয়ে চলার সময়টাতে সানজিদা একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল। বড়লোকের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও কখনও প্রেমে পড়েননি তিনি। জীবনের প্রথম প্রেমের শকড্টা তাই মানসিক শক্তির মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙে দিয়েছিল তার।

দিন গড়িয়ে চলল আপন গতিতে। একদিন সংবাদ পেলাম মুখলিস ভাই বিয়ে করেছেন। টাঙ্গাইলের এক কলেজ ছাত্রী তার নববধূ! সংবাদটা শুনে বেশ খারাপ লাগল।

এরও অনেক পরের ঘটনা। বহুদিন হয় মুখলিস ভাইয়ের সঙ্গে দেখা নাই। সময় করে একদিন তার কর্মক্ষেত্র তেজগাঁওয়ে গেলাম। পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে আরেক বন্ধুর দীর্ঘ বিরতির পর দেখা। তাই আবেগ, উচ্ছ্বাস আর সুখ-দুঃখের অনেক কথা হলো। আপ্যায়নপর্ব শেষ হলে বিদায় চাইলাম তার কাছে। তিনি আমাকে বিদায় জানাতে ফার্মগেট পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। আমি কখনও সেই সময় এবং ফার্মগেটের ভাসানী নভোথিয়েটারের দিকের প্রথম ওভারব্রিজটার গোড়ার স্থানটা ভুলতে পারব না। এতক্ষণ পর্যন্ত

তার বর্তমান জীবন সম্পর্কে আলোচনা চললেও কী মনে করে যেন সানজিদার কথাটা মনে পড়ল আমার। আচম্বিত প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, সানজিদার কী খবর? তিনি কেমন আছেন? কোথায় আছেন?

মুখলিস ভাই উত্তরে যা বললেন, তাতে মনে হলে তিনি আমার ঘনিষ্ঠ কোনও বন্ধু নন, চক্ষশূল! তিনি নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, সে তো চলে গেছে!

-মানে! আতঙ্কিত কণ্ঠে বললাম আমি।

- সে পরপারের বাসিন্দা হয়েছে।

- কী ভাবে? কবে? এক সঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম আমি।

আমি কখনই ভুলতে পারবে না ঔ সময় ও স্থানটার কথা, যেখানে ও যে সময়ে একটা বিদেহী আত্মার করুণ পরিণতির কথা শোনানো হয়েছিল আমাকে। আমার প্রশ্নের জবাবে মুখলিস ভাই যা জানালেন, তাতে আমি কিছুক্ষণের জন্য নিজের পরিচয়টা ভুলে যেতে চাইলাম। আট বছরের বন্ধুত্ব ক্রোধে পরিণত হয়ে যেন হাতের মুঠোয় এসে জড়ো হলো কোনও অশুভ ইচ্ছায়। মনে হলো, এখনই তার উপর হামলে পড়ব আমি, ক্রোধে, ক্ষোভে ও উত্তেজনায়। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে আমি দ্রুত তার সামনে থেকে সরে এলাম। গাড়িতে চেপে সিটে বসে মাথা ধরে বসে থাকলাম। যুগপৎ তিনটি জিনিস আমার মাথায় চক্কর দিতে লাগল।

১ .হাদীসের বাণী, যা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমরা মুখলিস ভাইকে বারবার তাগিদ দিয়েছিলাম বিয়ের কাজটা দ্রুত সেরে নিতে।
২. সানজিদার নিখাঁদ ভালোবাসা, যদিও তা শর'ঈ গন্ডির মধ্যে ছিল না।
৩. মুখলিস ভাইয়ের 'কপটতা' ও নির্বুদ্ধিতা।
শেষের ব্যাপারটি আমি সারা রাস্তায় ভাবতে থাকলাম। যে তোমাকে মন উজাড় করে ভালোবাসা দিয়েছে, শেষ দিন পর্যন্ত তোমাকে পাওয়ার অপেক্ষা করেছে, বিত্তবৈভবের কথা চিন্তা না করে তোমার মতো দরিদ্র একজন ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে চেয়েছে, যার বাবা-মা তাদের কন্যার সুখচিন্তা না করে তোমাকে পুত্রের মতো স্নেহ দিয়েছেন, কোনও দিন যারা তোমার সম্পদের কথা জিজ্ঞেস করেন নি- দেখেছেন শুধু তোমাকে, তুমি তোমার প্রস্তাব থেকে সরে আসার পর মেয়ের মরা মন দেখে যাদের পিতৃত্ব আর মাতৃত্বের সাগরে বেদনার ঢেউ উছলে ওঠায় তোমাকে বারবার অনুরোধ করেছেন তোমার অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে, শুধু বিশ্বাসের জোরে আত্মীয়তার বন্ধনটা কায়েম করতে, যারা তোমার এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে বারবার তাদের ও সানজিদার উপর আস্থা রাখার অনুরোধ করেছেন, তারা কখনই সম্পদের প্রশ্ন তুলবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তারা সে ধরনের মানুষ নন বলে আস্থা দিয়েছেন, যে ডাক্তার ভাইটা তোমাকে চিকিৎসা দিয়েছিলেন, সেই ভাইটা চিকিৎসা সেবার পর্যন্ত দোহাই দিয়ে তোমাকে তোমার মত

প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়েছেন, একমাত্র বোনটাকে যিনি এত ভালোবাসেন, সেই বোনের শুষ্ক মুখ দেখে যিনি তোমাকে এতো করে অনুরোধ করেছেন, যে মেয়েটি তোমাকে না পেলে কোনও দিনও বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, তোমার আশঙ্কাকে অসত্য প্রমাণ করার সুযোগ দেয়ার জন্য যে মেয়েটি আকুতি জানিয়েছে, একটা পরিবারের সবাই একাট্রা হয়ে এতো করে তোমাকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তুমি তাদের কারো কথা রাখোনি, মূল্য দাও নি তোমার কাছের মানুষটির আত্মার আহ্বানকে। তাহলে সেই বাড়িতে নতুন বিয়ে করে তোমাকে মিষ্টি নিয়ে যেতে বলেছিল কে? এতো সানজিদার জন্য মিষ্টি ছিল না, ছিল বিষ! একটা প্রত্যাখ্যাত মেয়ে কী করে বরদাশত করতে পারে এমন উৎকট তামাশা?

যাহোক, মুখলিস ভাই বিয়ে করে মিষ্টিমুখ করানোর জন্য মিষ্টি নিয়ে সানজিদাদের বাড়িতে হাজির হলেন। সানজিদার পরিবার সৌজন্যের খাতিরে তাকে হাসিমুখেই বরণ করলেন। কিন্তু একজনের মুখে হাসি ছিল না। তিনি সানজিদা।

এর দিন দুয়েক পর। বিছানা ছাড়ার সময় হয়ে এলো। কিন্তু সানজিদার ওঠার নাম নেই। রাতে কি মেয়েটা কম ঘুমিয়েছে, নাকি সে এখনও বিছানা ছাড়ছে না? মা নিজেই প্রশ্ন করেন নিজেকে। আরও বেশ কিছুক্ষণ গড়ালো। তবু ওঠার নাম নেই। এখন আর মা নিঃসঙ্কোচ থাকতে পারলেন না। ঘরের বাইরে থেকে মৃদ করে ডাক দিলেন মেয়েকে। কিন্তু তবু সাড়া নেই।

আরো জোরে ধাক্কা দিলেন। ধাক্কার জোর যত বাড়ে স্নেহময়ী মায়ের শঙ্কা ততই বাড়ে। ভেতর থেকে কোনও শব্দ না পেয়ে এক সময় বাড়ির সবাই আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন। দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলেন। বিছানায় সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন সানজিদা। দরজা ভাঙা, ডাকাডাকি কোনো কিছুর শব্দই তার কানে পড়ছে না! সর্বপ্রথম গর্ভধারিনী মা মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেহটা শক্ত হয়ে গেছে। সুশ্রী মুখটা বিষের প্রভাবে কালো হয়ে আছে! পাশেই একটা চিরকুট পড়ে আছে- 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। ও যেন ভালো ও সুখে থাকে।'

হায় বন্ধু! মৃত্যুর সময়ে যে তোমার কল্যাণ কামনা করে গেল, তার ভালোর জন্য কি তুমি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর বাণীর ওপর আমল করতে পারলে না? যদি প্রেম-প্রীতিকে দীর্ঘায়িত না করে হাদীসটার ওপর আমল করতে, তাহলে কি আজ সানজিদার মা কন্যাকে হারিয়ে পাগল হয়ে যেতেন?

এ প্রশ্ন শুধু তোমাকে নয়, পৃথিবীর সব মানুষের সামনে তুলে ধরছি। কেউ যেন শরীয়তের ওপর আমল ছেড়ে দিয়ে এমন কোনও কাজ না করে যার কারণে মায়েদের বুক খালি হয়, পিতা সন্তানহারা হন, ভাই বোনহারা কিংবা বোন ভাইহারা হন।

বোন সানজিদা! আত্মহত্যা কঠিন অপরাধ। হয়ত তুমি নিজেও তা জানতে। কিন্তু ব্যর্থতার বেদনা তোমাকে পৃথিবীর এই কঠিনতম পথে পা মাড়াতে বাধ্য করেছে। তবে কথা কী, পৃথিবীর সব

প্রেমের ব্যর্থতা আর গ্লানি মিলেও একটা আত্মহত্যার পাপের সমান হয় না। তারপরেও তোমার আত্মার শান্তি কামনা করি আমি। কারণ, একমাত্র কুফর অবস্থায় মৃত্যু ছাড়া যে কোনও অবস্থার মৃত্যুতে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা যায়। দু'আ করি, আল্লাহ যেন তোমার এই জগতের অপরাধ ক্ষমা করে ওই জগতে শান্তিতে রাখেন।

আর হ্যাঁ, আমার নিজেরও মাঝে-মধ্যে অনুশোচনা হয়। আফসোস হয়, যদি আমি সেদিন উত্তরার প্রতিটি 'সাততলা সাদা বিল্ডিং' খুঁজে বেড়াতাম। যদি দমে না যেতাম ঠিকানাহীন বাড়ি খোঁজার কাজে! আমার বিশ্বাস, আমরা একটা সুরাহা করতে পারতাম। ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে আমল করাতে পারতাম আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর হাদীস অনুযায়ী- 'হে আলী! যখন কোনও উপযুক্ত পাত্রী অথবা পাত্র পাওয়া যায়, তখন যেন বিয়েতে বিলম্ব করা না হয়।'

তাহলে আজ হয়ত তোমাকে এই পরিণতির শিকার হতে হতো না। কিন্তু এখন সবই অতীত। বাস্তবতা হচ্ছে, তুমি এখন পরজগতের স্থায়ী বাসিন্দা। তাই তোমার আত্মার শান্তি কামনা করা ছাড়া আর করারই কিছুই নেই। সেই সঙ্গে পাঠক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, এই বইয়ে লেখা ঘটনাগুলো শুধু পড়ার জন্য লেখা হয় নি। ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে এসব। তাই প্রথমে আমরা নিজেরা এথেকে শিক্ষা নিই। এরপর প্রতিবেশী কিংবা গন্ডির মধ্যে অহরহ ঘটতে যাওয়া এসব

দুর্ঘটনা রোধ করতে সচেষ্ট হই। আর কত দেখতে হবে এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা? কত বোন আর শিকার হবে এমন ট্রাজেডির? সমাজ গড়ার মহান যাত্রায় আপনার কি করার নেই কিছু?

পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই। আল্লাহর বিধান অমান্যের ফলাফল কখনও শুভ হয় না। আলোচ্য ঘটনা এই দাবির সপক্ষে ছোট্র একটি উদাহরণ। কেননা, বিয়ে শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিধান ঠিক; কিন্তু প্রেম-ভালোবাসার পথে পা মাড়াতে নেই। মুখলিস ভাইকে আমি চিনি। তার সততা প্রশ্নবিদ্ধ নয়। তবু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তার কারণে একটি মেয়ের জীবনপাতা ঝরে গেছে অকালে, একথা তিনি নিজেও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। সুতরাং একথা আবার প্রমাণিত হলো, যে পথে শরীয়ত নেই, সে পথে শান্তিও নেই। তাই সকলের উচিত পারিবারিক ও দাম্পত্য সম্পর্ককে সুখময় করতে চাইলে শরীয়তের বিধানের মধ্যে, পর্দা-পুশিদার মধ্যে নিজেদেরকে বেঁধে রাখা। আল্লাহ তাওফীকদাতা।

জীবন্ত দাফনের আধুনিক রূপ

এক. আজ থেকে বহুদিন হয়ে গেল ঘটনাটার বয়স। প্রায় তিন যুগ। বিস্মিত ইতিহাসটা স্মরণ করতে হলো এই বইটা লিখতে গিয়ে। বেলকুচি থানার বওড়া গ্রামের যে ঘটনাটি তৎসময়ে বিপুল আলোচিত বিষয় ছিল, মানুষ যে ঘটনাটিকে দেখত নির্মমতার করুণ ইতিহাস হিসেবে, আজ তা আমার সামনে ধরা পড়ছে ভিন্ন এক দৃষ্টিতে।

বেপর্দা, প্রেম আর পরকীয়ার কথাটা কিন্তু খুব বেশি শোনা যেত না এই তিন বা চার দশক আগেও। শুনেছি, আমাদের মায়েরা, চাচিরা বাবার বাড়িতে নাইওর করতে যেতেন রাতে, পর্দাঘেরা পালকিতে বসে। পর্দার বাইরে তো প্রশ্নই আসে না। পর্দা করার পরও দিনের আলোকে তারা পর্দার জন্য অনুকূল মনে করতেন না। তাই তারা রাতকে বেছে নিতেন কোথাও যাওয়ার সময় হিসেবে। পর্দার ব্যাপারে এতো কঠোর ছিলেন বলেই তারা অনেক বেশি নিরাপদ থেকেছেন। নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করে চলে যেতে পেরেছেন। অবশ্য সে সময়ের কঠোর পর্দার মধ্যেও দুয়েকজন যে এদিক সেদিক করেন নি, তা নয়। কিন্তু আল্লাহর বিধান যেহেতু সর্বকালের সব মানুষের জন্য পালনীয়, তেমনিভাবে তা লঙ্ঘন করার শাস্তিও সবার জন্য প্রযোজ্য। তাই যারা ত্রুটি করেছেন, লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়েছেন। হয়েছেন করুণ পরিণতির শিকার। সে রকম একটা ঘটনা দেখুন :

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানা। এই থানাতেই সংঘটিত হয়েছিল ভয়াবহ সেই নৃশংস ঘটনা। সে আজ থেকে বহু বছর আগে। আমরা তা শুনেছি আমাদের মা-বাবা ও মুরুব্বীগণের কাছে। এক নরপশুর অবৈধ লালসার শিকার হয়ে এক নারীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জাহেলিয়াতের গা কাঁটা দিয়ে ওঠা নির্মমতায়। জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে খারাপ চোখে দেখা হতো। বিয়ের সময় তাকে খরচ করে বিদায় করতে হবে, মানুষ তাকে কন্যার পিতা বলবে, কত লজ্জার কথা! এসব দুষ্টু চিন্তা কন্যার পিতাদেরকে পশুতে পরিণত করত। তাই কন্যাসন্তান হলে তাকে ছয় বছর পর্যন্ত লালনপালন করে একদিন কন্যার মাকে বলা হতো, সাজিয়ে দাও, ওকে চাচার বাড়ি বেড়াতে নিয়ে যাবো। আরব মায়েদের কাছে এ ছিল এক চরমপত্র। মাতৃত্বের বিরুদ্ধে এক অলজ্ঘনীয় নিষ্ঠুর নির্দেশনামা। জন্মদাত্রী মা জানতেন তার কলজেছেঁড়া ধনকে আসলে কোন্ চাচার বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু চোখের পানি ছাড়া ওই মায়ের করার বেশি কিছু থাকত না। উচ্ছ্বল বালিকাকে সাজিয়ে দিয়ে করুণাময়ী মা ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মেয়ের চিরপ্রস্থানের দিকে অশ্রুপূর্ণ চোখে তাকিয়ে থাকতেন। মাতৃত্বের হৃদয়মুকুরে তখন বইত বেদনার উত্তাল ঝড়।

কান্নায় বুক ভাসিয়ে মা যখন শিশুর মতো ফুফিয়ে কাঁদতেন, তখন কন্যার ভাগ্য যুক্ত হতো ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নির্মমতা। আগে থেকেই খোঁড়া গর্তের কাছে মেয়েকে নিয়ে পাষাণ পিতা বলত,

আম্মু! দেখতো, এখানে কী আছে? কোমল, উচ্ছ্বল, অবুঝ মেয়েটি যেই নিচের দিকে তাকাতো, তখনই পিতা তাকে ধাক্কা দিয়ে গর্তের মধ্যে ফেলে দিত। তারপর জীবন্ত কন্যাটিকে নিজ হাতে মাটি দিয়ে ঢেকে দিত।

কত শিশু তার বাবার মন গলানোর জন্য কত অনুনয়-বিনয় করেছে? বলেছে, বাবা! আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমার বোঝা হবো না, দূরে কোথাও চলে যাবো! কোনও বেদুইন পল্লীতে চলে যাবো চিরদিনের জন্য। তোমার মর্যাদায় যেন আঘাত না লাগে, সেজন্য তোমার কন্যা পরিচয় দেব না কখনও! কিন্তু তবু গলত না পিতার নিষ্ঠুর হৃদয়। গর্তসমান মাটি ভরাট করে বিজয়ের হাসি হেসে তবেই ফিরে আসত আপন গৃহে।

সে এক অব্যক্ত ইতিহাস। কোনও কবি, সাহিত্যিক কিংবা ভাষার শিল্পী বা যাদুকর কি সেখানে কখনও উপস্থিত থেকেছেন? পৃথিবীর সব কলমশক্তি দিয়েও কি তিনি পারবেন সে সময়ের একটি অবুঝ শিশুর নিষ্পাপ হৃদয়ে বেদনার যে ঝড় উঠত, তার পরিমাপ করতে ?

দুই. হ্যাঁ, রহমাতুল আলামীন তা পেরেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা শোনালেন। হে আল্লাহর নবী! তিনি বলা শুরু করলেন- আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা করবেন? আমার ছয় বছরের একটি কন্যাশিশু ছিল। আমি একদিন তার মাকে বললাম, মেয়েটিকে সাজিয়ে দাও; একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। আমার স্ত্রী বোঝে নি

আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাই মেয়েকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিল সে। অবুঝ মেয়েটির সে কী আনন্দ! বারবার আমার দিকে তাকায়। হইহুল্লোড় করে। আব্বা আব্বা বলে উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

কিছু দূর যাওয়ার পর রাস্তায় একটা কূপ পড়ল। আমি আর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলাম না। মেয়েটিকে বললাম, মা! দেখেতো ওতে কী দেখা যায়? মেয়েটি পরম উল্লাসে কূপের দিকে তাকালো। আমি তার ছোট্ট দেহটি দু'হাতে তুলে নিলাম। নরম হাড্ডির তুলতুলে দেহটাকে ছুঁড়ে মারলাম কূপের মধ্যে। মেয়েটি আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালো। কচি শিশুটি বিশ্বাস করতে পারছে না যে, আমি তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কূপে ফেলে দিয়েছি। তাই সে করুণাভরে পিতার কাছে সাহায্য চাইল। আব্বু, আমি ভয় পাই, আমাকে এখন থেকে তুলে নাও তাড়াতাড়ি! আমার তো ভয় করছে! এসব কথা বলল। কিন্তু মেয়ের নিষ্পাপ আকুতি আমি কানে ওঠার সুযোগ দিলাম না। তার আকুতিকে আড়াল করে দিলাম মাটিচাপা দিয়ে। বাবার হাতে অবুঝ মেয়ের মৃত্যু নিশ্চিত করে তবেই বাড়িতে ফিরে এলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লাম ঘটনা শুনে খুব করে কাঁদলেন। অন্য সাহাবীরা আফসোস করে বললেন, হায়! তুমি কেন আল্লাহর নবীকে এমন মর্মান্তিক ঘটনা শুনিয়ে কষ্ট দিতে গেলে!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবার শোনাও দেখি তোমার ঘটনা! তিনি আবার শোনালেন। এবার করুণার নবীর দয়ার সমুদ্রে তুফান উঠল। শিশুর মতো কেঁদে বুক ভাসালেন। কাঁদলেন উপস্থিত সবাই। কাঁদলেন শিশুটির বাবাও।

ইসলাম এসব করুণ কাহিনীর উপাখ্যান চিরতরে মিটিয়ে দিয়েছে। আর কোনও দিন যেন কোনও কারণে এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার অবতারণা না হয়, তার সুষ্ঠ ব্যবস্থা করেছে। বিখ্যাত কবি ফারাযদাকের দাদা মুছআসাহ ইবন নাজিয়া মুজাশিফী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহেলী যুগে আমরা যে ভালো কাজ করেছি, তার কোনও বিনিময় কি পাবো না? যেমন, আমি জাহেলী যুগে ৩৬০টি শিশুকন্যাকে জীবন্ত দাফনের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। প্রতিটি শিশুকে ছাড়াতে আমাকে দিতে হয়েছে দুটি করে দামি উট। মোট ৭২০টি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ইসলামের ছায়া পেয়েছো এই নেক আমল ও সুসভ্যতার কারণেই!

তো ইসলাম যেমন সভ্যতা রক্ষার ফসল, তেমনি ইসলাম রক্ষাই করে সভ্যতা। আর একারণেই হয়ত কোনও বিধান এমন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কঠিন বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা মানবতার মুক্তির রক্ষাকবচ। সেই বিধান পালন না করলে, ইসলামের আদর্শ লঙ্ঘন করলে, কিভাবে ফিরে ফিরে আসে জাহেলিয়াতের অসভ্যতা, বর্বরতা তা নিচের ঘটনাটি পড়ে অনুমান করার চেষ্টা করুন :

তিন. বহু দিন পর ফিরে এলো সেই মর্মান্তিক ইতিহাস। যে ইতিহাসটি রচিত হয়েছিল একটিমাত্র পাপের কারণে। শরীয়তের একটি বিধান লঙ্ঘন ও বেপর্দার নাফরমানীর কারণে।

বর্তমানে দৌলতপুর ইউনিয়নের এক ওয়ার্ডের মেম্বার ময়নু (ছদ্মনাম)। দাপট বেজায়। সন্ত্রাস, লুণ্ঠন, লুটপাট, স্কুল-মসজিদে দেয়া দানের টাকা মেরে দেয়া, রাস্তা, পুল নির্মাণের টাকা আত্মসাৎ করাসহ সব ধরনের অপরাধ জগতে তার নির্বিঘ্ন বিচরণ। পৌঢ় বয়সে যার এত কীর্তি (?) যৌবনে সে বসে থাকার লোক ছিল না। তাই সে তার যৌবনকালে একটি মেয়ের চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটিয়েছিল। আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে করেছিল ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

কামালুদ্দিনের (ছদ্মনাম) সহজ-সরল মেয়ের সরলতার সুযোগ নিল ময়নু। তামিমা (ছদ্মনাম) নামের মেয়েটি প্রয়োজনের তুলনায় বেশিই সরল। অবশ্য সে সময়ের মেয়েরা এমনই ছিলেন। যুগের কালো ধোঁয়া তাদের সরলতার শুভ্রতায় দাগ ফেলত কম। কিন্তু এই সরলতার সঙ্গে যতটুকু দ্বীনি সচেতনতা প্রয়োজন, তাতে ঘাটতি ছিল যথেষ্ট, তা বলতেই হবে। তাই কৌশলে ময়নু তার ওপর যৌবনের লাম্পট্য চর্চা করল। মেয়েটিকে ফুসলিয়ে নিয়ে এলো অন্ধকার জগতে। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার সম্ভ্রম কেড়ে নিল। মৌমাছি ফুল থেকে মধুটুকু চুষে নিয়ে যেভাবে আপন পথে কেটে পড়ে, তেমনি সেও তা-ই করল।

কিন্তু পাপের উপসংহার সহজে হয়? তাই চলে গেলেও সে তামিমার গর্ভে রেখে গেল অশুভ নাপাক ঔরস, যার গ্লানি বইতে হবে এখন সরল তামিমাকে, তার গরীব অসহায় মা বাবাকে!
বাবা ছিলেন নেহায়েত নির্দয় মানুষ। তিনি জানতেন না এসব কাহিনী। বিয়ে ঠিক করলেন মেয়ের। বিয়ের দিন খুব কাছে গড়ালে তিনি শুনতে পেলেন সেই পাপের কাহিনী। বিচারের প্রার্থনা করবেন সেই সামর্থ নেই। কারণ, লম্পট লোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার মতো শক্ত ভিত নেই তার। যুগে যুগে একশ্রেণীর মানুষ এমন অসহায় ও লম্পটদের লালসার শিকার হয়েই এসেছে। কে তাদের সঙ্গে ইনসাফ করবে? তাদের বিচারের প্রার্থনা কে আমলে নেবে? তাদের একমাত্র সহায় আল্লাহ ও আল্লাহর বিধান। কিন্তু সেই একমাত্র সম্বলটাও যখন কাজে লাগানো হয় না, তখন তাদের দুঃখ অবধারিত হয়ে যায়।
যাহোক, বিয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে দুর্ঘটনার কথাটা শুনে মাথায় বাজ পড়ে তামিমার বাবার। কী করবেন এখন- তা ভেবে পান না তিনি। অবৈধ ঔরস ধারণ করা একটা মেয়েকে অন্যের হাতে তুলে দিলে যে শেষে পস্তাতে হবে! তাই অতি আশাবাদী হলেন তিনি। ময়নুর অভিভাবকদের কাছে গেলেন মেয়ের একটা বিহিত করতে। বিহিত আর কী! যার দ্বারা সম্ভ্রম খুইয়েছে, তার ঘাড়েই কন্যার দায় তুলে দেয়া। পৃথিবীতে পিতার তরে দুটি বোঝা সবচে ভারী। এক. পিতার ঘাড়ে সন্তানের লাশ। দুই. কন্যার গর্ভের বৈধতার জন্য লম্পটের দ্বারস্থ হওয়া। কামাল এক্ষেত্রে দ্বিতীয়

বোঝাটা উঠাতে গেলেন। প্রস্তাবটা ঠিকমতো তুলতেও পারলেন না তিনি। ময়নুর পরিবারের লোকজন তাকে নিদারুণ অপমান করে ঘর থেকে বের করে দিল। ক্রোধ, ক্ষোভ আর ঘৃণা থেকে সৃষ্ট একটি নির্মম সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন।

বিয়ের প্রস্তুতি চলছে। কয়েকদিন মাত্র বাকি। সকলের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা কাজ করলেও থমকে আছে কামালুদ্দিনের সব আয়োজন। এরই মধ্যে বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যায় তিনি মেয়েকে ডেকে বললেন, চল মা, তোকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাই। একজন ডাক্তারের নাম ধরে কথাটা বললেন তিনি।

মেয়ে বাবার কথা শুনে চমকে গেল। এই সময় এতো দূরের ডাক্তারের কাছে যাওয়া! অথচ আগামীকাল বিয়ে! মেয়েটি সরল-সোজা হলেও বাবার কথাও তার বিশ্বাস হতে চাচ্ছিল না। কিন্তু বাবার সঙ্গে ফুফুও আছেন। তিনিও বারবার তাগিদ করছেন প্রস্তুত হয়ে নিতে। অগত্যা ডাক্তার বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগল তামিমা। বিদায় বেলায় মা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মেয়েকে ঠিক সেভাবে বিদায় জানালেন, যেভাবে ছয় বছরের কন্যাকে বিদায় জানাতো জাহেলিয়াতের আরব মায়েরা।

কিন্তু পার্থক্য হলো তামিমার মা কোনোরকম অশ্রু বিয়োগ করলেন না। হাসিমুখেই বিদায় জানালেন মেয়েকে। মায়ের এই অশ্রুহীন আঁখি তামিমাকে আশ্বস্ত করল। চিকিৎসা শেষে ফের আপন জায়গায় ফিরে আসার প্রত্যাশা নিয়ে বাবা ও ফুফুর সঙ্গে পথে নামল সে।

এখন থেকে প্রায় তিন যুগ আগের ঘটনা। সে সময়ের পল্লীগুলোকে নিভৃত পল্লীই বলতে হয়। বহু দূরে দূরে একটি করে বাড়ি। যেখানে সন্ধ্যাতেই রাত নামে। সূর্যাস্তের কিছুক্ষণের মধ্যে পল্লী গাঁয়ের খেটে খাওয়া মানুষেরা ক্লান্তিতে আশ্রয় নেয় ঘুমের কোলে।

পল্লী গায়ের এমনি নিস্তব্ধতা ভেদ করে এগিয়ে চলছে তিনটি মানুষ। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা, পিতার নীরবতা আর ফুফুর ফিসফিসানি তামিমাকে এক অজানা আতংকে ফেলে দিল। বাবা তাকে একটা কথাও বলছেন না। কিছু জিজ্ঞেস করলেও হ্যাঁ না-র মধ্যে উত্তর সীমাবদ্ধ। ফুফু কিছুক্ষণ পর-পর বাবার সঙ্গে কী যেন ফিসফিস করে বলেন। বোঝা যায় না কিছু, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু যে হতে যাচ্ছে, তা বুঝতে তামিমার সরলতাটা প্রতিবন্ধক নয়।

তার শংকা আতংকে পরিণত হলো যখন ডাক্তার বাড়ির পথ ছেড়ে তারা অন্য পথ ধরলেন তার বাবা। ফুফুকে জিজ্ঞেস করে কোনও সদুত্তর পাওয়া গেল না। বাবাকে জিজ্ঞেস করে খেল বকা। অসহায় নিরুপায় হয়ে তাই বাবা ও ফুফুর অনুসরণ করতে হলো তাকে।

বহুদূর চলার পর থামলেন তামিমার বাবা ও ফুফু। হুড়োসাগর নদীর পাড়ে। নদীটা বেশ পরিচিত। এক সময়ে প্রমত্তা নদী ছিল। কালের অনেক কিছুরই সাক্ষী এই নদীটা। কিন্তু বিস্মৃত অতীতের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া এসব ঘটনায় তার মনোযোগ নেই। সে এখন

সাক্ষী হতে যাচ্ছে দেড় হাজার বছর আগের জাহেলিয়াতের একটি ঘটনা অবতারণার।

নদীর ধারে কাশবন। জোসনার আলো দু' টুকরো হয়ে অর্ধেক নদীর পানিতে এবং অর্ধেক কাশবনের সাদা ফুলের ওপর পড়েছে। নদীর কুলকুল করে বয়ে যাওয়া পানি আর বাতাসের ধাক্কায় কাশবনের দোল খাওয়ার দৃশ্য অন্য সময় হলে সরল তামিমার মনেও হয়ত প্রকৃতির প্রতি একটা শ্রদ্ধা জাগিয়ে দিত। কিন্তু আজ এ অবস্থায় তার এসবে কোনও মনোযোগ নেই। তাকে গ্রাস করে রেখেছে এক অজানা আতংক। একপর্যায়ে তাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রেখে বাবা ও ফুফু যেন কী কথা সেরে নিলেন। এরপর বাড়ি থেকে নিয়ে আসা ব্যাগটা থেকে বাবা যে জিনিসটা বের করলেন, তাতে জোসনার কড়া আলো পড়ে একটা হালকা ঝিলিক দিয়ে গেল। সরল তামিমার মনটা তখন শংকায় কাঁপতে শুরু করেছে।

এর কিছুক্ষণ পরই সব শংকা আর আতংক জোসনার আলোর মতোই সত্য হয়ে ধরা পড়ল তামিমার দৃষ্টিতে। বাবা তাকে চুলের মুঠি ধরে কাশবনের মধ্যে টেনে নিতে শুরু করলেন। পেছন থেকে ধাক্কালেন ফুফু। নারীমনের সকল দুর্বলতা আর আতংক গ্রাস করে নিল তামিমাকে। বাঁচাও বাঁচাও বলে সে ভয়ার্তকণ্ঠে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু তার চিৎকার ধ্বনি নদীর পাড়ে লেগে একটা প্রতিধ্বনি হয়ে তারই কাছে ফিরে এলো। একজন পিতা যখন কোনও সন্তানকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন ওই সন্তানের

বাঁচার আর্তনাদ আর কার কানেই বা পড়বে! তাছাড়া নিষ্ঠুর পিতা কন্যাহত্যার জন্য এমন এক স্থান বেছে নিয়েছিলেন, যা ছিল রাতের প্রকৃতিতে মানুষের দৃষ্টিসীমার অনেক বাইরে।

কোনও মনুষ্যসন্তান যখন তামিমাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো না, তখন বাঁচার তাগিদে সে পিতার স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রথমে বাবার কাছে আরজি জানিয়ে বলল, বাবা! আমাকে এবারের মতো ছেড়ে দাও। এই এখান থেকেই চিরদিনের জন্য অজানার পথে নেমে পড়বো। কোনোদিন আর তোমার দুয়ারে হাজির হবো না। তোমাকে আর বাবা বলে বিরক্ত করব না। মেরেই ফেলতে চাচ্ছো যখন, তখন জীবনটা না হয় ভিক্ষাই দাও, বাবা! এই দেখো, তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, সত্যি কোনোদিন আর বাড়িতে ফিরে আসব না...।

ইনিয়ে-বিনিয়ে বহু কথা বলল তামিমা। বাবার মন নরম করে জীবন বাঁচানোর জন্য সম্ভাব্য সব কৌশল অবলম্বন করল। কিন্তু নিষ্ঠুর বাবার মন গলানো গেল না। তখন সে প্রতিবাদী হয়ে উঠল। ধস্তাধস্তি হলো বাবা ও ফুফুর সঙ্গ। যুবতী বয়সী একজন নারীর শক্তিতো একেবারে ফেলবার নয়, কিন্তু হত্যাপ্রচেষ্টায় উদ্যত দানব পিতা আর তার সহযোগী ফুফুর শক্তিকে কুলিয়ে উঠতে পারল না সে। তারা দুইজন তাকে ধস্তাধস্তি করে কাশবনের একেবারে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

এবার শুরু হলো আরেক লড়াই। তাকে মাটিতে ফেলে জবাই করা হবে। এখানেও অনেকক্ষণ লড়ল তামিমা। অনেক স্থান জুড়ে

ভেঙে গেল কাশবন। তবে শেষ পর্যন্ত এখানেও পরাজিত হলো সে। পিতার হাতের উদ্যত ধারালো ছুরি তার গলা স্পর্শ করল। মৃত্যু নিশ্চিত বুঝতে বাকি থাকল না তামিমার। বাবা আর ফুফুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে গলা শুকিয়ে গিয়েছিল আগেই। তাছাড়া মৃত্যুর সময়টাতে মানুষ এমনিতেই পিপাসার্ত হয়। তাই শেষবারের মতো পানি চাইল তামিমা।

তামিমা ভুলে গিয়েছিল, যে লোক দুটোর কাছে সে পানি চাচ্ছে, তারা এখন তার বাবা আর ফুফু নয়। তারা জল্লাদ! আর জল্লাদের কাজ তো মৃত্যুপথ যাত্রীকে পানি দেয়া নয়, দ্রুত জীবনলীলা সাঙ্গ করা। তাই তামিমার শেষ ইচ্ছা পূরণ হলো না। নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল তার পানি চাওয়ার আহবান। পানি দাও পানি!

এলাকার মানুষের ভাষ্য, বহুদিন পর্যন্ত নদীর এই পাড়টায় মানুষ একাকী হলেই এই আওয়াজটা শুনতে পেতো। পানি দাও পানি! কী জানি, হয়ত তামিমার বিদেহী আত্মার সমবেদনা জানাতেই সেদিনের প্রকৃতি তামিমা হয়ে গিয়েছিল। তাই বহুদিন পর্যন্ত সমবেদনা ফিরে ফিরে এসেছে প্রকৃতির মুখে মুখে- পানি দাও, পানি!

কয়েকদিন আগে আমার আব্বা এসেছিলেন ঢাকায়। তার কাছে পুনরায় ঘটনাটার আদ্যোপান্ত জেনে নিলাম। আমার জিজ্ঞাসায় তিনি প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন। এতদিন আগের নির্মম একটা ঘটনা স্মৃতির সরলরেখায় ফিরে আসায় একটা দীর্ঘশ্বাস নিলেন।

করুণকণ্ঠে শোনালেন সেই ঘটনাটা। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তামিমাকে কি কবর দেয়া হয় নি? তিনি বললেন, কয়েকদিন পর্যন্ত শেয়াল-কুকুরের আহার ছিল সে। এরপর স্থানীয় লোকজন সদয় হয়ে তার দেহের অবশিষ্টাংশ মাটি চাপা দিয়ে রাখে।

কথাটা শুনে মনটা আরও বিষন্ন হলো। তাহলে তামিমার কপালে কি জাহেলী যুগের শিশুকন্যাদের মর্যাদাটুকুও জোটেনি? কবরস্থ হওয়ার মর্যাদা? তামিমার জন্য আমার নিদারুণ কষ্ট হয়, তার জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করি। কিন্তু বারবার এই প্রশ্ন মনে দোলা খায়, এই যে নির্মম হত্যাকাণ্ড, পিতাকর্তৃক কন্যা নিহত হওয়ার মতো নির্মম ঘটনা; কেন ঘটে এসব? শুধু জাগতিক দৃষ্টিতে বিচার করলে কি এসব সমস্যার সমাধান হবে? নাকি আমাদেরকে বের করতে হবে সমস্যার মূল কারণটা?

পাঠক! আমি হলফ করে বলতে পারি, সরল তামিমা যদি পর্দায় নিজেকে আবৃত করত, বিবাহবহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ককে প্রশ্রয় না দিতো, তাহলে তাকে এই নিদারুণ পরিণতির শিকার হতে হতো না। আল্লাহর বিধান রক্ষা করার মর্যাদা তাকে রক্ষা করতো যিল্লতী ও জীবননাশ থেকে।

সতীত্বের নিলাম

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো একটি গ্রন্থ হচ্ছে- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 'মুসলিমদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'। বইটির শিরোনাম দেখে যে কেউ চমকে উঠতে পারেন। এক জাতির পতনে আরেক জাতির ক্ষতির প্রশ্ন কেন?

কিন্তু পৃথিবীব্যাপী যে অনাচার, অনৈতিকতা আর নির্লজ্জতার ছড়াছড়ি, তা দেখে মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত যে কোনও মানুষই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, আলোচ্য শিরোনামের বইটি সত্যিকার অর্থেই একজন যুগদ্রষ্টার হৃগয়বিগলিত উচ্চারণ এবং তিনি একথা আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পারবেন যে, একটি সভ্য জাতির পতনে বিশ্বের অনেক কিছুই হারানোর থাকে।

আগে ঘটনাটা দেখুন। সংবাদটা প্রকাশিত হয়েছিল ২০১০ইং সালের আগস্ট মাসে। বান্ডিল পত্রিকা নামে পরিচিত দৈনিক কালেরকণ্ঠে। ঘটনাটি সভ্যতার তথাকথিত দাবিদার ইউরোপের কোনও এক দেশের (দেশটির নাম এখন ঠিক মনে পড়ছে না আমার। তবে বৃটেন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি)।

সভ্যতার দাবিদার এই বিশ্বে কত অদ্ভুত নিলামের নামই তো শোনা যায়! কারও ব্যবহৃত ছেঁড়া কাঁথা। কারও ঘরের বাথরুম পরিষ্কার করার ব্রাশ, কারও ব্যবহৃত গাড়ির টায়ার আরও কত

কীর নিলাম ডাকা হয়! কিন্তু সভ্যতার দুনিয়ায় নারীর চিরন্তন গৌরবের বস্তু সতীত্বকেও শেষ পর্যন্ত নিলামে তোলা হবে, তা আমরা কেন, কোনও সাধারণ বিবেকবান মানুষও কল্পনায় আনতে সক্ষম হবে না। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষকে এমনই নাযুক থেকে নাযুকতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ঘটনাটি হচ্ছে : ইউরোপের ওই ষোড়শী মেয়েটি নিজেকে নিলামে তুলেছে। ঋণগ্রস্ত হওয়ায় তাদের পৈত্রিক বাড়িটি ব্যাংকের কাছে আটকে পড়ে যায়। ব্যাংক চাচ্ছে, বাড়িটি নিলামে তুলে তাদের টাকা উসুল করে নিতে। মা আর নিজের একমাত্র আশ্রয়স্থলটি এভাবে হাতছাড়া হয়ে যাবে তা মেনে নেয়া যায়! তাই আজব এক নিলাম আহবান করল সে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানিয়ে দিল, কোনও ব্যক্তি তাকে যদি এই পরিমাণ পাউন্ড দেয়, তাহলে সে তাকে এক রাতের জন্য নিজের সতীত্ব দিয়ে দেবে! নিলাম আহ্বানের সঙ্গে তার ছবিটাও ছেড়ে দিলো আগ্রহীদের সুবিধার জন্য।

মুহূর্তের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল কামদুনিয়ায়। হাজার হাজার আবেদন পড়ল কয়েক ঘণ্টার মাথায়। এর মধ্যে এক যুবক ছিল কিছুটা সাধু-সন্ন্যাসী টাইপের। সে নিলামের সর্বোচ্চ ডাক হাঁকল। তবে এই অবৈধ পন্থায় না গিয়ে মেয়েটিকে স্থায়ীভাবে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল সে। কিন্তু মেয়েটি যাদের নিলাম আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের সবার আগে ছিল এই সাধু যুবকের নাম, যে বৈধ পন্থায় তাকে পেতে চেয়েছিল।

মেয়েটি তার যুক্তি তুলে ধরে বলেছে, 'আমি আসলে কারও সঙ্গে ঘর বাঁধতে চাইনি। কেবল ঋণের টাকাটা পরিশোধ করতে এক রাতের জন্য আমার সতীত্ব নিলামে তুলেছি। কিন্তু কামুকদুনিয়ার লোকগুলো আমাকে সারা জীবনের জন্য ভোগ করতে চায়। তাই তার আবেদন প্রত্যাখ্যান না করে উপায় ছিল না।'

হায় বিবেক! যে তোমাকে মূল্য দিল তাকে তুমি ভর্ৎসনা দিলে! তুমি যে কামুক দুনিয়ার সুযোগ নিয়ে তোমার স্বার্থসিদ্ধি করলে, সে দুনিয়াকেই তুমি ভর্ৎসনা করলে!

এটাই বলছিলাম যে, একটি সভ্য দুনিয়ার পতন মানে গোটা বিশ্বের পতন। আর ইসলাম যে সভ্যতা নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করেছে এবং এককালে যে জৌলুস বিলিয়েছে, তা যদি আজ অক্ষুণ্ন থাকত, তাহলে পৃথিবীর যে প্রান্তের যে কোনও ধর্মের হোক না কেন, কোনও নারীকে খাদ্য কিংবা বাসস্থানের জন্য এভাবে প্রকাশ্যে নিজের সতীত্বকে নিলামে তুলত হতো না। তাই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লেখা আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.)-এর 'মুসলিম বিশ্বের পতনে বিশ্ব কী হারালো' বইটির শিরোনাম আমাদের মনের অজান্তেই দোলা দিয়ে যায় এসব ঘটনাদর্শনে।

বিচূর্ণ স্বপ্ন

পাহাড়ী প্রকৃতির নিস্তব্ধ রজনী। ঘুমের কোলে আশ্রিত পাহাড়ী জনপদের সকল সদস্য। পাহাড়ী নির্জনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাতের গভীরতা। এমন নিস্তব্ধ রজনীতে বেঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন আব্দুস সাত্তার। ঠিক সে সময় পাহাড়ী নির্জনতা আর রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে বিকট গর্জনে কেঁপে উঠল তার ঘরের টিনের চালাটি। আতঙ্কিত হয়ে তড়িঘড়ি করে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন কী ঘটছে তা দেখার জন্য। অজানা আতঙ্ক আর ভয় নিয়েই ঘরের টিনের চালে উঠলেন তিনি। দেখলেন, ১৫ বছরের একটি মেয়ে মৃত্যুবৎ পড়ে আছে টিনের চালে!

সেদিন কী ঘটেছিল চট্রগ্রাম নগরীর খুলশী থানার লালখান বাজার এলাকায়? এটাও সেসব ঘটনার একটি, যা বেপর্দা, প্রেম আর উচ্ছৃংখল জীবনাচারের কারণে সংঘটিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসব ঘটনার শুরু আছে কিন্তু শেষ কোথায় তা কেউই বলতে পারেন না। পারবেনইবা কী? কেউ তো সমাধানের সঠিক পথে হাঁটে না। থাক সেসব কথা। এবার আসল ঘটনায় আসি :

লালখান বাজারের বাসিন্দা দেওয়ানহাট এলাকার কাস্ট গার্মেন্টের কর্মী পার্বতী (ছদ্মনাম)। বয়স মাত্র পনের। কোমল নারী সত্তা নিয়ে উপার্জনের কঠিন দায়িত্ব মাথায়। সামনে ভবিষ্যতের হাতছানী। কাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে, সেও একটা বড় চিন্তা। এরই মধ্যে তাকে হাতছানী দিয়ে ডাকল এক যুবক।

জসিমুদ্দিন মানিক (ছদ্মনাম) স্বপ্নচারী মেয়েটিকে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখালো। দরিদ্রতার ভারে ন্যুব্জ একজন অপরিপক্ক মেয়ের জীবনে এরচেয়ে বড় প্রলোভন আর কী হতে পারে? তাই সে তার আহ্বানে সাড়া দিতে বিলম্ব করে নি। ভাবে নি একটু সময়ের জন্যও। মানিক তাকে প্রেম আর ভালোবাসা দেবে বলে তাকে কাছে টেনে নিয়েছে। নিয়েছে তার সর্বস্ব। পার্বতী তাতে বাধা দেয় নি। যার সঙ্গে জীবন গড়বে, তার ইচ্ছায় বাঁধ সাধতে আছে? জানি না, হয়ত সে তা-ই ভেবে থাকবে।

ঘটনার দিন মানিক প্রেমিকা পার্বতীকে আহ্বান করে। তাকে আশা দেয়, এবার এসেছে তোমার সুদিন! আজই তোমাকে বিয়ে করে ফেলব! মানিকের কথায় পার্বতীর কিশোরী মনে এক অজানা শিহরণের ঢেউ খেলে যায়। একজন নারীর চিরকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি তার হাতের নাগালে! এখনই সে বধূ সাজবে, বিয়ের নতুন লালশাড়ী পড়বে! নারীসৃষ্টির সবচেয়ে সেরা মুহূর্তটি সে কিছুক্ষণের মধ্যেই শাড়ীর আঁচলে বেঁধে ফেলবে! ইত্যকার শিহরণমূলক অনুভূতি সরল কিশোরীমনে বারবার উঁকি দিতে থাকে। সে কৃতজ্ঞতার নয়নে তাকায় মানিকের দিকে। মানিক সত্যি স্বপ্নপুরুষ তার! স্বামী! পদধুলো নিতে হবে যে!

বলা হয়, নারীর বুক ফাটে, কিন্তু মুখ ফোটে না। কিন্তু আজ যেন পার্বতীর মুখও ফুটতে চাচ্ছে। একজন গরীব, যৌতুক প্রদানে অক্ষম নারীর জন্য বিনা যৌতুকে বিয়ে হওয়ার শিহরণ কমইবা হবে কেন? মনে পড়ে গেল একটা বইয়ের কথা। ভারতের গহীন

অরণ্যে বাস একটি দরিদ্র পরিবারের। সংসারে চার চারটে বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে। কিন্তু দরিদ্রের ভারে ন্যূব্জ পরিবারের পক্ষে সম্ভব নয় যৌতুক দিয়ে তাদেরকে পাত্রস্থ করা। এদিকে মেয়েগুলোর বয়সও গড়াচ্ছে বেশ। বড় মেয়েটি মাঝে-মাঝে আক্ষেপ করে বলত, কত মানুষই তো কাজের জন্য গৃহপরিচারিকা রাখে। এমন কোনও মহানুভব লোক কি নেই, যে আমাদেরকে গৃহকাজের জন্য নিয়োগ দেবে, বিনিময়ে দেবে শুধু বধূর মর্যাদাটুকু? কেউ যদি এতটুকু কৃপা করে আমাদের প্রতি, তাহলে সারা জীবন আমরা চুলের আঁচল দিয়ে তার পা মুছে দেব!

আহ্! কত বড় বেদনার দীর্ঘশ্বাস এটি! সেই দীর্ঘশ্বাস যেন ভর করছে পার্বতীর শ্বাসে, আর এথেকে তাকে উদ্ধার করতে এসেছে মানিক!। তাই তার প্রতি এতো শ্রদ্ধা, এতো আবেগ! আনন্দে, আবেগে মানিকের সামনে নিজের অস্তিত্ব বিকিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে তার!

এভাবে বিয়ের শিহরণ আর আকুলতা তার দেহে ঝাঁকুনি দিয়ে হারিয়ে যায় দূরে কোথাও। বিয়ের স্বপ্নে বিভোর পার্বতী মানিকের সঙ্গে রওয়ানা হয়। প্রথমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নগরীর আমবাগান এলাকায়। সেখানে এসে স্বপ্নের কোনও তাবীর দেখতে পায় না পার্বতী। কোথায় বিয়েথার আয়োজন! কেবল রাতের আঁধারই যে তাদের সঙ্গী! কোথায় লালশাড়ী, কোথায় হাতের মেহেদী?!

পার্বতী দেখল, তার স্বপ্নের মানুষটি তার বন্ধুদের সঙ্গে কী যেন বলাবলি করছে। ভাবল, হয়ত বিয়েরই কোনও আয়োজন নিয়ে কথা বলছে তারা। হায় হতভাগিনী! এখনও তোর স্বপ্ন ভাঙল না?
এর কিছুক্ষণ পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মতিঝর্ণা পাহাড়ে। সেখানে গিয়ে তার স্বপ্নের গ্লাসটি চূড়ান্তভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কল্পনার তুলিতে আঁকা তার স্বামী মুহূর্তের মধ্যে ধর্ষকের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে। তাকে তার প্রেমিকসহ চার বন্ধু মিলে ধর্ষণ করে। মানিক তার তিন বন্ধুদের নিয়ে ভালোবাসার (?) মানুষটিকে সম্ভ্রমকাঙাল বানিয়ে ছেড়ে দেয়। শুধু তাই নয়, তার সম্ভ্রমটুকু কেড়ে নিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলে পাহাড়ের পাদদেশে।
পার্বতীর স্বপ্ন আটকে যায় আব্দুস সাত্তারের ঘরের টিনের চালে। আজ সে বাসর রাতের লালশাড়ী পরা বধূ নয়, হাসপাতালের কেবিনের মুমূর্ষ রোগী! তার ঠিকানা সাজানো বাসর ঘরে নয়, হাসপাতালের বেডে!
দেখুন, পার্বতীকে অন্ধকার রজনীতে চার বন্ধু মিলে নিয়ে যায় লালখান বাজারের মতিঝর্না পাহাড়ে। অপরিচিত যুবকদের দেখে চিন্তিত হওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু তা হয় নি। কারণ, সঙ্গে যেখানে প্রিয় মানুষ আছে। সেখানে এসব ভাবাভাবির সময় কোথায়? কিন্তু যেখানে আল্লাহর বিধান থাকে না, মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার ডর-ভয় থাকে না, সেখানে কি এ ধরনের আত্মবিশ্বাসের সুযোগ আছে? মানুষ এখানটায় এসে ভুল করে। যে

লোকটা আল্লাহর বিধানের মর্যাদা দিতে জানে না, সে কী করে একজন নারীর মর্যাদা দিতে জানবে? [সূত্র : দৈনিক প্রতিদিন ৩রা জানুয়ারি ২০১১ ইং]

পরকীয়ার স্বরূপ ও বর্তমান পরিস্থিতি

কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় ‘বেইজ লাইন সার্ভে’ শীর্ষক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, ‘পরকীয়ার ঘটনা আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ষাটদশকের তুলনায় এই প্রবণতা অনেক বেশি। সে সময়েও পরিস্থিতি এত ভয়াবহ ছিল না। বর্তমানে প্রতি দশজন পুরুষের মধ্যে তিনজন পুরুষ পরকীয়ায় জড়িত।’

সত্যিকার অর্থেই একটি উদ্বেগজনক রিপোর্টই বটে। এই রিপোর্টটি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সীমাহীন দৈন্যের পথনির্দেশ করে। আসলে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা মাত্র ৫০ বছর পিছিয়ে গিয়েছেন। যদি আরও কয়েকশ বছর পিছিয়ে খোলাফা বা ইসলামের শাসনযুগের কাছে ফিরে যেতেন, তাহলে চিত্রটা আরেকটু ভিন্ন দেখতেন। তখন তফাৎটা আরেকটু মোটা দাগে ধরা পড়ত।

যাহোক, পত্রিকা এই রিপোর্ট প্রকাশ করার পর এ সংক্রান্ত অনেকগুলো ঘটনা তুলে ধরেছে। আমরা দুয়েকটি ঘটনা তুলে ধরার আগে পরকীয়ার স্বরূপ তুলে ধরার প্রয়াস পাবো, ইনশাআল্লাহ।

ইবন মুকাফফা’ (রহ.) পরনারীর প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণ ও তার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, শয়তান পরনারী সম্পর্কে মানুষের অন্তরে স্বাদ জুগিয়ে দেয়। তাদের কল্পনাটাই তার কাছে মধুময় হয়ে ওঠে। চোখ ও অন্তরে তাদের

সৌন্দর্য সুশোভিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত এটা এক ধরনের প্রতারণা ও ধোঁকা। কেননা, নিজের বৈধ স্ত্রী কিংবা স্বামীর বদলায় যার দিকে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, সে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজের স্বামী বা স্ত্রীর চেয়ে নিম্নমানের হয়ে থাকে।' [আল-আদাবুল কাবীর পৃ. ৯৯]

ইবন মুফলিহ হাম্বলী রহ. পরকীয়ার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির অন্য নারীদের দিকে তাকানো থেকে নিজের চোখকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। কেননা, মানুষ নিজের বৈধ বস্তু (স্ত্রী বা স্বামী)-র চেয়ে অবৈধ বস্তু তথা পরকীয়ার নারী-পুরুষকে বেশি সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে দেখে।

তুমি তাকে দেখবে সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে, তার কথাগুলো কানে বাজবে সুরেলা স্বরে, সামাজিকভাবে তাকে বেশি ফিট ও উপযোগী মনে হবে, অন্তরঙ্গতায় মনে হবে সেরা, আনন্দ প্রদানে মনে হবে শ্রেষ্ঠ। এই মনে করাটা তোমাকে তোমার বৈধ স্ত্রী বা স্বামী থেকে মন কেড়ে নিয়ে অবৈধ স্থানে পতিত করবে। তোমার চোখে শয়তান ধাঁধাঁ সৃষ্টি করবে, হালালের প্রতি তোমার মধ্যে অনীহা ভাব সৃষ্টি করবে, বৈধ বস্তুর প্রতি ঘৃণা ও অবৈধ বস্তুর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করবে। কারণ, মানুষের মধ্যে নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। শয়তান এই প্রবণতাকে কাজে লাগায়। নিজের কাছে হালাল যে বস্তু আছে তাতে অনীহা ও অরুচি ধরিয়ে দেয়। সর্বোপরি শয়তানের প্রধান কাজ হলো তোমার কাছে, যে হালাল বস্তু সংরক্ষিত আছে, তার চেয়ে যা

তোমার কাছে নেই তথা তোমার জন্য যা হারাম তাকে তোমার দৃষ্টিতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে পেশ করা।

এর ফলে তার প্রতি তোমার ইশক-প্রেম সৃষ্টি হয়। ফলে ধ্বংস হয় দ্বীন-দুনিয়া সবই। কত দৃষ্টি যে এই ধ্বংসলীলা সাধন করেছে! কত দৃষ্টি যে কত জনপদ, পরিবার ও সমাজকে এভাবে ধ্বংস করেছে!

বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ইবন মুবারক (রহ.) বর্ণনা করতেন, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নিজে থেকেই ফিতনা (পরকীয়া-প্রেম) জন্ম দেবে, সে কখনও তা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। যদিও সে এর জন্য জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে।' আর এটা সৃষ্টি হয় অনৈতিক মেলামেশা ও বেপর্দার কারণে। [আলফুরূ' : ৫/১৫৫] (ঈষৎ সংক্ষেপিত)

এর প্রমাণস্বরূপ একটি বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ ঘটনা পেশ করা যেতে পারে।

দৃষ্টির উদারতা, বাধাহীনতা ও অবৈধ পাত্রে তা ব্যবহার করার অপকারিতার চিরস্মরণীয় একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এই ঘটনাটি।

হিন্দ বিনতে খুস ইয়াদিয়া জাহেলী যুগের একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহিত্যিক ও প্রখর মেধার অধিকারী একজন ধনবতী নারী ছিলেন। কিন্তু তিনিই অবিশ্বাস্যভাবে তার এক ভৃত্যের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। অথচ তিনি আরব দুনিয়ার একজন নামকরা জ্ঞানী হওয়ায় এর কল্পনাও করা সম্ভব ছিল না। তাকে এই অবিশ্বাস্য কান্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি আরবজাহানের একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে

একজন দাসের সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হতে পারলেন? তিনি জবাবে বললেন- দুটি বিষয় আমাকে একাজে জড়িয়ে পড়া সহজ করেছে। এক. পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধ মেলামেশা, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া। দুই. পরপুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা, গল্পচারিতা ও খোশালাপ।

অর্থাৎ- এই দুটি বিষয় এমন পাপ, যা বুদ্ধিমতী ও আরবখ্যাত একজন নারীকে আস্তে-আস্তে তার শরাফত, আভিজাত্য, সতীত্ব, নেতৃত্ব ও সম্ভ্রমের গণ্ডি থেকে বের করে এনে ব্যভিচারের মতো জঘন্য পাপে লিপ্ত করে দিয়েছিল। বস্তুত দৃষ্টির উদারতা ও অনৈতিক মেলামেশাই একজন নারী বা পুরুষকে প্রেম বা পরকীয়ার মতো ভয়ানক পাপে লিপ্ত করে দেয়। দৃষ্টি হলো শয়তানের একটি তীর। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ-

'দৃষ্টি হলো শয়তানের তীরসমূহের একটি।' [মুস্তাদরাক হাকেম : ৪/৩১৪[8]]

অতএব, একজন নারী বা পুরুষকে অবশ্যই শয়তানের এই তীরের লক্ষ্যবস্তু হওয়া থেকে নিরাপদ থাকতে হবে। আর মেলামেশা থেকে তো বেঁচে থাকতে হবেই। জনৈক কবি বলেন-

اِنَّ السَّلاَمَةَ مِنْ سَلْمٰى وَجَارِتِهَا ◻ اَنْ لاَ تَمُرَّ عَلَى حَالِ بِوَادِيْهَا

---

[8] তবে হাদীসটির সনদ দুর্বল।

‘সালমা ও তার অনুরূপ নারীদের (প্রেমিকদের) হাত থেকে বাঁচার নিরাপদ পন্থা একটাই। তাহলো, তার বসবাসের উপত্যকা কখনও না মাড়ানো।’

সত্যি কথা কী, আমাদের সমাজ এই মারাত্মক দুটি অপরাধে আকুণ্ঠ নিমজ্জিত। একারণে প্রেম ও পরকীয়ার বিষাক্ত ছোবল আমাদের আকাশ- বাতাসকে ভারি করে তুলেছে। রিপোর্টটি উল্লেখ করার পর পত্রিকাটি কয়েকটি পরকীয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছে। এখানে দুয়েকটি তুলে ধরা হলো।

ঘটনা-১ : যাত্রাবাড়ির দনিয়া এলাকার হতভাগা লোকটির নাম ওবায়দুল হক। বয়স ৩৫। দনিয়া বাজারের ৫৭৬, সাত্তার সর্দার রোডের বাসিন্দা। আল্লাহপ্রদত্ত ও পৈত্রিক জীবনটা তার ছিন্নভিন্ন আর রক্তাক্ত হয়েছে স্ত্রীর পরকীয়ার বিষাক্ত ছোরায়। স্ত্রী নাসিমা বেগম লাবলু নামের এক যুবকের সঙ্গে পরকীয়া জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পরকীয়ার পথে সবচে বাধা যে স্বামী! তাই পরকীয়ার প্রথম কোপটা পড়ল ওবায়দুলের ওপর। স্ত্রী নাসিমা আর তার প্রেমিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ। ৪ঠা জানুয়ারী স্ত্রী নাসিমা ও তার প্রেমিক লাবলু তাকে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার মাথার পেছনে ও ঘাড়ে আঘাত করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে তারা। [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ ৪ জানুয়ারি ২০১১ ইং]

ঘটনা-২ : এ ঘটনা নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার বারইপাড়া গ্রামের। পরকীয়ার বিষাক্ত ছোবলে এবার প্রাণ হারিয়েছেন স্বামী

ও স্ত্রীর ফুফাতো ভাই। গুণে-গুণে দুই দুইজন মানুষ! ঘটনাটি হচ্ছে : রাশেদা বেগম নামের এক মহিলাকে শুক্কুর আলী নামের এক যুবকের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেন রাশেদার ফুফাতো ভাই সামসুল ইসলাম। এরপর থেকে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। বহু খোঁজাখুঁজির পরও তাকে পাওয়া যায় নি কোথায়ও। অবশেষে কয়েকদিন পর তার লাশ পাওয়া যায় পাশের এক পুকুরে। হত্যাকারীকে শনাক্ত করতে পুলিশ রাশেদার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাকে ছেড়ে দিলেও সে মারাত্মক অপমানবোধ করে এবং এ কারণে আত্মহত্যা করে।

ধারণা করা হয়, রাশেদাকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখাই কাল হয় শামসুল ইসলামের জন্য। পরকীয়ার পাপ দেখার 'অপরাধী চোখ' আর মুখের ভাষা চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেয়ার জন্য রাশেদা ও তার পরকীয়া প্রেমিক তাকে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়। এদিকে স্বামীর নিজের বধূকে অন্যের বাহুলগ্না অবস্থায় দেখার অপমানের সঙ্গে যোগ হয় তাকে জেরা করার অপমান। এ দুয়ে মিলে সেও বেছে নেয় পরকালের পথ। একটি পরকীয়া এভাবেই কেড়ে নেয় দুটি তাজা প্রাণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

«بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا»

ইসলাম একাকিত্ব নিয়ে শুরু হয়েছিল এবং অতিসত্বর ইসলাম একাকিত্বের দিকেই ফিরে যাবে।' [মুসলিম : ১৪৫]

অর্থাৎ ইসলামের সূচনা হয়েছিল নিঃসঙ্গতা নিয়ে, অল্প কিছু মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। ঠিক তদ্রূপ আবার আগের সেই অবস্থা ফিরে আসবে। মানুষ দ্রুতবেগে ইসলামের সীমানা থেকে দূরে সরে যেতে চাইবে। ইসলামের আদর্শ, ইসলামের মহত্ব তাদের কাছে অপাঙ্ক্তেয় মনে হবে। এর ফল যা হওয়ার তা-ই হবে। দুনিয়াব্যাপী এক আওয়াজ উঠবে- অশান্তি।

আজ কী হচ্ছে না তা-ই বলুন! বেপর্দা, প্রেম আর পরকীয়ার কথাই ধরুন। এসব কারণে শুধু আমাদের দেশই নয় সারাবিশ্ব অস্থিরতা আর অশান্তির চোরাবালিতে আটকে গেছে। ঘটছে লোমহর্ষক যতসব ঘটনা।

৮ জানুয়ারি একটি পত্রিকা রিপোর্ট করেছে, পরকীয়ায় পুরুষও নির্যাতিত। পুরুষরা স্ত্রীর পরকীয়ার কারণে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। একে কেন্দ্র করে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে ব্যাপকভাবে। দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এলেও অধিকাংশ ঘটনা থেকে যাচ্ছে দৃষ্টির আড়ালে।

লুণ্ঠিত সম্ভ্রমের লাশ চুরি!

স্বর্ণা। পাবনার ঈশ্বরদী দিয়ারবাঘাইলে মেয়েটির বাড়ি। উজ্জ্বল শ্যামলা গড়ন। গমের মতো দেহের মিষ্টি রঙ। চেহারাটা মায়ায় ভরা। সৌন্দর্য নয়নকাড়া না হলেও মায়াকাড়া তো বটেই। বয়স মাত্র পনের। এসএসসি পরীক্ষার্থী। এমন একটি মায়াবী মেয়েকে অন্তত মানুষ যে, সে-ই মায়া করবে, স্নেহ দেবে। কিন্তু আমাদের সমাজের দেউলেপনা আজ এত উৎকট বিশ্রি হয়েছে যে, মানবতা আর স্নেহের প্রশ্নটা আজ আটকে যায় বর্বরতার মোটা প্রাচীরে।

স্বর্ণার দুঃখজনক ঘটনা আমাদের সমাজের এমনই এক দেউলেপনার নিকৃষ্ট উপমা। মনুষ্যত্বের ঘোরতর বিপর্যয় নির্দেশ করার জন্য এই একটি দৃশ্যই যথেষ্ট যে, এই মায়াবী মেয়েটির লাশ ঝুলে আছে মেহেগনি গাছের সঙ্গে। পৈশাচিক, অমানবিক, বীভৎস ইত্যাকার শব্দ দিয়ে কি এই নৃশংসতার পরিমাপ করা সম্ভব? প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে এসব ঘটনা ঘটছে। নিষ্ফল আক্রোশ-অভিমানে চেতনা বিদীর্ণ হচ্ছে আমাদের। অবক্ষয়ের বীভৎস চেহারা দেখে কেবলই বিপন্নবোধ করছি আমরা, যেন কোথাও কোনও যোগ্য প্রতিকার নেই। প্রতিরোধ নেই। ক্রমেই শিথিল হচ্ছে মানবিক বন্ধন, ইলাহী নির্দেশের মর্যাদা। নির্দয় শাহওয়াত পুরুস্তির অন্বেষণে ক্লান্ত মানুষ যেন ক্রমাগত মানবতার প্রতিপক্ষ হয়ে উঠছে। রিপুর দাসত্ব, প্রভুত্বে ও আধিপত্যের লড়াইয়ে এমনকি হৃদয়ও হয়ে যাচ্ছে লুটের মাল- বাজারি পণ্য।

এই অপরিমেয় সর্বনাশ থেকে পরিত্রাণের কি কোনোই উপায় নেই? এই মর্মবিদারী প্রশ্নটি মানুষ ও সমাজের কাছে রেখে চলে গেল স্বর্ণা। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে ঘটনাটা জেনে নিন।
স্বর্ণার গ্রামের পলান শেখের ছেলে আনোয়ার স্বর্ণাকে ভালোবাসত। স্বর্ণার তাতে সমর্থন ছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তর জানার আর কোনও সুযোগ নেই। কেননা, উত্তরদাতা চিরদিনের জন্য অন্যজগতের বাসিন্দা হয়ে গেছে। কিন্তু কোনও নারী পুরুষের প্রেমের আহবানে সাড়া দিল কিনা সেটা দেখার সুযোগ নেই সেই যুবকের। ভালোবাসার মানুষটি তার উপযুক্ত কিনা কিংবা সে নিজে তার উপযুক্ত কিনা এই বিচারটুকু করারও ফুরসত নেই তাদের! হয়ত এটাও ছিল একতরফা ভালোবাসা, যাতে স্বর্ণার সমর্থন ছিল না। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আনোয়ার। পিশাচের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সে। প্রেমশূন্য প্রেমিক প্রেমিকার জীবননাশের নির্মম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
ঘটনার দিন রবিবার রাত এগারোটার দিকে আনোয়ার কয়েকজন সন্ত্রাসীকে সঙ্গে নিয়ে হানা দেয় প্রেমিকার গৃহে। উন্মোচিত হয় ভালোবাসার প্রকৃত রূপ। সে স্বর্ণাকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এরপর আনোয়ার ও তার সন্ত্রাসীবাহিনী তাকে ধর্ষণ করে। হতভাগী স্বর্ণাকে আধুনিক জাহিলিয়াতের নির্মমতা পিছু ছাড়ে না। প্রেম অস্বীকৃতির শাস্তির জন্য যেন এতটুকু যথেষ্ট নয়! তাই পাষণ্ডরা ধর্ষণ করে প্রথমে তার দুটো চোখ উপড়ে ফেলে।

না জানি অসহায় স্বর্ণা তখন কেমন আকুতি জানিয়েছে লম্পটদের কাছে! বিলাপ করে-করে চেয়েছে মা-বাবার কোলে ফিরে যাওয়ার সুযোগ। সম্ভ্রম বাঁচাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত জীবনটা বাঁচানোর জন্য বুকফাটা আর্তনাদ করেছে। কিন্তু ভয়ংকর বিভীষিকাময় কষ্ট থেকে বাঁচার আর্তনাদে পাষণ্ডদের হৃদয় গলেনি। উল্টো আরো নির্মম হয়েছে। চোখ উপড়ানোর পর তার হাতপা ভেঙে দিয়েছে তারা।

জাহিলীযুগের মানুষদেরও নির্মমতার একটা সীমা-পরিসীমা ছিল। ছিল কিছুটা হলেও মনুষ্যত্ব। কিন্তু এই যুগে এসে দেখছি এতটুকু মনুষ্যত্ব থেকেও বঞ্চিত মানুষ। আনোয়ার ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী স্বর্ণাকে ধর্ষণ করে, চোখ উপড়ায়, হাত পা ভাঙে, সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত করে এবং শেষে হত্যা করে লাশ মেহেগনি গাছের একটি ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে।

অসংখ্য কারণে মানুষ খুন হয়। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষকে খুনী হতে হয়। মনুষ্যত্ব, মানবতা, প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাকার সুকুমার বৃত্তিকে সুরক্ষা দিতে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হয়। এসব নির্মমতার মধ্যেও মনুষ্যত্বকে উচ্চকিত করার চেষ্টা করছে মানুষ। মৃত্যু স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক যাই হোক, লাশের দাফন বা সৎকারের বিধান আছে সব সমাজে। স্বর্ণা খাতুন সেটুকুও পায়নি। কবরের সম্মানজনক একটু স্থান জোটেনি তার ভাগ্যে। ধর্ষক খুনীরা তাকে সেটুকু মর্যাদা দেয়ারও প্রয়োজনবোধ করেনি। শুধু কি তা-ই? স্বর্ণাকে দাফন করার পরও তার লাশের

অবমাননা করা হয়েছে। কে বা কারা যেন তার লাশ চুরি করার চেষ্টা করেছে! হায় সমাজ!

এমন ক্ষতবিক্ষত আর ঝুলন্ত লাশ দেখে মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন আর বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তা অনুভবের বিষয়, ভাষাবদ্ধ করার বিষয় নয়। এই ঘটনায় স্বভাবতই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। হাজার হাজার মানুষের ধিক্কার ও অভিসম্পাত বর্ষিত হচ্ছে ধর্ষক ও খুনীদের ওপর। যুগপৎ শোক ও দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়েছে মানুষ।

পাঠক এটাকে বলবেন প্রেমঘটিত হত্যাকাণ্ড। কিন্তু আমি বলব, মনুষ্যত্বের বিবেচনায় এটি একটি সম্পূর্ণ প্রেমবর্জিত হত্যাকাণ্ড। কেননা, প্রেম বিয়োগান্তক পরিণতি পেতেই পারে, কিন্তু তা পৈশাচিকতার নামান্তর হতে পারে না। প্রেম ও রিপু আশ্রিত প্রতিহিংসা পরস্পর সাংঘর্ষিক।

আসমানী বিধান লঙ্ঘন হওয়ায় আলোচ্য ঘটনায় মনুষ্যত্বের দ্বিমুখী বিপর্যয়ের জঘন্য চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রথমত ধর্ষণ। ধর্ষক নারিত্বকেই চরম অপদস্থ করে না, মনুষ্যত্বকেও নিপাত করে। আমাদের সমাজে এই পাপ ও নাফরমানীটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সামাজিক অবক্ষয় বাড়ার সুযোগে প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে না বললেই চলে। ধর্মীয় বিধানের ব্যাপারে মানুষের উদাসীনতা ও তথাকথিত নারীবাদীদের প্ররোচনায় নারীরা বেশি করে বিপগগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু ভাবুক কিংবা অভিভাবক কেউই সতর্ক হচ্ছেন না। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ব্যক্তি যখন আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে

প্রতিহিংসা বা রিপুর তাড়নায় ধর্ষকের ভূমিকা নেয়, তখন গোটা সমাজকেই সে অশনি সংকেত দিয়ে যায়।

এই অশনি সংকেত থেকে শিক্ষা নেয়া, শিক্ষা নিয়ে পাপের সদর দরজা বন্ধ করে দেয়ার তাগিদ আর কতদিন পর অনুভূত হবে? পাপের বোঝা আর কত ভারী হলে সমাজ ঘুরে দাঁড়াবে?

এ সমাজে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। হয়ত স্বর্ণার ধর্ষক-হত্যাকারীরাও পার পেয়ে যাবে একদিন। কিংবা মনে করি বিচার হবে। কিন্তু এই বিচারটাই কি যথেষ্ট? বিরাট পাপের লঘুদণ্ডে সমাজ বদলাবে না। সমাজকে বদলাতে হলে আগে আল্লাহর বিধানের ছায়াতলে আমাদের সকলকে আশ্রয় নিতে হবে। আর সেই নিরাপদ ছায়াটা হতে পারে পর্দা ও সুশৃঙ্খল জীবন। [তথ্যসূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ২৫/০১/২০১১ ইং]

রক্তলহরী

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

«إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

‘দুনিয়া পুরোটাই সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতর সম্পদ হলো নেককার নারী।’ [তিরমিযী : ৩২৩২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াল্লামের বাণীর তাৎপর্য কতই-না মহান! একজন সৎ ও চরিত্রবান নারী পুরো জাতির গৌরব। স্বামী হিসেবে গৃহকর্তার, সন্তান হিসেবে ছেলেমেয়ের ও সন্তান হিসেবে মা-বাবার গৌরব। একজন নারী পর্দার আবরণে থেকেও বহু মানুষের পথপদর্শক কিংবা সত্য পথের অনুপ্রেরণা হতে পারেন। আবার এই নারী-ই সঠিক পথ ছেড়ে বক্র পথে পা মাড়ালে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারেন পুরো পরিবারের জন্য।

পর্দা নারীর ভূষণ। তার নিপাত্তার চাদর ও সম্ভ্রম রক্ষার অলঙ্ঘনীয় দুর্গ। কিন্তু যদি সে এই দুর্গে আশ্রয় না নেয়, তাহলে কী ভয়ানক পরিণতি হতে পারে তার একটি উদাহরণ হলো গুলশানের আলোচিত ঘটনা। গুলশানের কালাচাঁদ এলাকা। ২৪ই মার্চ ২০১০ ইং সালে এখানেই সংঘটিত হয় সেই নির্মম ঘটনাটি।

ইতি ও বীথি। সমাজের অন্যান্য নারী ও যুবতীদের মতোই সমাজসমুদ্রে সাঁতার কাটা তাদের। পর্দা-পুশিদা তাদের কাছে নস্যি। বিশেষ করে এই অল্প বয়সে! অদ্ভুত চিত্র দেখা যায় আমাদের সমাজে। আশি বছরের একজন বৃদ্ধা লাঠি ভর করে

বোরকাবৃতা হয়ে হাঁটছেন আর তার সঙ্গে বিশ বছরের একজন পূর্ণ যুবতী হাঁটছেন অবগুণ্ঠনমুক্ত হয়ে গলায় পেঁচিয়ে! তো এখানকার চিত্র যেমন উল্টো, পরিণতির চিত্রও তেমনি উল্টে হয়ে গিয়েছে। ফলে যুবকরা যেখানে হওয়ার কথা ছিল নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জামিন, হয়েছে তার উল্টো- ক্ষেতখাওয়া বেড়া। আমাদের সমাজে এ বেড়ারাই এখন নিয়মিত ক্ষেত খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে মানবতা ও সভ্যতা।

রুবেল নামের এক যুবক ইতি বা বিথীকে ভালোবাসত। যে কোনও মূল্যে সে ভালোবাসার মানুষকে নিজের করে নেয়ার প্রচেষ্টায় ছিল মরিয়া। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক তাতে সাড়া পায়নি সে। আল্লাহর বিধানবিহীন প্রেম মানেই প্রেমবর্জিত মোহও। এই রিপুর তাড়না বিপুল। গতি বাধাহীন। প্রতিরোধ ব্যর্থ। তাই যখন রিপুর তাড়না ভর করে তাদের মধ্যে, তখন সবকিছু স্রোতের দাপটে ভেসে যায়। তাই ভেসে গেছে ইতি-বীথির স্বপ্ন। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছু।

ঘটনার দিন রুবেল মিঠুন নামের আরেকজন রক্তপিপাসু যুবককে সঙ্গে নিয়ে মামার কাছ থেকে নেয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ইতিদের বাড়িতে হানা দেয়। ঘরে ঢুকে প্রথমে সে সরাসরি ইতির বাবা-মাকে তার সঙ্গে বিয়ে দেয়ার আদেশ করে। তাদের রুদ্রমূর্তি দেখে ভড়কে যান বাংলাদেশ নার্সারী অ্যাসোসিয়শনের সভাপতি ব্যবসায়ী সাদেকুর রহমান ও তার স্ত্রী নার্গিস আক্তার। তারা রুবেলের কাছে সময় চান। একজন পিতা কী পারেন যাচাই না

করে নিজ কন্যাকে কারও হাতে তুলে দিতে? মেয়েকে কারও হাতে পাত্রস্থ্ করতে? তাই তার এই সময় চাওয়াটা নেহায়তই যৌক্তিক। কিন্তু সেসব যৌক্তিকতা আজ রুবেলের অভিধানে মুছে যাওয়া এক শব্দ। সে যুক্তি শুনতে চায় না। শুনতে চায়না বিলম্বের কোনও বিড়ম্বনা। তাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তার দানবীয় আত্মা। বিকট গর্জনে কেঁপে ওঠে তার আগ্নেয়াস্ত্র। কয়েক রাউন্ড গুলি কেড়ে নেয় দম্পতির জোড়া প্রাণ। ইতির চোখের সামনে ভেসে যায় ফ্লোর নিজের মা বাবার রক্তে। এ রক্তবন্যা বেপর্দা, উচ্ছৃঙ্খলা ও মুক্তবাসের নয় কি?

শত ভ্রষ্টতায় পিষ্ট প্রাণ

নারীকে আজ নিগৃহীত করতে সম্পন্ন করা হয়েছে হাজারো আয়োজন। কেউ নারীর রক্ষাকবচ অস্বীকার করে নারীকে ধ্বংসের পথে লেলিয়ে দিচ্ছে, কেউ অপরিপক্ক সিদ্ধান্ত দিয়ে নারীর সম্মান হানী করছে, কেউ নারীকে ভুল পথে নামাচ্ছে। আর কখনও কখনও নারী নিজেই ভুলপথে পা দিয়ে নিজের ধ্বংস চূড়ান্ত করছে। এভাবে শতভ্রষ্টতায় ধ্বংস হচ্ছে নারীপ্রাণ, পিষ্ট হচ্ছে তাদের জীবন। **কিন্তু ইসলামবিদ্বেষীরা নারীর এই লাঞ্ছনার জন্য সব দায় চাপাচ্ছে ফতোয়ার কাঁধে।**

বস্তুত ফতোয়া শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশ। মানবজীবনের ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা করাই ফতোয়ার কাজ। কাউকে নিগৃহীত, অপমানিত কিংবা লাঞ্ছিত করা ফতোয়ার কাজ নয়। বরং ফতোয়ার কাজ হলো সামগ্রিক সম্ভ্রম-মর্যাদা রক্ষার যিম্মাদারী পালন করা। আর ফতোয়া দেবেন কেবল তারা, যারা ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত এবং ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখেন। এরকম একজন বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও সচেতন আলেমের ইসলামী জিজ্ঞাসার জবাবকেই ফতোয়া বলা হয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ফতোয়া হলো জিজ্ঞাসার জবাবমাত্র। কোনও শাস্তি বা বিধান বাস্তবায়িত করা ফতোয়ার কাজ নয়। বিধান বা আইন প্রয়োগ

করা কাজি বা বিচারকের কাজ। আলেম বা মুফতীর দায়িত্ব তা নয়।

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলায় পরকীয়া-প্রেম সংক্রান্ত কারণে সালিশি বৈঠকে দোররার আঘাতে এক কিশোরী মৃত্যু বরণ করায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। কিশোরীর নাম হেনা আক্তার। বয়স মাত্র ১৪ বছর। সে উপজেলার চামটা ইউনিয়নের দরবেশ খানের মেয়ে। হেনার সঙ্গে তার চাচাতো ভাই মাহবুবের সঙ্গে পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র ও হেনার মামা আশিক জানান, 'বেশকিছু দিন হলো হেনার সঙ্গে তার চাচাতো ভাই মাহবুবের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাহবুব চামটা গ্রামের রবিউল খানের ছেলে। তিনি ঢাকায় চাকুরী করেন। তার স্ত্রী থাকেন গ্রামে। মাঝে-মধ্যে বাড়িতে এসে তিনি হেনার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ রয়েছে।'

গত ২২ই জানুয়ারি রাতে মাহবুব বাড়ি এসে ডেকে নেন তার মানসকন্যা প্রেমিকা হেনাকে। স্ত্রীর ঘরে তারই বিছানায় তিনি হেনার সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হন। এসময় তার স্ত্রী শিল্পী এসে তা দেখে ফেলেন এবং চিৎকার শুরু করেন। তার চিৎকার ও হৈচৈ শুনে আশেপাশের মানুষ এসে মাহবুব ও হেনাকে ধরে ফেলে এবং মারধর করে। পরদিন শিল্পী গ্রাম্য মাতব্বরদের কাছে বিচার দেন। গত ২৪ জানুয়ারী চামটা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য স্থানীয় মাতব্বর ইদ্রিস শেখ আব্দুল হাই মীর মালত, আব্দুল মালেক মীর মালতসহ

১৫-২০জন স্থানীয় মাতব্বর সালিশে বসেন। সালিশে মাহবুব ও হেনাকে দোষী সাব্যস্থ করা হয়। ওই সময় মাতবর ইদ্রিস শেখ চামটা আলহাজ আবুল বাশার হাফিজিয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান ও স্থানীয় মাঝিবাড়ির মসজিদের ইমাম হাফেজ মোঃ মফিজ উদ্দিনকে ডেকে আনেন। উপস্থিত মাতব্বররা তাদের কাছে হেনা ও মাহবুবের শাস্তি কী- তা জানতে চাইলে তারা ১০০টি দোররা মারার হুকুম দেন। নির্দেশ মোতাবেক দোররা মারা শুরু হলে হেনা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। এর পর দিন ২৫ই জানুয়ারী হেনাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু স্থানীয় মাতব্বরদের চাপে তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতে বাধ্য হয় তার পরিবার। বাড়িতে আনার পর আবার অবস্থার অবনতি হলে তাকে নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিন রাতেই তার মৃত্যু হয়।

'ফতোয়াদাতা' সাইদুর রহমান বলেন, 'আমরা ফতোয়া দিই নি। আমাদেরকে ডেকে নিয়ে অবৈধ কাজের শাস্তির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমরা মাসআলা বলি।' কিন্তু তার এই কথা ঠিক নয়। কেননা, ফতোয়া দেয়ার জন্য যে যোগ্যতা শর্ত, সেই যোগ্যতার অধিকারী নন তিনি। তাছাড়া কারও ব্যভিচারের অপরাধ প্রমাণিত হলে তাকে শরঈনির্দিষ্ট শাস্তি প্রয়োগ করতে হলে বহু শর্ত বিদ্যমান। সেসব শর্তের অনুপস্থিতিতে তাকে শাস্তি দেয়ার কোনও অবকাশ নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুফতীর শাস্তি প্রয়োগের

অধিকার নেই। শাস্তি প্রয়োগ ও আইন বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব কাজি বা বিচারকের। তাই কোনও দৃষ্টিতে এটাকে ফতোয়া বলা যায় না। এটা অজ্ঞতা, অবিবেচনা। আর অজ্ঞতার জন্য ইসলাম দায়ী নয়।

সুতরাং যারা এটাকে 'ফতোয়াবাজি' বলে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছেন, হয় তারা অজ্ঞতার কারণে এরকম করছেন নতুবা ইসলামের সঙ্গে বিদ্বেষ রেখে এরূপ করছেন। সমাজ ফতোয়াদাতা এসব অজ্ঞ লোকদের দ্বারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি ইসলামবিদ্বেষী এসব লোকদের দ্বারাও চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষ করে এক শ্রেণীর ভাড়াটে বুদ্ধিজীবি আছে, যারা অজ্ঞ কিছু লোকের অজ্ঞতার সুযোগে ইসলামের বিরুদ্ধে, ফতোয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় দাঁড় করিয়ে দেয়। দেশকে এসব দুর্নীতিবাজ বুদ্ধিজীবি থেকে মুক্ত করতে না পারলে দেশের মানুষ একই সঙ্গে নৈতিক ও সামগ্রিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

এ হলো এক পত্রিকার ভাষ্য। অন্য আরেক পত্রিকার ভাষ্যমতে, হেনা রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে ওঁৎ পেতে থাকা মাহবুব তাকে তুলে নিয়ে যায় এবং একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে লাঞ্ছিত করে।

যদি এই ভাষ্য সত্য হয়, তাহলে হেনা সম্পূর্ণ নির্দোষ। এক্ষেত্রে সে দোররা পাওয়ার যোগ্য নয়, করুণা পাওয়ার হকদার। কেননা, শরীয়তে শাস্তির যোগ্য ধর্ষক, ধর্ষিতা নয়। একজন নিরপরাধ ধর্ষিতা সমগ্র জাতির সহমর্মিতা ও করুণা পাওয়ার যোগ্য হয়ে

যায়। তাই তাকে দোররা মারা কোনওমতেই বৈধ হয় নি। তো শরীয়ত যা সমর্থন করে না, কোনও অজ্ঞ ব্যক্তির কারণে যদি তা সংঘটিত হয়, একারণে শরীয়তের মর্যাদা নষ্ট করা, ফতোয়া নিয়ে কটাক্ষ, বিদ্রূপ করা আরেক অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছ্ইু নয়। আর সমাজ যতক্ষণ পর্যন্ত সব রকমের অজ্ঞতা থেকে মুক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। [সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ২রা ফেব্রুয়ারি ২০১১ ইং]

কথার পর্দা

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

﴿ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢ ﴾ [الاحزاب: ٣٢]

'নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীগণের মতো নও। তোমরা পর-পুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে কথা বলো। {সূরা আহযাব, আয়াত : ৩২}

ফিক্‌হগ্রন্থে বলা হয়েছে-

صَوْتُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ

নারীর কণ্ঠ সতরের (পর্দার) অন্তর্ভুক্ত।

শরহুল মুনতাহা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَصَوْتُ الاَجْنَبِيَّةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَيَحْرِمُ التَّلَذُّذُ بِسِمَاعِه-

'পরনারীর কণ্ঠ সরাসরি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তা দ্বারা স্বাদ আস্বাদন করা হারাম।'

তো কুরআনে নারীদেরকে পর-পুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে আর ফিক্‌হগ্রন্থে তাদের কথাকে পর্দা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে পরনারীর কথা শুনে স্বাদ আস্বাদন করা হারাম বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ- একজন নারী যেমন দেহের পর্দা করবে, তেমনি কথারও পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। যদি কথার পর্দার এই বিধান পালনে অবহেলা করা হয়

তাহলে সমাজে হাজারো ফেতনা-ফাসাদ আত্মপ্রকাশ করবে। এমনসব ঘটনার জন্ম দেবে, যা বিবেকবান মানুষের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে। আজ আমাদেরকে প্রত্যহ এধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে মোবাইল আর ইন্টারনেট চ্যাটিং আমাদের যুবক সমাজকে পতনের যে তলানীতে নিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে, যদি এখনই তাদের কথার পর্দার আওতায় না আনা হয়। নিচের ঘটনাটি দেখুন :

নেভি সিগারেট কোম্পানিতে সেলসম্যানের চাকুরী করেন ২৮ বছর বয়সী মুহাম্মাদ ইয়াসিন। ঘরে তার স্ত্রী আছে। আছে চার বছরের সন্তানও। এই বয়সে মানুষ ব্যস্ত থাকে সংসার-পরিজন নিয়ে সন্তান-সন্ততিকে মানুষ করার ভাবনায়। কিন্তু মৌলিক এই কর্মযজ্ঞ থেকে সরে এসে তিনি যে ফাঁদে পা দিলেন, তা হলো কথার পর্দা লঙ্ঘন করার ফাঁদ। তিনি যেখানে ভাড়া থাকতেন, সেখানেই ভাড়া থাকতো দোলা নামের মেয়েটি। সে ঢাকার এক ভার্সিটির ছাত্রী। ইয়াসিনের মাথায় ভূত চাপল। তিনি সমাজ-সংসারের দায়িত্ব ভুলে দোলার পিছনে লাগলেন। দোলার মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করে তার সঙ্গে কথার মালা গাঁথতে শুরু করলেন। দোলা প্রথমে কিসের মায়ায় তার আহবানে সাড়া দিয়েছিল সেটা বলা কঠিন। কিন্তু তার সাড়া দেয়া যে ইয়াসিনের জন্য শুভ হয় নি, তা বলাই বাহুল্য। কথার মধু বর্ষণের মধ্য দিয়ে চলে যায় বহুদিন। এক সময় দোলা বিরক্ত হতে থাকে ইয়াসিনের ফোনে। (এটা দোলার দাবি) কিন্তু নিবৃত্ত হন না ইয়াসিন। জোর করে

লঙ্ঘন করতে চান কথার পর্দার বিধান। এই বিরক্তি আর টানাপড়েনের মধ্যে একদিন দোলার মোবাইল থেকে কল আসে ইয়াসিনের মোবাইলে। মোবাইল স্কীনে পরকীয়া-প্রিয় মুখ দেখে মনটা নেচে ওঠে তার। রিসিভ করলে দোলা তাকে বারিধারার একটি নির্জন পার্কে চলে আসতে বলে। মনটা আরেকটু নেচে ওঠে তার। প্রিয়জনের সঙ্গে নির্জনে আড্ডা দেয়ার মধুর কল্পনা তার মনকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। তিনি সব রকমের বাস্তবতা উপেক্ষা করে প্রিয় মানুষের আহবানে সাড়া দিয়ে নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হন।

সেখানে দোলা তার জন্য প্রেম-ভালোবাসার শরবত নিয়ে উপস্থিত ছিল না। ছিল তার মৃত্যু পেয়ালা নিয়ে হাজির। লেকের পাড়ে পৌঁছার পর ইয়াসিন দেখতে পান দোলার সঙ্গে কয়েকজন অপরিচিত যুবক কথা বলছে। তিনি দোলার সঙ্গে কথা শুরু করতেই শুরু হয় কথা কাটাকাটি। তুমুল বাকবিতণ্ডা। এক পর্যায়ে দোলার ইশারায় অপরিচিত ওইসব যুবক তার ওপর হামলে পড়ে। পাঁচ-ছয়জন যুবকের সাঁড়াশি আক্রমণ প্রতিহত করার সাধ্য ছিল না তার। তাই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সোপর্দ করেন মৃত্যুকোলে। দোলা ও তার সহযোগিতায় তাকে লেকের পানিতে ফেলে দেয়। চারদিন পর ফোলা-ফাটা লাশ আবিষ্কার হয় ইয়াসিনের।

কথার বেপর্দা আজ ইয়সিনের চার বছরের মেয়েকে করেছে এতিম, স্ত্রীকে করেছে বিধবা আর মা-বাবাকে করেছে সন্তানহারা।

আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন এভাহৈ বহুমাত্রিক শূন্যতা সৃষ্টি করে। মায়ের কোল খালি করে, নারীকে বিধবা করে, সন্তানকে স্নেহ থেকে বঞ্চিত করে আর সমাজকে করে কলুষিত। [সূত্র : দৈনিক নয়াদিগন্ত ও দৈনিক যুগান্তর ২৯ই জানুয়ারী ২০১১ ইং]

সম্মোহনে ভ্রষ্টতা

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন-

﴿ وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَـٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٢١]

'তোমরা কোনও মুশরিক পুরুষকে বিয়ে করো না বা তাদের সঙ্গে কন্যাদেরকে বিবাহ দিও না। একজন মুসলিম দাসও অনেক উত্তম একজন মুশরিক থেকে। যদিও তারা তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।'- {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২২১}

উপযুক্ত বয়সে বিয়ে একটি অপরিহার্য বাস্তবতা। সমাজ-সংসার টিকিয়ে রাখতে এর বিকল্প নেই। আর বিয়ে-শাদির ক্ষেত্রে সাধারণত মানুষের মধ্যে আবেগ জিনিসটা বেশি কাজ করে। চাওয়া-পাওয়ার হিসাবটা দীর্ঘ হয়ে যায়। কিন্তু এসব চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে কোনটা যৌক্তিক বা কল্যাণকর মানুষ অনেক সময় নিজে থেকে তা নির্ণয় করতে পারে না। তাই মহান সৃষ্টিকর্তা বান্দাকে এই নাজুক সময়ে দিকনির্দেশনা করেছেন। কোন পথে হাঁটতে হবে, তা বাতলে দিয়েছেন।

কিন্তু মানুষ তবু ভুল করে। ভ্রষ্ট সম্মোহনে দিকভ্রান্ত হয়। বয়ে আনে গ্লানি, ধ্বংস। এ রকম একটা দুঃখজনক ধ্বংসাত্মক কাহিনী তুলে ধরছি এখানে।

রাজবাড়ির গোয়ালন্দ উপজেলার পশ্চিম উজানচর নবুওসিমদ্দিন পাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ প্রামাণিকের মেয়ে হাজেরা খাতুন। বয়স

২৪ বছর। রাজবাড়ি সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের সম্মান তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। দুনিয়াকে বোঝা ও চেনার মতো বয়স ও শিক্ষা দুটোই আছে এবং থাকার কথা।

একদিন অপরিচিত একটি নাম্বার থেকে কল আসে হাজেরার মোবাইলে। বিব্রত হাজেরা কলটা রিসিভ করেন। অপর প্রান্তের অচেনা লোকটি তাকে কণ্ঠের মুগ্ধতা দিয়ে আকর্ষিত করার ফাঁদ পাতে। বিনম্র কণ্ঠে সে বলে, আমি জহির উদ্দিন বাবু। আমাকে চিনতে পারছেন? এই নামের কাউকে চেনেন না হাজেরা। তবু হয়ত লজ্জার খাতিরে বললেন, হ্যাঁ, চিনতে পারছি! তো কেমন আছেন আপনি...।

লোকটার বয়স চল্লিশ বছর। ঘরে স্ত্রী-সন্তান আছে। পৌঢ়ত্বের বয়সে কেমন যেন জবুথবু অবস্থা লোকটার। কিন্তু সম্মোহন ও বিভ্রান্ত করার চুম্বক শক্তি ছিল তার। সেই সম্মোহনে গলে গেলেন হাজেরা। তখন থেকে দুজনের পরিচয়। পরিচয় থেকে হৃদ্যতা এবং সেখান থেকে প্রেম। প্রেম চলতে থাকে নিরবধি আপন গতিতে। এক বছর পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে তাদের প্রেম। এক পর্যায়ে জহির উদ্দিন তার মুখোশটা খুলে মেলে ধরে হাজেরার সামনে। বিয়ে করার প্রলোভন দিয়ে হাজেরার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে সে। হাজেরাও নিজেকে সমর্পণ করলেন এই লোকটার কাছে নির্দ্বিধায়!

এই নির্বুদ্ধিতা আর পাপের ফল শুভ হলো না হাজেরার জন্য। তিনি অসময়ে (বিয়ের আগেই) গর্ভে বাচ্চা ধারণ করলেন। গর্ভের

দুনিয়া তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। তিনি জহিরকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে লাগলেন। আর তার চাপাচাপিতেই বেরিয়ে এল জহির নামক পাষণ্ডের আসল পরিচয়। সে আসলে জহির নয়। সে একটা মালঊন-অভিশপ্ত মুশরিক। তার আসল নাম শ্রীরাম কুমার দাস। সে গোয়ালন্দঘাট উপজেলার হাটজয়পুর গ্রামের খোকা দাসের ছেলে। পরিচয়টা পেয়ে ঘৃণায় গা গুলিয়ে বমি বেরিয়ে আসতে চায় হাজেরার। একজন মুশরিক তো বমির মতোই ঘৃণিত! কিন্তু কী করবেন হাজেরা? নাপাক একটা ইতরের অবৈধ ঔরস তিনি তার পেটে ধারণ করেছেন! তাই বাধ্য হয়েই তাকে একটা বিহিত করার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে শ্রীরাম ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ২রা মে হাজেরাকে মোটরসাইকেলে করে রাজবাড়ির একটি আবাসিক হোটেলে নিয়ে আটকে রাখে এবং জোরপূর্বক তাকে কবিরাজি ঔষধ খাইয়ে পেটের গর্ভ নষ্ট করার চেষ্টা করে। এতে হাজেরা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ফরিদপুর মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ৬ই মে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

পাঠক! কী পরিমাণ দুঃখজনক ঘটনা এটা, তা আপনি চিন্তা করতে পারেন? একজন মুসলিম নারীর গর্ভে একটা মুশরিকের অবৈধ ঔরস, তা মেনে নেয়া যায়? পর্দার অভাবে, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সুবাদে এভাবেই নষ্ট হতে থাকবে আমাদের মা-বোনদের মূল্যবান জীবন? [সূত্র : দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৫ই জুলাই ২০১০ইং]

বিকৃত বাসনা

﴿ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣ ﴾ [النساء: ٢٣] -

‘তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে, তোমাদের মেয়েদেরকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, ভাতিজীদেরকে, ভাগ্নীদেরকে, তোমাদের সে সব মাতাকে যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদেরকে, তোমাদের শ্বাশুড়ীদেরকে, তোমরা যেসব স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছ সেসব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদেরকে, আর যদি তোমরা তাদের সঙ্গে মিলিত না হয়ে থাক তবে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং দুই বোনকে একত্র করা (তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। {সূরা আন-নিসা, আয়াত : ২৩}

আলোচ্য আয়াতে স্বামীর বর্তমান স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর ঔরসে জন্ম নেয়া কন্যাকে নিজের কন্যার মতোই বিয়ে করা হারাম করা

হয়েছে। কোনও পিতা কি পারে নিজ কন্যাকে বিয়ে করতে? পারে তার দিকে কুনজরে তাকাতে? পারে না। কিন্তু যখন অবস্থা শোচনীয় হয়, মানুষের নৈতিকতায় বিপর্যয় নামে, তখন অনেক কিছুই সম্ভব হয়। সম্ভব নিজ কন্যাকে বিয়ে করা, তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা!

এসআই মাহফুজুর রহমান। নারায়ণগঞ্জ বন্দর থানার কলাগাছিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে ডিউটিরত পুলিশ কর্মকর্তা। চার বছর আগে বিয়ে করেন চাষাড়া এলাকার তালাকপ্রাপ্তা বিলকিস বেগমকে। বিয়ের পর স্ত্রী ও তার উপযুক্ত কন্যা হাবিবা খানম নূপুর ঢাকায় ভাড়া থাকতেন। স্ত্রীর কন্যা নূপুরের দিকে কুনজর পড়ে মাহফুজের। অথচ সে একা বিলকিসের কন্যা নয়, তারও কন্যা। একদিন নূপুরকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে সুযোগ বুঝে তাকে ধর্ষণ করে মাহফুজ।

বাবার কাছে সম্ভ্রম হারিয়ে সাময়িক স্তম্ভিত হয়ে যান নূপুর। রাগে, ক্ষোভে, ঘৃণায় তার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেন তিনি। অবস্থা প্রতিকূল দেখে অন্যপথে হাঁটা শুরু করেন মাহফুজ। নারীকে বিভ্রান্ত করার সবচেয়ে সফল অস্ত্রটা প্রয়োগ করেন তিনি নূপুরের বিরুদ্ধে। তিনি তাকে ভালোবাসার (?) প্রস্তাব দেন! প্রস্তাবে সাড়াও দেন নূপুর! এবার উল্টো চক্রে গাড়ি চলতে থাকে। নূপুরকে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নূপুরের মাকে তালাক দেন তিনি এবং বিয়ে করেন নূপুরকে! এবার মামলা দেন বিলকিস বেগম। আদালতে মাহফুজ জামিনের আবেদন করলে ‘স্ত্রী’ নূপুর মায়ের

মামলার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আদালতে জানায়, যেহেতু তার মাকে তালাক দিয়ে মাহফুজ তাকে বিয়ে করেছে এজন্য তার জামিনের আবেদনে আমার কোনও আপত্তি নেই। তাকে জামিন দেয়া হোক! ছিঃ নূপুর! নীতি-নৈতিকতা আর চক্ষুলজ্জা এভাবে গিলে খেলে চলবে? সমাজ-সংসারে অর্জনটাই সব? নৈতিকতার জন্য বর্জনের আনন্দ যে অর্জনের চেয়ে অনেক মধুর!

বিবেক জাগাতে প্রাণদান

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا »

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস সালাম নারীকে তার অপর মুসলিম বোনের তালাক কামনা করতে বারণ করেছেন।' [মুসলিম : ১৪০৮]

সামাজিক জীবনাচারকে সুন্দর, স্বচ্ছ ও দোষমুক্ত রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস সালাম মানবজাতির সামনে সরলরেখা অংকন করে দিয়েছেন। সেই সরলরেখায় চললে কারও পদস্খলন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সরলরেখায় চলে যে কোনো লোক তরতর করে উঠে যেতে পারে মঞ্জিলে মাকসুদে। কিন্ত বিপরীতে রয়েছে ধ্বংস, বক্রপথে নিশ্চিত পদস্খলনের আশঙ্কা।

বেপর্দা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনে নারীর একটি পদক্ষেপ পরিবার, সমাজ ও দেশের মেরুদণ্ডে কী পরিমাণ ঝাঁকুনি দেয়, তা অনুমান করতে পারবেন নিম্নের ঘটনা দ্বারা, যা সংঘটিত হয়েছিল উল্লিখিত হাদীসটি অমান্য করে উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচার অবলম্বন করার কারণে।

'আব্বু তোমার বাবা তোমাকে তোমার অপরাধ থেকে বাঁচানোর জন্য যা করছে, তাতে আমরা মরে যাচ্ছি। কারণ, তোমরা সবাই মিলে যা করছ, ভালই করছ। আমার বাবা আমাদের মরার জন্য স্টেম্পে লিখিত নেয়। আমি পাবন আমাকে ঘ্রিনা করি।'

কাঁচা হাতে ভুল বানানে লিখিত দেয়ালভাষ্য এটি। কচি শিশুর অশুদ্ধ বানানে বিন্যাসিত এই বাক্যাবলী যেমনিভাবে সাদা দেয়ালে কালিমা লেপন করে দিয়েছে, তেমনি তা আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার গায়েও কলঙ্কের আঁচড় টেনে দেয়। বাবার পরকীয়ার বিরুদ্ধে কচি শিশুর বিদ্রোহের চেয়ে বড় কোনো বিদ্রোহ আছে কিনা- তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শিশু পাবন আরও লিখেছে- 'আমি হয়ত বাঁচতাম, যদি চেহারা বদলাতে পারতাম। রক্ত বদলাতে পারতাম। আমাদের মৃত্যুর জন্য আমাদের বাবা রাশেদুল কবির দায়ী। একটা আফসোস আছে যে, আমি তোমার বংশে জন্ম নিয়েছি। আর তোমাদের রক্ত নিয়ে মরতেছি।'

কী অদ্ভুত শিশু-অনুভূতি! নিষ্পাপ রক্তের একটি শিশু মর্মাহত হয় নারীর উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচারের কারণে! কলঙ্কিত পথে পা মাড়ানোর কারণে নিদারুণভাবে ব্যথিত হয়! একেই বলে ফিতরাত- একটি অপরাধ দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে একটি পরিবার, সমাজ ও দেশের চেহারা। কেড়ে নিয়েছে ফারজানা কবির রিতা (৩৫) ইশরাত কবির পাবন (১৩) আর রাইছা রেশমী পায়েল (১২) নামের তিনটি মানুষের তাজা প্রাণ। পিতার একটি বক্র ইচ্ছা সৃষ্টি করেছে সন্তানের মনে পিতৃকূলের বিরুদ্ধে পরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ। বাকরুদ্ধ দেয়ালের সঙ্গে সখ্য গড়েছে পাবন। হৃদয়ে দানাবাঁধা সব ক্ষোভ জমাটবদ্ধ করেছে নিষ্প্রাণ দেয়ালগাত্রে। সে আরও লিখেছে- 'আব্বু, তুমি ও তোমার বাবা মা বোনদের কারণে আমরা মরে

যাচ্ছি। কারণ, তুমি ও তোমরা সবাই মিলে যে অপরাধ করেছ তাতে আমরা আর বাঁচতে পারলাম না।’

পাবনের দাদা ইত্তেফাক পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি। একজন সাংবাদিকপুত্রের অনৈতিকতা প্রশ্নের ঝড় তোলে শিশু পায়েলের মনে। ক্রোধের আগুন তার অন্তর থেকে দাদার প্রতি শ্রদ্ধার লেশটুকু জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। সে ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে লিখেছে- ‘এই দাদা! তুই না সাংবাদিক? তোর বাসার দেয়ালে পত্রিকা ছাপিয়ে দিলাম। আমার নানা মারা যাওয়ার পর নানু তার শ্বশুরের সঙ্গে ছিল। তুমি কেন ভালো শ্বশুর হতে পারলে না। ভালো দাদা হতে পারলে না?’

পাঠক হয়ত ধৈর্য হারাচ্ছেন। **কথার খেই না পেয়ে বিরক্ত হচ্ছেন। আসলে এমন একটি নির্মম ঘটনার উপক্রমিকা ও উপসংহার ঠিক করা কঠিনই বটে। তবু চেষ্টা করব আপনার ধৈর্য অটুট রাখতে। চলুন**, পায়েলের ভাষাতেই জানতে চেষ্টা করি ঘটনার মূল কারণটা।

সে পাশের ঘরের দেয়ালে লিখেছে- আব্বু, তোমরা তো ওই মেয়েকে (স্মৃতি) এ বাসায় আনার চেষ্টা করতেছো। কিন্তু এই মেয়ে আনার আগেই ওই বাড়ি থেকে লাশ বের হবে। আব্বু, তোমার মাকে মারলে তোমার খারাপ লাগে, আমার মাকে মারলে আমার খারাপ লাগে না।’

এবার এই লিখনী ও ঘটনার মূলে প্রবেশ করুন। রিতা বাবাহারা এক নারী। বাবা ফয়েজ উদ্দিন আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। দুই বোনের মধ্যে রিতা ছোট। প্রায় আঠারো বছর

আগে দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিক শফিকুল কবিরের ছেলে রাশেদুল কবিরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। নবদম্পতির সুখচাকাটা বেশ স্বাচ্ছন্দেই ঘুরতে থাকে। কিন্তু প্রায় সোয়াযুগ পরে তাদের দাম্পত্যজীবনের চাকাটা থমকে যায়। পরকীয়ার নগ্ননর্দমায় তা আটকে যায় কঠিনভাবে।

রিতা পরম বিশ্বাসে রাশেদের মামাতো বোন স্মৃতিকে নিজ ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলেন। সে এখানে থেকে লেখাপড়া করত। কিন্তু ফলাফল কী হয়েছিল? একধরনের দিয়াশলাই আছে, যাতে লেখা থাকে- এর কাঠি আগুনে ভিজলেও জ্বলে। রিতার এই করুণা ও বিশ্বাস ছিল এই ভেজাকাঠির মতো দহনক্ষমতাসম্পন্ন। এর বাইরের পিঠে কৃতার্থের আদ্রতা থাকলেও ভেতরের জ্বালানীক্ষমতা ছিলও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ। কেননা, স্বামীর স্পর্শে আসা একজন বেগানা নারী যে কোনো স্ত্রীর সাজানো তাজা বাগানও জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেবার ক্ষমতা রাখে। আর নিজ হাতে যদি সেই ক্ষমতার বারুদে আগুন সঞ্চালন করা হয়, তবে এর চেয়ে বোকামী আর কী হতে পারে?

তাই যে স্মৃতিকে বোনের মতো আদর দিয়েছেন, নিজের মধ্যে বিশ্বাসের মিনার গড়েছেন, সেই স্মৃতি বিনিময় হিসেবে তাকে দিয়েছে খালি মোড়ক! রিতার বুক খালি করে সে নিয়েছে রাশেদকে আপন করে। ভালোবাসা দিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে রাশেদকে নিয়ে বসেছে বিয়ের দ্বিতীয় পিঁড়িতে।

অনুচ্চারিত হলেও স্মৃতির শর্ত ছিল তাকে পেতে হলে আগে রিতাকে তালাক দিতে হবে। পৃথিবীর এ এক চরম প্রহসন! তুমি অন্যায়ভাবে একজন পুরুষে কর্তৃত্ব খাটাবে, অনৈতিকভাবে তার হৃদয়-মন আকৃষ্টি করবে, স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসার জায়গাগুলো তুমি দখল করবে-যার সবগুলোই অনৈতিক- আর সে (স্ত্রী) প্রাপক হয়েও নিশ্চিত অধিকার রেখেও তা লাভ করতে পারবে না! স্বামীর ভালোবাসা পেতে পারবে না! তাকে ছেড়ে যেতে হবে স্বামী-সংসার ছেড়ে! এর চেয়ে বড় জুলুম কী হতে পারে আর এই শর্ত মেনে নেয়ার চেয়ে কাপুরুষতাইবা কি হতে পারে?

একজন পুরুষ প্রয়োজনে শর্ত পূরণ করে একাধিক (চারটা পর্যন্ত) বিয়ে করতে পারে। এমনিভাবে কোনো নারী ইচ্ছা করলে স্ত্রী আছে এমন পুরুষের ঘরণী হতে পারে। শরঈ অনুমোদন তো আছেই, যৌক্তিকভাবেও তা দূষণীয় নয়। কিন্তু দোষ হচ্ছে অনৈতিক শর্ত ও লজ্জাজনক সন্ধি করা। আগের স্ত্রীকে ছেড়ে দিতে বলা এবং স্বামী হয়ে এমন শর্ত মেনে নেয়া। অন্যের ভরাপাত্র শূন্য করে দিয়ে নিজের শূন্যপাত্র ভরে নেয়ার এই জঘন্য প্রবৃত্তি পরিত্যাগেরই আদেশ দেয়া হয়েছে বর্ণিত হাদীসে।

কিন্তু স্মৃতি ভিন্ন সুরে বাঁশি বাজিয়েছিলেন এবং তার সুরেই রাশেদল বাদক বাজিয়েছিলেন। শুধু কি তা-ই? রাশেদুলের গোটা পরিবার এই সুরের বাদক হয়ে গিয়েছিল! তাই ২০০৮ইং সালের ৮ই আগস্ট স্মৃতিকে বিয়ে করে রিতাকে তালাক দিয়ে দেয় রাশেদুল কবির।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এম নির্মম প্রহসন রিতা ও তার দুই সন্তানের মধ্যে নিদারুণ প্রভাব ফেলে। শুধু মানসিক প্রভাবই নয়, তাদের বিরুদ্ধে চলতে থাকে শারীরিক নির্যাতনও। ফরে দুটি সন্তান নিয়ে তিলে-তিলে নিঃশেষ হতে থাকেন রিতা। স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী এবং স্বামী পরিবারের প্রতিটি সদস্য যখন তার বিরুদ্ধে দাঁড় বাইতে থাকে তখন একা অসহায় এক নারীর পক্ষে স্রোতের বিপরীতে চলা সম্ভবপর হয় না। স্বামীর গোটা পরিবার একটি মরুঝড় হয়ে কান্ডহীন রিতার অস্তিত্বকে উপড়ে ফেলতে চায়। রিক্ত, নিঃস্ব রিতা ঝড়ের কাছে, উত্তাল স্রোতের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বুকের ভেতর জমে থাকা স্বামীর প্রতি সব ভালোবাসায় স্মৃতিকে একক কর্তৃত্ব দিয়ে তিনি নিজেই পথ থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যে স্মৃতি স্বামীর সব ভালোবাসা কেড়ে নিতে চায়, সে কি পারবে মাহারা সন্তান পাবন-পায়েলকে মাতৃস্নেহ দিতে? বিশ্বাস হতে চায় না রিতার। তাই নিজের সফরসঙ্গী করে নেন তাদেরকেও।

তাদের এই অন্তিমযাত্রায় নিস্তব্ধ হয়ে যায় এদেশের আকাশ, বাতাস, চন্দ্র,সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র। **২০১১**ইং সালের **১১**ই জুন রোজ শুক্রবার রাজধানীর পূর্বজুরাইনের বাসায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তিনটি নিথরদেহ। খিড়কীপথে প্রবেশ করা একটি পাপের তান্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে যায় একটি সাজানো সংসার। ঘুমের বড়ি খেয়ে, সন্তানদেরকে খাইয়ে চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে তারা জাগাতে চেয়েছেন এই ঘুমন্ত সমাজটাকে। নিজেরা মরে বাঁচাতে গেছেন

অন্যদেরকে। দেয়ালের গায়ে লিখে গেছে এই অবুঝ শিশু দুটি হাজারো বেদনার উপাখ্যান। শিশু পাবনের কাঁচা হাতের রং পেন্সিল ও তুলির আঁচড়ে খোদিত কলঙ্কিত দেয়াল আমাদের সমাজ কলঙ্কের এক নীরব দর্শক বৈকি! এই দেয়ালে খোদিত অনেক বক্তব্যই আমাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট- যদি আমাদের বিবেকটার অস্তিত্ব থাকে এবং আমরা জাগ্রত হওয়ার ইচ্ছা রাখি। যেমন- পাবন জাতির বিবেক বলা হয় যে সাংবাদিকদেরকে, সেই সাংবাদিক দাদার বিবেকসত্তায় আঘাত করে লিখেছে- এই দাদা! তুই না সাংবাদিক? তোর বাসার দেয়ালে পত্রিকা ছাপিয়ে দিলাম...

আহ্! কী নিদারুণ মর্মবেদনা! একটি শিশুর কচিমনে স্নেহবঞ্চনার কী পরিমাণ শূন্যতা সৃষ্টি হলে তার অন্তর থেকে অনাসিক্ত মরুর ধূলিকণা ছুঁয়ে আসা লু হাওয়ার মতো উষ্ণ উত্তাপ ও উষ্মা প্রকাশ পায়, তা উপলব্ধি করতে মনস্তাত্ত্বিক কিংবা মনোবিজ্ঞানী হওয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। হৃদয় বলতে যদি কোনো বস্তুর অস্তিত্ব থাকে এবং সেখানে মনুষ্যত্বটাও কিঞ্চিৎ বাসা করে, তাহলে এমন উষ্ণ উত্তাপ ও উষ্মার মর্ম উপলব্দি করা বেশ সহজ হবে।

হায়! এমন নিষ্পাপ দীর্ঘশ্বাসও কি আমাদের বিবেককে জাগাতে যথেষ্ট নয়? এমন উষ্মার দাহশক্তি কি অনাচারের খড়কুটো জ্বালিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট নয়? যদি তা না হয়, তাহলে বলব, আগুনের দহাশক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে এবং খুব তাড়াতাড়ি

এমন এক সময় আসবে, যখন আগুন খড়কুটোকে গ্রাস করবে না, খড়কুটোই আগুনকে গ্রাস করবে। সেই সঙ্গে আরও বলব, আমাদের নৈতিকসত্তার মৃত্যু ঘটেছে, দ্রুত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা দরকার।

তিনটি তাজাপ্রাণও যদি এই জাতির বিবেককে জাগিয়ে তুলতে না পারে, তাহলে কীসে আর কবে এই জাতি জাগ্রত হবে? তাদের বিবেক জাগ্রত হবে? [তথ্যসূত্র : ১২/০৬/২০১০ ইং সালের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক]

নির্লজ্জ দিবসের নীলগোলাপ!

বিশ্ব আজ দিবসময়। এই দিবস, সেই দিবস, অমুক দিবস, তমুক দিবস দিয়ে পৃথিবী হয়েছে দিবসময়। দিবসময় বিশ্বের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দিবসটি হলো ১৪ই ফেব্রুয়ারির দিবসটি। যে নামে স্মরণ করা এই দিবসটিকে সে নামে আমি তা স্মরণ করতে ঘৃণা করি। কারণ, দিনটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিকতা দিয়ে যুবক-যুবতী ও তরুণ-তরুণীদেরকে মারাত্মক এক অন্ধকার চোরাগলিতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতা পেয়ে তা আজ কুৎসিত আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম এই দিনটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার তৎপরতা শুরু করে যায়যায়দিন নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়। এক সময় এসে বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও এই অশ্লীলতার বান নেমে আসে। পিতা-মাতা, অভিভাবক-অভিভাবিকাগণ সেদিন নীরব দর্শক হয়ে যান। আর তাদের সেই নীরবতার সুযোগে ঘটে হাজারও পাপকর্ম। কখনও কখনও দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক ঘটনা। এরূপ এক বেদনাদায়ক ঘটনা প্রত্যক্ষ করল ২০১১ইং সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি। সেদিন ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘর থেকে বের হলো আয়শা আক্তার টুম্পা নামের মাত্র পনের বছরের একটি মেয়ে। সে তোপখানা রোডের রহিমা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। সে ভালোবাসা দিবসে প্রেমিক সাইদুর রহমান সাইদ ওরফে আকাশের সঙ্গে দেখা করার

জন্য ঘর থেকে বের হয়। এরপর দীর্ঘ সময় আর তার খোঁজ নেই। শঙ্কিত হন সবাই। দুইদিন হয় তবু ফেরার নাম নেই টুম্পার। পরিবারের শঙ্কা বাস্তবতায় পরিণত হয়। এরপরে বুধবার সকালে নারায়ণগঞ্জ সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকার সানারপাড় থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

শুধু টুম্পাই নন, তার ভাইও ঠিক একই কারণে এই দুষ্টচক্রের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন কিছুদিন পূর্বে। গত বছর (২০১০ইং সাল) মে মাসে একইভাবে টুম্পার বড় ভাই আল কাওসার চৌধুরি মাসুদ ওরফে বাবলা (২২) নিখোঁজ হওয়ার পর নরসিংদীর রায়পুরা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। স্বজনদের আশঙ্কা, একই চক্র হত্যা করেছে ভাই-বোনকে। কারণ, টুম্পাকে উত্ত্যক্তকারী আট সদস্যের এক চক্রের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। আর সে কারণেই ওই চক্র তার প্রতি ক্ষিপ্ত ছিল।

আমাদের সমাজের ঘটমান বিভিন্ন ঘটনা আমাদেরকে একথা স্বীকার করাতে বাধ্য করছে যে, নারীরা সরলতা আর বেপর্দার ভুলের কারণে খুই মারাত্মক পথে পা রাখছে। যে টুম্পার ভাইকে প্রাণ হারাতে হলো বখাটে উত্ত্যক্তকারীদের হাতে, সেই টুম্পাই কেন এসব লোকের জালে পা দেবে? টুম্পার মা খায়রুন্নাহার শিখা জানিয়েছেন, গত কোরবানীর ঈদের দিন বড় ভাইয়ের স্ত্রী কাকলী ও মামাতো বোন পাপড়ির সঙ্গে বিশ্বদ্যিালয় এলাকায় বেড়াতে যায় টুম্পা। ওই দিনই সাইদের সঙ্গে পরিচয় হয় টুম্পার। সাইদ নিজের আসল নাম আড়াল করে আকাশ ছদ্মনামে টুম্পার সঙ্গে

মোবাইলে কথা বলা শুরু করে। বিষয়টি টের পেয়ে মা শিখা মেয়েকে শাসন করতে থাকেন। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে এ নিয়ে টুম্পাকে বেশ বকাঝকা করেন। কিন্তু স্নেহময়ী মায়ের শাসনের মর্যাদা ও গুরুত্ব নিষ্প্রভ, নিষ্ক্রিয় ও ম্লান হয়ে যায় নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা আর উলঙ্গ সংস্কৃতি তথা বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের কাছে। এর ফলাফল আজ আমাদের সামনে। মেয়ের সাদা কাফনের সামনে বসে মা কাঁদছেন, বিলাপ করছেন, বাবা নিভৃতে অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করছেন। আর চোখ মুছছেন স্বজনেরা।

পাঠক! আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন আর অপসংস্কৃতি এভাবেই সৃষ্টি করে হাজারও শূন্যতা। এই শূন্যতাই কি আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত সভ্যতার ভিত্তি?

১৪ই ফেব্রুয়ারির ভালোবাসা দিবসে শুধু নীতি-নৈতিকতাই বিসর্জন যায় না, বরং অনেক রক্তও বিসর্জন যায়। তাই সকলের উচিত পাপসাগরে আকণ্ঠ সমর্থন না দিয়ে পাপের ভয়াবহতা অনুমান করে তা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন। [তথ্যসূত্র : দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১১ ইং]